প্রাণ মন আত্মা

নিগূঢ়ানন্দ

প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

PRAN MON ATMA
By, Niguranahda
Published by : Dey's Publishing,
13, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-700073.

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শংকর প্রসাদ মজুমদার

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪

মুদ্রক : শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। বি. এম. এণ্টারপ্রাইজ
২২/বি বেথুন রো। কলিকাতা ৬

বিশ্বমানসসন্ধানীদের

করকমলে।

এই লেখকের ঃ

মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা ১ম ও ২য় খণ্ড

মৃত্যু ও পরলোক

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড।

জন্মান্তর

পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত ১ম ও ২য় খণ্ড

ঈশ্বর মরে গেল

সাধুসন্তের দেশে

আত্মার রহস্য সন্ধান

সহস্রারের পথে

দেবদেবীর উৎস সন্ধানে

আত্মা, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরক

ঈশ্বর সন্ধানে ভারত

দক্ষল দরওয়াজার নগরী

Revealed Mystries Of The World Divine

একান্ন পীঠের সাধক।

জাতিস্মর

প্রাণ মন আত্মা

এক সাধু। ওড়িষার সাধু। কে জানে কবে ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত বঙ্গোপসাগরের শেষ একটি দ্বীপে। কেউ জানে না তাঁর বয়স কত। কবেই বা এল। এই শত ভঙ্গ বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলো সবই এক সময় ছিল সুন্দরী বৃক্ষের নিচে, অজস্র হরিণ, ব্যাঘ্র আর শাখামৃগ বুকে নিয়ে। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে হঠাৎ এক ইংরেজ পুঙ্গবের নজরে পড়ল। শ্বাপদকুল লাঞ্ছিত এই অরণ্যের বুকে তিনি ঠিক করলেন বসাবেন মানুষের বসতি। সুন্দরী বৃক্ষের সার্বভৌমত্ব নাশ করে সেখানে মানুষকে দেবেন মাটির অধিকার। শ্বাপদকুলের সঙ্গে সংগ্রামে লড়িয়ে দেবেন তিনি মানবকদের। তাঁর খেয়ালের টানেই খুলনা থেকে লোক নিয়ে এলেন তিনি দ্বীপে দ্বীপে। অরণ্যের সঙ্গে, শ্বাপদের সঙ্গে সেই থেকে চলল লড়াই। কত গেল অজগরের পেটে, কত বাঘের! কত মরল বিষাক্ত সর্প দংশনে কে জানে! কিন্তু প্রাণের সংগ্রাম বড় সংগ্রাম। এ সংগ্রামের শেষ নেই। সেই কোন মহাপ্রাচীন কাল থেকে এ সংগ্রাম চলছে তো চলছেই। একদিন অরণ্য-সঙ্কুল এই পৃথিবীতে যেমন শেষ পর্যন্ত বৃহদাকার জন্তু-জানোয়ার, শ্বাপদাদি হিংস্রপ্রাণী, সবাইকে পরাজিত করে ধরণীর বুকে মানুষ তার বিজয় কেতন উড়িয়েছে তেমনই করে একদিন এই সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতেও একে একে শ্বাপদ কুল পরাজিত হতে হতে এসে ঠেকেছে শূন্যের ডগায়। প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্তে সার্বভৌম অধিকার ছেড়ে দিতে দিতে সুন্দরী বৃক্ষের শেষ বংশধরেরা আমেরিকার রেড ইনডিয়ানদের মত সংরক্ষিত অঞ্চলে এসে মানুষেরই করুণায় কোন রকমে বেঁচে আছে রিজার্ভ ফরেস্ট হয়ে, যেমন অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধি-বাসীরা সংরক্ষিত অঞ্চলে বেঁচে আছে ইউরোপীয়দের করুণায়, আমেরিকাতে রয়েছে প্রাচীন রেড-ইনডিয়ানরা!

সেই দুর্ধর্ষ রয়েল বেঙ্গল টাইগার সেও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল স্ববাসে। শুধু আদিম কিছু জানোয়ারের নমুনা হিসাবে মানুষের দরবারে সাক্ষী হবার জন্য বেঁচে আছে সংরক্ষিত অঞ্চলে—সজনেখালিতে, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে। মানুষ ছেয়ে ফেলেছে প্রান্তর। অরণ্য উধাও হয়েছে। কিছু কিছু বেঁচে রয়েছে নমুনা হিসেবে—অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হয়তো। সজনে-খালির আগে সংরক্ষিত সুন্দরবনের ঘন ছায়ার পূর্বে—দুদিকে ছবির মত ছড়িয়ে রয়েছে সাজানো প্রান্তর দিগন্ত পর্যন্ত মাটি আর আকাশে ছোঁয়াছুঁয়ি করে।

অরণ্য সরিয়ে যে মাটির বুক থেকে শস্য গজিয়ে মানুষ তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করার চেণ্টা করেছে, পঙ্গপালের মত দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি তার হয়নি। মানুষ হানা দিয়েছে সাগর থেকে প্রান্তর ভেদ করে অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া খাড়িতে—যে খাড়িকে ভুল করে লোকে বলে নদী—মাতলা, বিদ্যাধরী ইত্যাদি। জোয়ারে ভাটায় হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে খাড়ির স্রোতে ছোট ছোট জাল নিয়ে—মৎস্যান্বেষণে—ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা হিন্দু, মুসলমান সবাই। ডাঙ্গায় শ্বাপদ, জলে চির ক্ষুধার্ত কুমীর। সব হাঁ করে আছে মানুষকে গেলার জন্যে। কিন্তু তারো চেয়ে বড় ক্ষুধার হাঁ মানুষের জঠরে। তারই তাড়নায় মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীতে, নদীরই স্রোতের মত বুভুক্ষু মানুষের স্রোত নিয়ে। জীবনেব কী বিচিত্র সংগ্রাম!

আমি যে দ্বীপে চলেছি—সজনেখালির ব্যাঘ্র প্রকল্প ছাড়িয়ে সাতজিলিয়ার পরশমণি গ্রামে, সেখানে অরণ্য উন্মোচন করে মানুষের বসতি উঁকি দিতেই সংগ্রামী মানুষের নজরে পড়েছে সেই ওড়িয়া সাধুকে। নবোদ্গত মানুষের গৃহের পাশে দেখা গেছে সেও ঝলমল করেছে ছোট একটি কুটীর নিয়ে। সঙ্গে তার বিগ্রহ—জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রার। কবে এল, কবে বসল সাধু সেখানে, কেউ জানে না। পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা সেই দারুকাষ্ঠের মতই সে যেন এক অলৌকিক অতিথি। কত তার বয়স কেউ জানে না। কবে এল—লটের ইতিহাসের পাতায় তার হিসেব নেই। সেখানে সে স্থাপন করেছে পরশমণি শ্রীক্ষেত্র আশ্রম।

সেই-সাধু কি করে একদিন কলকাতায় এল কে জানে! টালিগঞ্জ ইউ-নাইটেড ব্যাঙ্কে কাজ করে ভূধর মণ্ডল—এল তার সঙ্গে আমার কাছে—বলল, যেতে হবে সুন্দরবনে, জগন্নাথের কাছে। তাঁর অনুষ্ঠানে বলতে হবে ধর্মকথা।

পদ্মানদীর ওপারে খালবিল নদীতে ভরা বাংলার আম জাম হরিতকি সুপারী আর বটের ছায়া ছাড়িয়ে, বেতসবনের সবুজের অঞ্চল ছেড়ে, বাঁশবনের মর্মর ধ্বনি বহু দূরে ফেলে রেখে কবে সেই দেশ বিভাগের (১৯৪৭ খৃীঃ) সময় এপার বাংলায় এসেছি প্রবাসী হয়ে, গ্রামে নয়, শহরে, সেও যেন আজ ধূসর স্মৃতি। 'ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট'—তারই মধ্যে বাস এখন শহরে, কলকাতায়; ধলেশ্বরীর সোঁদাগন্ধ, ঘেঁটুফুলের ঘ্রাণ, পলাশ শিমুলের রঙ, সব ভুলে গেছি। বকুল রজনীগন্ধা কিছু মনে নেই। এমন কি সেই স্বর্ণচাঁপার কাঁঠালীগন্ধ, বকুল ফুলের সোহাগ, শিশির সিক্ত শেফালী ফুলের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, স্থলপদ্মের সচকিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখ, কিছুই আর তেমন মনে নেই। তবুও পলি-মাটির স্তরে স্তরে কলকাতার নিচে যেমন রয়েছে সুন্দরবন, তেমনই বোধহয় আমার অন্তরের অন্তস্তলে কোথাও বেঁচে ছিল সেই সব স্মৃতি—সাগর বেষ্টিত সুন্দর-বনের গা ঘেঁষে এক খণ্ড নতুন প্রকৃতির আহ্বান পেতেই সেই স্মৃতিগুলো যেন

কলকলিয়ে উঠেছিল মনের গভীর গহন থেকে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের জড়তা, সভ্যতার অভিশাপে জর্জরিত কঙ্কালসার দেহ নিয়ে ক্ষীণ প্রাণস্রোতী আমিও হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলাম নতুন এক প্রাণের আবেগে। বিদিশার নেশার মত শৈশবের নেশা যেন অপ্রতিহত আহ্বানে ঠেলে উঠল ভেতর থেকে ঃ—চল্ চল্ দেখে আসি যদি পাই হারানো অতীত।

ক্যানিং থেকে ভট্ভটি—পানসির মত এক ধরনের নৌকো আমাদের নিয়ে চলল বহুদূর সমুদ্রের মুখোমুখি এক দ্বীপে—যেখানে আছে শতভঙ্গ বঙ্গতটে ওড়িষা থেকে আসা এক সাধু—আর কলিঙ্গের সেই ত্রয়ী প্রাণ – জগন্নাথ, বলভদ্র সুভদ্রা—সৎ + চিৎ + আনন্দ।

লোকে বলে নদী। আসলে খাড়ি। সাপের মত মুখ বাড়িয়ে ডাঙ্গায় ওঠার প্রচেষ্টায় অক্টোপাশের শুঁড়ের মত সমুদ্রের মুখ—ধরণীর অভ্যন্তরে ঢুকেছে হয়তো অপরাজেয় ক্ষুধার তাড়নায় কিংবা প্রবল কৌতূহলে মৃত্তিকার অপার রহস্যের স্বাদ নেবার জন্যে। জোয়ারে ফুলে ফেঁপে উঠে টই-টম্বুর হয়ে সমুদ্রের মত বিশাল আকার নেয় খাড়িগুলি, আবার ভাটার টান পড়লে নেতিয়ে পড়ে ওলাওঠা রুগীর মত। নদী দেখেছি ধলেশ্বরী, দেখেছি পদ্মা, যমুনা —গঙ্গা। কিন্তু খাড়ি আগে কখনও দেখিনি। রওনা হবার মুখে কচি শিশুর মত নেতিয়ে পড়া নদী। কত বর্ণনা শুনেছিলাম মাত্‌লা নদীর উন্মাদ তরঙ্গক্ষুব্ধতার। তার কিছুই নেই। এঁকে বেঁকে দ্বীপ তৈরি করে কি ভাবে সমুদ্রে পড়েছে ভাটার টানে খাড়িগুলি কে জানে! ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দ্বীপের পর দ্বীপ তৈরি করে এগিয়ে গেছে বা পিছিয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে। দুধারে জল প্রান্তর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। কোথায় সজনেখালি, তার পরেও বঙ্গোপসাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দ্বীপ। কতদূর, কোথায় সে দ্বীপ কে জানে!

নেতিয়ে পড়া খাড়ির বুক চিরে ভট্ভটি এগিয়ে চলেছে। আমার পাশে বসে সোনারপুরের ভূধর মণ্ডল। যেখানে যাচ্ছি সেখানকারই সে আসল অধিবাসী। আদিবাস খুলনায়। সাহেবরা তার পূর্বপুরুষদের সুন্দরবনে নিয়ে এসেছিল বন কেটে বসত তৈরির জন্য। অরণ্যের সঙ্গে, শ্বাপদের সঙ্গে, ভুজঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে তাদেরই জয় হয়েছে। অরণ্য পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁয়ে আরও নির্জন এক দ্বীপে গিয়ে শশাঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আশে পাশে জনপদের দিকে। বাঘ হরিণ শুয়োর সবই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের চির কালের সঙ্গী অরণ্যের সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপে। ওরাও হয়তো থাকত না—মানুষের অবিনাশী দুর্নিবার ক্ষুধার কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষই যদি এগিয়ে না আসতো ঐ সামান্য একটু অঞ্চল রক্ষা করতে—প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রকৃতির ঐ অঞ্চলটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে, অরণ্যের শেষ কিছু শাশ্বত সঙ্গী বনচারী জন্তু-জানোয়ারকে টিকিয়ে রাখতে। মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে হটতে হটতে

অরণ্য এসে শেষ পর্যন্ত পশ্চাতগামী পরাজিত সৈনিকের মত শেষ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়বার সুযোগ পেয়েছে এখানে এসে—অবশ্য শত্রুদেরই বদান্যতার ফলে। খাড়ি ঘেরা দীর্ঘরেখা সুন্দরবন সুন্দরীবৃক্ষের অজস্র সমাহারে শঙ্কাকাতর দৃষ্টিতে খাড়ির চারদিকে বিচ্ছিন্ন নানা জনপদপূর্ণ দ্বীপ দ্বারা বেষ্টিত। ওধারে দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের সুনীল বুকে অরণ্যের দৃষ্টি কি রকম কে জানে! খাড়ি থেকে জলধির সেই অপার বিস্তৃতি দেখা যায় না।

অরণ্যকে হারিয়ে দিয়ে—নির্মূল করেও মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়নি। সংক্ষিপ্ত পরিসরের ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ মানুষকে বাঁচার নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারে নি। পারেনি হয়তো এই কারণে যে, এখানে মানুষই মানুষের ভক্ষক হয়ে স্বল্প মানুষ অধিকাংশ মানুষকে উচ্ছেদ করেছে বলে। কিন্তু প্রাণের সংগ্রামের তাগিদ—সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকেই বন্ধ হয়নি তো কোনো মুহূর্তেই। আহার্য সন্ধানে ভূমি থেকে বিতাড়িত মানুষ তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীর বুকে। প্রাণের বাঁচার তাগিদ এমন যে, কুমীরের ভয় নেই, জোয়ারের জলে ভেসে যাবার ভয় নেই। দলে দলে মানুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সূর্যমুখী ফুলের মত সার বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীর কিনারে কিনারে। নদীমাতৃক দেশের মানুষ হয়েও, খাল বিল জল ঠেলে সংগ্রাম করা মানুষ হয়েও জলচর এমন মানুষের দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি। কাতারে কাতারে মানুষ তীরে নেমে ছোট ছোট জাল টানছে মাছ ধরবে বলে, মাছের বাচ্চা—যারা হাত ঘুরে ঘুরে যাবে ক্যানিং বন্দরে মহাজনের কাছে— খাড়ির প্রাণের বীজ মানুষের কৃত্রিম পুকুরে বড় হবে মানুষেরই খাদ্য হবার জন্য। জীবন কী আশ্চর্য! জীবনের উপর জীবন বাঁচে। ছিন্নমস্তা হয়ে নিজেই ভোক্তা, নিজেই ভোগ, নিজেই ভোগ্যে পরিণতি লাভ করে। মানুষ খায় অরণ্যের হরিণ, বাঘ খায় মানুষকে, সাপ দংশন করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। নদীকে তচনছ করে দেয় মানুষ। নদী জোয়ারের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে। মাছের জন্য মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে—নদীর কুমীর তুলে নিয়ে যায় মানুষকে—সত্যিই কি বিচিত্র সংগ্রাম! দেখতে দেখতে চলেছি নদীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম-লীলা। লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত হয়তো সখ্যতা হয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। নদী ভালবেসে ফেলেছে মানুষকে। মানুষ নদীকে। যেন ভালবাসার এক অনন্ত লীলা চলেছে মানুষে সলিলে।

আমার এক বদ্ধমূল ধারণা সেই ছেলেবেলা থেকেই—তিন ভুবনের কোথাও—প্রাণহীন নয়। দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষলোকে, ভূলোকে—সর্বত্রই প্রাণ। মাটিতে প্রাণ আছে, বৃক্ষে, নদীতে, সর্বত্র। জড় বস্তুও জড় নয়, রুদ্ধ প্রাণের আবেগে সে ভরপুর। দ্যুলোকে শক্তিস্রোত প্রাণময়, মনময়, ভূলোকে জড়পিণ্ডে রয়েছে আবদ্ধ প্রাণশক্তি $M=Ec^2$

দেখতে দেখতে চলেছি প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিচিত্র জড়াজড়ি। এই দেখতে দেখতেই যেতে হবে সারাদিন খাড়ি থেকে খাড়ি ঘুরে চাঁকপাক খেতে খেতে

আমাদের লক্ষ্য সেই খাড়ি ঘেরা দ্বীপটি —সাতজেলিয়া ; যেখানে যেতে যেতে সূর্য তার কৌতুকের দৃষ্টি নিভিয়ে ফেলে নেমে যাবে দিগন্তের নিচে।

যেতে যেতে বাঁ দিকে আরও অনেক আগে এক বন্দর—অর্থাৎ গঞ্জ। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে শেষ প্রাণপ্রবাহ সরবরাহকারী গঞ্জ—গোসাবা। ভূধর বলল—স্যার, ঐ গোসাবা। খাড়ি এবার বাঁক নিলেই সামনে বাঁয়ে সুন্দরবন।

সেই ক্যানিং থেকেই নদীর বুকে ছোট ছোট জেলে ডিঙির সার। জীবিকার আশায় মানুষ ঘর বেঁধেছে জলের বুকে। যত এগুচ্ছি তত তা ঘন ঘিঞ্জি হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে খাড়ির বুকে, যেন বসন্তের কোন পুষ্পরঙিন বনে পুষ্প-দলের মাথায় মাথায় ভীড় করেছে মৌমাছির দল।

রওনা দিয়েছিলাম ভাঁটায়। ইতিমধ্যে জোয়ার এসেছে। খাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে কানায় কানায়। মাতলা ছেড়ে এসে পড়েছি বিদ্যাধরীর বুকে। কোন্ দুটি দ্বীপের ছিদ্র পথে সমুদ্রের হাওয়া এসে পড়ার সুযোগ পেয়েছে বিদ্যাধরীতে। খাড়ি তখন সমুদ্রের মত উত্তাল। ভট্‌ভটিটা দুলছে। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে ক্রুদ্ধ মিনাডের এলো চুলের মত আছড়ে পড়ছে ভট্‌ভটির দেয়ালে। ছলকে-ছলকে জল উঠে প্রায় ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের। আমাদের ভয়, কিন্তু এখানকার মানুষের ভয় নেই। মরিয়া মৌমাছির মত তবুও ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলের ঢেউয়ের উপর ছোট ছোট জেলেডিঙি। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত সেই উদ্দাম ঢেউয়ের চূড়া অগ্রাহ্য করে খাড়ির এপাড় থেকে ওপার ছুটছে কোথায় ঘোলা জলের বুকে মাছের গন্ধ আছে সেই খোঁজে। জলকে তাদের ভয় নেই, সে যেন আত্মীয়। জীবনের কী অপরূপ রূপ! ডিঙির সঙ্গে জলের, মানুষের সঙ্গে ডিঙির, মানুষের সঙ্গে জলের, সবার সঙ্গেই সম্পর্ক—প্রাণের, মনের, হৃদয়ের। এক পরম চিৎশক্তি থেকে যদি জগতের উদয়, জগতের কোন কিছুই প্রাণহীন হতে পারে না, মনহীন হতে পারে না, হৃদয়হীন হতে পারে না। সপ্রেম দৃষ্টিতে যদি চতুষ্পার্শ্বে তাকানো যায় তা হলে দেখা যাবে, সমান সাড়া আসছে সকল দিক থেকেই।

বিখ্যাত এক পণ্ডিত অধ্যাপক এসেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ইউ. জি. সি অধ্যাপক। প্লেটোর তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—যে বিষয়ের উপর শিল্প সৃষ্টি হয়, খোদাই হয়, অঙ্কিত হয়—তাদের উপর কি শুধু মানুষের মানসক্রিয়াই পড়ে, না, বিষয়েরও একটা মানসিক রিফ্লেকশন আছে মানুষের মানসের উপর ?

জবাব দিয়েছিলাম—বিষয়েরও রিফ্লেকশন আছে।

—কিন্তু লোকে বলে বিষয়ের কোন রিফ্লেকশন নয় আছে রি-অ্যাকশন।

—কিন্তু আমি মনে করি রিফ্লেকশনও আছে।

অধ্যাপক বললেন—'আমারও তাই মনে হয়। শুনেছি স্যার জগদীশ বসুও সেরকমই ভাবতেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার স্পষ্ট জানা নেই।'

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই বিপুল প্রাণের সাড়া আছে, মনন আছে, বোধ আছে. এ বিশ্বাস আমার চিরদিনই। এই ধরণী, এই মৃত্তিকা, এও প্রাণময়। আমাদের মতই শ্বাস প্রশ্বাস আছে আমার কেন যেন এমন মনে হয়। বহুদিন পরে এ বিষয়ে একটা আশ্চর্য বই আসে আমার কাছে। বইটির নাম—The Secret Life of Plants. লেখক হলেন Peter Tompkins and Christopher Bird. আমাদের অভিমতকে সমর্থন করে সেখানে এক আশ্চর্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে C. W. Bradley নামে লণ্ডনের এক গবেষক তাঁর নিজের ঘরের টেলিভিসন টিউবে আমেরিকার হাউসটন KLEE TV-থেকে আসা call letters ধরে নেন। সেই কল লেটারগুলি কয়েক মাস ধরে ইংল্যাণ্ডের Lancaster শহরের Atlantic Electronics LTD-র T. V-এর স্ক্রীনে লক্ষ্য করা যায়। এই সিগন্যাল বছর তিনেক আগে হাউসটন থেকে এসেছিল। কি করে এটা সম্ভব, ভাবতে ভাবতে ধরা পড়ে যায় এক ধরনের plasma cloud যা নাকি পৃথিবীর উপর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই প্লাজমার সাহায্যেই ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে Dr. Frank Drake দেশ (space) থেকে রেডিও ওয়েভ ধরার প্রয়াস পান। কোন নিকটবর্তী সৌরমণ্ডল থেকে পাঠানো বুদ্ধিমান কোন জীবের signal ধরা যায় কিনা সেই চেষ্টাতে তাঁরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। যে প্লাজমা রয়েছে মানুষের মধ্যে, জীবে, সর্ব প্রাণে, আমাদের এই আপাত জড় ধরণীও তা থেকে মুক্ত নয়। এই প্লাজমারই সাহায্যে প্রাণের স্পন্দনে সেও স্পন্দিত।

শুধু সমগ্র পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর জড় পদার্থ নামে পরিচিত প্রতিটি জিনিসেই এই প্রাণের সাড়া রয়েছে একথা প্রমাণ করেছেন ভারতগৌরব স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বোস অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, রেডিও ওয়েভ ধরার জন্য যে metallic coherer রয়েছে—অনবরত তাকে ব্যবহার করা হলে তার স্পর্শকাতরতা কমে যায়। এটা লক্ষ্য করে বোসের ধারণা হয় যে, প্রাণীর মত ধাতব জিনিসেরও স্নায়বিক ক্লান্তির মত ক্লান্তি আছে। এই ক্লান্তি ধীরে ধীরে তার উপর এক ধরনের মাসাজ চালালে, বা উষ্ণ জলে স্নান করালে সেরে যায়। কোন ধাতব দ্রব্যের উপর অ্যাসিড জাতীয় কোন রাসায়নিক কিছু ঢেলে দিলে ধাতুর উপর যে দাগ পড়ে—তা ঘষে সমান করে দিলেও, যে-ধাতুর উপর সেই অ্যাসিড পড়েনি তার মত সহজ স্বচ্ছন্দ সে হতে পারে না। বোসের ধারণা, দুইয়ের মধ্যে এই সমতার অভাব হয়— ধাতব দ্রব্যের মধ্যে যে স্মৃতিশক্তি আছে সেই জন্যে। আহত ধাতব দ্রব্য সেই অ্যাসিড-দাহের যন্ত্রণা স্মরণ করতে পারে। পটাসিয়ামের উপর যদি—তার সঙ্গে মোটেই সহমত নয়—এমন কোন তরল রাসায়নিক পদার্থ ঢেলে দেওয়া যায়—সেই যন্ত্রণা সে কখনও ভুলে যেতে পারে না। তার ক্ষত অনিরাময়যোগ্য হয়েই থাকে। মানুষের স্নায়ু বিষ প্রয়োগের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় পটাশিয়ামের প্রতিক্রিয়াও ঠিক অনুরূপ।

এই জন্যে স্যার জগদীশ বোস ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে বলেছিলেন যে, জগতের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐক্যের সুর রয়েছে। তিনি বলেছিলেন—It is difficult to draw a line and say that here the physical phenomenon ends and here the physiological begins. ভারতীয় তন্ত্রে এই জন্য বলা হয়েছে—বস্তু হল শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। 'Matter is thus manifestation of spirit.' এই বিশ্বাসকেই আইনস্টাইন তার $E=Mc^2$-এ প্রতিধ্বনিত করেছেন)

পদার্থবিদেরা বোসের এ ধরনের পরীক্ষামূলক বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করলেও দেহতত্ত্ববিদেরা এ ধরনের সিদ্ধান্তকে একেবারেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না, কারণ, জৈবদেহ সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখার অধিকারকে তাঁরা নিজেদের এক-চেটিয়া অধিকার বলে ভাবতেন, পদার্থবিদ্‌দের এ রাজ্যে কোন ধরনের অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোস ব্র্যাডফোর্ডে পদার্থবিদ্‌দের একটি সম্মেলনে তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য ধাতবস্নায়ুর ওপর Hertzian Waves প্রয়োগ করে এবিষয়ে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তিনি জৈব দেহতত্ত্ববিদ্‌দের পদ্ধতি প্রয়োগ করেই দেখিয়ে দেন যে, জৈব-স্নায়ুর মতই ধাতব স্নায়ু উত্তেজক, নিস্তেজক। বিষাক্ত ড্রাগ প্রয়োগ করা হলে উভয়েই সমান সাড়া দেয়। অর্থাৎ জড় পদার্থেরও যে প্রতিক্রিয়া নয় রিফ্লেকস অ্যাকসন আছে বোস তা প্রমাণ করেন।

বহুদিন আগে পারস্যের এক কবি ওমর খৈয়ামও বোধহয় জানতে পেরে-ছিলেন যে, জড় পদার্থের প্রাণ আছে, বোধ আছে, ব্যথা আছে, বেদনা আছে, তাই লিখেছিলেন :

> সাঁঝের ঝোঁকে দেখনু সেদিন হাটের মাঝে কুম্ভকার।
> নিঠুর হাতে ঠাসছে সে এক পিণ্ড ভিজা মৃত্তিকার।
> মাটির ঠোঁটে ফুটল বাণী আওয়াজটা তার বেজায় ক্ষীণ—
> আস্তে ভায়া, আস্তে পেষো নেহাৎ এ-জন ভাগ্যহীন।

ছোটবেলা থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল প্রকৃতি হৃদয়হীন নয়, নীরব অস্তিত্ব মাত্র নয়। যেদিকেই তাকাতুম—গাছ গাছালি, মাটি, ঘরের দেয়াল, ইঁট, কাঠ, পাথর—মনে হত ওদেরও সবারই চোখ আছে। ওরাও আমাকে দেখতে পায়। আমি হৃদয়ের যে বোধ নিয়ে তাকাই ওরাও সেই সমবোধে সাড়া দেয়। মনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে ওরা হৃদয়ের জানালা বন্ধ করে দেয়, চোখ বুজে। সপ্রেমে তাকালে অসংখ্য ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে দেখে। হৃদয়ের ভাব তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত করে দেয়। কোয়ান্টাম ফিজিক্স আজ বস্তুবিজ্ঞানকে মরমিয়া দর্শনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। মরমিয়া সাধকদের অন্তর্দৃষ্টিকে সমর্থন জানাচ্ছে। আর কতদূর এ বিজ্ঞান এগুতে পারবে কে জানে!

আমার এই হৃদয়ের সহজাত অনুভূতিকে আরও একটু তীক্ষ্ণ এবং ধারালো করতে পেরেছি—হিমালয়ের এক প্রবাদপুরুষ যোগীশ্রেষ্ঠ কোন এক অতিমানবের কল্যাণে। তাঁর অকারণ—করুণায়—যোগ রহস্যের এক মায়া চাবি এসে গেছে আমার কাছে—যে চাবি দিয়ে অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যময় দরজার দুয়ার খোলা যায়। এখানে যোগ-সাধনার এক নতুন পদ্ধতি—যা প্রচলিত সকল রীতি নীতি ও বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত মেরুপ্রান্তিক—অথচ অধিমনোবিজ্ঞানের গভীর গহনের খবর জানা থাকলে প্রতীয়মান হবে যে, নির্ভেজাল বিজ্ঞানভিত্তিক, যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষের জৈব দেহের মাত্রা বেড়ে যায়—তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা থেকে মানুষ অতি সহজেই পঞ্চম মাত্রায় উঠে যায়—দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ রহস্যময় এক জগৎ বাইরে বেরিয়ে এসে অন্তরকে অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। দৃঢ় এই বোধ জাগিয়ে দেয় যে, অনন্তে আর অন্তরে কোন ভেদ নেই। মহাকাশের নেবুলা—ঘূর্ণায়মান ছায়া, নক্ষত্র, গ্রহ, গতিময় দেশ, অনন্ত দেশ—সবই সূক্ষ্ম বীজের মত এই দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তরে বাহিরে তখন আর কোন ভেদাভেদ থাকে না, মনে হয়—সবই আমি। ধ্যান যোগে মুহূর্তের মধ্যে এক জ্যোতির্লোকে চলে যাওয়া যায়। তখন চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হয় যে—অন্ধকার ঘরে চার দিকে তাকালেও অন্ধকার দেখা যায় না। জ্যোতির্ময় কুয়াশা অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আলোর দরকার হয় না—, দেখা যায় নিজের দেহ থেকেই আলো বেরুচ্ছে—প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে, দেয়ালের গণনাতীত রন্ধ্রপথ দিয়ে। জড়বস্তুর হৃদয়ের জ্যোতি বাইরে এসে নিজেকে প্রকাশিত করে দিচ্ছে। জ্যোতিতে জ্যোতিতে মিলে যাচ্ছে, ভাবে ভাবে ভাব বিনিময় হচ্ছে।

এর প্রমাণ যে কোন লোকই পেতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখবেন—নতুন কোন জায়গায় গেলে স্বাভাবিক স্বস্তির ভাবটা পাওয়া যায় না। কিসের একটা অভাবে যেন দেহ মন ছট্‌ফট্‌ করে। এই অভাবটা পরিচিত পরিবেশের অভাব। যেখানে লোকে থেকে থেকে অভ্যস্ত সেখানে পরিবেশের সঙ্গে তার একটা সহ-মর্মিতা গড়ে উঠে। সে চেনে পরিবেশকে, পরিবেশ চিনে ফেলে তাকে। দুইয়ের মধ্যে অপরিচিতির আড়ালটা দূর হয়ে যায়—, আপন বোধের অন্তরঙ্গ ঢেউয়ের সাড়া লাগে পরিবেশেও। ভালবাসার ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে ওঠে চার পাশের গাছ, গাছালি, ঘর বাড়ি, খাট, চৌকি, সব। কিন্তু অপরিচিতকে দেখে পরিবেশ কচ্ছপের মত নিজের হৃদয়বৃত্তিকে গুটিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে পরিচয় হলে সেই সন্দেহের ভাবটা তার কেটে যায়। তখন অগণিত অজস্র ফোকর দিয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভাবটা তার বেরিয়ে আসে ঢেউয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভাল লেগে যায় পরিবেশকে। ভাল লাগে পরিবেশ তার হৃদয়ের অনাবিল দুয়ার খুলে দেয় বলে। যোগমার্গের যে-কোন পথিক নির্দ্বিধায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এই বক্তব্য সত্য কী না।

এ যোগ ঐতিহ্যবাহী সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট নয়। নাক টেপাটেপির বালাই নেই এখানে। মনকে চাবুক কষারও দরকার নেই। রমণী-নারীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবারও প্রয়োজন হয়না। রক্তাম্বর বা গৈরিক সব বসনই অর্থহীন এখানে। আতপ চাল আর কাঁচকলা সেদ্ধর প্রয়োজন নেই। নেই স্নান, আসন, ধূপ ধুনো, মন্ত্র তন্ত্র কোন কিছুই।

হাসি পায়। মন্ত্র লোকে পড়ে বটে, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ জানে কজন! স্পষ্ট করে লেখা হলে হয় স্তব বা সূক্ত। তার বাহ্য অর্থ নস্যটেপা পণ্ডিতেরা ভালই জানেন। কিন্তু গূঢ় অর্থ? বড় এক পণ্ডিত পুরোহিত। প্রকাশকের কাছে এলেন মন্ত্রের বই ছাপতে। জিজ্ঞেস করলুম—মন্ত্রের বই ছাপছেন মন্ত্রের অর্থ জানেন? এক টিপ্ নস্য নিয়ে অবজ্ঞা ভরে তিনি বললেন, জানব না কেন? জিজ্ঞেস করলুম, এই মন্ত্রটির যথার্থ অর্থ কি বলুন তো ঃ— মহাকালেন সমং চ, বিপরীত রতাতুরাম।' পণ্ডিতটি বাচ্যার্থ করলেন ঃ মহাকালের অর্থাৎ শিবের সঙ্গে শক্তি (৺কালী) বিপরীত রতিক্রিয়া সম্পন্না।'

—এরকম রতিক্রিয়া অর্থাৎ sexual relation তো পারভারশনের নমুনা। তাই না?

পুরোহিতটির মুখে জবাব নেই।

বললুম, বাচ্যার্থে মরমিয়া সাধকের ভাবার্থ বুঝতে পারবেন না।

তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম Bigbang তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, কি ভাবে জগৎ তৈরি করে গোলক আকার শক্তি শূন্যতার উপর আবর্ত তৈরি করে সৃষ্টি রূপে প্রকাশ পায়। শূন্যতাই পুরুষ—শিব। শক্তি—৺কালী—শূন্যতার চার পাশে অর্থাৎ তাকে নিচে রেখে আবর্তে আবর্তে বেড়ে উঠে জগৎ সৃষ্টি করে। আসলে বিপরীত মৈথুনের গূঢ়ার্থ রয়েছে সেখানে।

বললুম, এতো সূক্ত, থাক্। এবার বীজ মন্ত্রের অর্থ বলুন শুনি। শক্তি আরাধনায় এই বীজ মন্ত্রটি আছে—ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং মহাকাল ভৈরব সহিত শ্রীমৎ দক্ষিণা কালীকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। এর মধ্যে বীজ মন্ত্রগুলির অর্থ বলুন—ক্রীং ক্রীং ক্রীং, হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা। মন্ত্রের অর্থ হল মনন করে যে শব্দ উচ্চারণ করলে তা তারণ অর্থাৎ 'ত্র' করে তাইই মন (মনন) ত্র (তারণ)। অর্থ না জেনে মন্ত্র উচ্চারণ করলে তা নিষ্ফল। আপনার পাণ্ডুলিপিতে তো ঐ বীজ মন্ত্র রয়েছে দেখছি। এর অর্থ বলুন?

পণ্ডিত পুরোহিতটি নীরব। সত্যিই এই বীজ মন্ত্রের অর্থ তাঁর জানা নেই। তখন নিজেই আমি এর অর্থ তাকে বুঝিয়ে দিলুম ঃ —('ক'-হল ৺কালী। 'র' ব্রহ্ম, 'ঈ' মহামায়া, 'নাদ' বিশ্বমাতৃকা, 'বিন্দু' দুঃখনাশক। সংক্ষিপ্ত অর্থ হল ৺কালী দুঃখ নাশ করুন। হূং অর্থ—'হ'—দেবী, শিবরূপ 'ঊ' ভৈরব, 'নাদ' 'পর (সর্বোত্তম) বিন্দু—দুঃখ নাশক। একে বলা হয় বর্ম-বীজ—অর্থাৎ রক্ষাকারী।

বীজ। ফলে মূল অর্থ দাঁড়ায়—'রক্ষা কর'। হ্রীং অর্থ—'হ্' শিব, 'র' প্রকৃতি, 'ঈ' মহামায়া, 'নাদ'—বিশ্বমাতৃকা, 'বিন্দু' দুঃখ নাশক। এ হল ভুবনেশ্বরী মন্ত্র। এর অর্থ হল দেবী ভুবনেশ্বরী দুঃখ নাশ করুন। ফট্=সর্বাঙ্গে। স্বাহা=প্রণিপাত করি।)

(মন্ত্রকে তন্ত্রে বলা হয়েছে দেবতা। মন্ত্র উচ্চারণ কালে দেবতা প্রথম শব্দের মধ্যেই আবরিত থাকেন। ক্রমশঃ মন্ত্রের অর্থবাচক চিন্তা রূপ নেয়। সুতরাং মন্ত্র এবং দেবতা একই জিনিস। জপ করে প্রথম আহ্বান করা হয় বর্ণকে। বার বার মন্ত্র জপ করা হল ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে তোলার প্রচেষ্টার মত। দুই ঠোঁট হল শিব এবং শক্তি। তাদের নড়াচড়াই হল মৈথুন। এর ফলে যে শব্দের উদয় হয় তাই হল বিন্দু। বিন্দু থেকে দেবতা আত্মপ্রকাশ করে, যেন সাধকের মানসপুত্রের মতন। মন্ত্রবিদ্যা এই জন্যে মূলত হল 'চিন্তা বিজ্ঞান।')

এই শব্দের উৎস হল বিশ্বমানস। এর মধ্যে প্রথম গ্রাহক (যে মন গ্রহণ করে) এবং গ্রাহ্য (স্বীকৃত বিষয়) একত্রে যুক্ত থাকে। তখনও অর্থ অর্থাৎ বস্তুরূপে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় না। যে মন চিন্তা করে তাই শব্দ। বিষয়রূপে যখন তা আবির্ভূত হয়—তখন হয় অর্থ। সুতরাং প্রত্যেকটি শব্দের যখন অর্থ প্রকাশ পায়—তখনই তা দেবতা রূপে ফুটে ওঠে। অর্থ না বুঝে বীজ মন্ত্র জপ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। মন্ত্রের অর্থই যদি প্রকাশ করে না দেন—তাহলে বীজ মন্ত্র জপ করে কি হবে?

সেই পণ্ডিত পুরোহিতটি আর কোন শব্দ করেন নি। পাণ্ডুলিপিটি ছাপতে দেন নি, সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

কথায় কথায় বহুদূর এগিয়েছি। জড়পদার্থও প্রাণময়, চৈতন্যময় এটা বোঝাতে গিয়ে একেবারে মন্ত্রে পড়েছি—অর্থাৎ মন্ত্রই—অর্থাৎ আদি মানস সত্তাই বস্তুরূপে রয়েছে এই তত্ত্বে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এবার এসব থাক। যে পথ ধরে এগিয়ে চলেছি সে পথ ধরেই এগুনো যাক। বিদ্যাধরীর বাঁকে বাঁকে চার-দিকের দৃশ্যই দেখা যাক।

দুই

বুভুক্ষু মানুষের পেটের ক্ষুধার কাছে আরণ্যক সৌন্দর্যের কোন মানে নেই। আকাশের চাঁদ যেন 'ঝলসানো রুটি'। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। তাই দিগন্তব্যাপী কোথায় হারিয়ে গেছে আদিম অরণ্যের ঘন বিস্তার। মাঠ মাঠ আর মাঠের পরে মাঠ। মাঠ গিয়ে ছুঁয়েছে ওপারে নুইয়ে পড়া দিগন্তে। শুধু মাঠের পরে মাঠ। জনবসতির লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তবু খাড়িরও

বোধহয় সৌন্দর্যবোধ আছে—মসৃণ করে তীর কেটে কেটে ভূখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে ঢুকে গেছে। খাড়িও পাছে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এই ভয়ে মানুষ—খাড়ির দুধারের উচু দেয়াল বেঁধে দিয়েছে ইঁটের পর ইঁট দিয়ে। এতেই বোধ হয় মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে খাড়ি। হঠাৎ যখনই মনে হয়েছে মানুষ বড় বিশ্বাসঘাতক, তখনই যতটা পারে খুবলে নিয়েছে ইঁট বাঁধানো চাতাল। গৈরিক উদাসীন ইঁটের চাতালে খেয়ালী শিশুর মত অর্থহীন চিত্র অঙ্কন করে গেছে। যে মানুষকে সস্নেহে নিজের বুকে মাছ ধরার সুযোগ করে দিয়েছে খাড়ি, তারই কিনা এত অবিশ্বাস জোয়ারের খাড়িকে! পারলে মাঝে মাঝেই কুমীর দিযে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অতি লোভাতুর কিছু কিছু মানুষকে। কখনও বা রাগ করে জোয়ারের টানে ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে গিয়ে ঘূর্ণীজলে চুবিয়ে মারছে। তবে সবটাই হয়তো সাময়িক আক্রোশ। আবার সে অনাবিল জোয়ারের ঢেউ তুলে এগিয়ে গিয়েছে বন্দরে বন্দরে ছোঁয়াছুঁয়ি করে ডাঙার বুকের দিকে—কখনও আবার উদ্দাম সেই প্রাণের স্রোত ঢেলে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে ভাটার টানে। অধিকাংশই মাটির ঘর, খাড়ির ধারে ধারে দুধারে। পায়ে হাঁটার পথ চলে গেছে খাড়ির মর্জির সঙ্গে বাঁক খেতে খেতে। মাঝে মাঝে কিছু ঝাঁকড়া-চুল গাছ বেশ যেন পরিপাটি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সার বেঁধে খাড়ির ধার দিয়ে। ইঁট বাঁধানো পাড়ের দেয়ালের জন্যই বোধহয় ডাঙার আবহাওয়াতেও লেগেছে গৈরিক ছায়া। অনেকটা যেন ঝিলমের বুকে বোটে বসে, ওপারে দাঁড়ানো কাশ্মীরের উপত্যকা দেখার মত। একটা ধোঁয়াচ্ছন্ন স্বপ্নময় গৈরিকের ছায়া সেখানে। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তদেশে এমন সুন্দর স্থান আছে আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিছুটা এর ঝলক দেখেছি মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের লালমাটির উপর ঘন সবুজ গাছের নিচে, কিছুটা আভাস পেয়েছি দার্জিলিং-এ উঠে মহাকালের মন্দির থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে বা লছমন ঝুলা থেকে পায়দলের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে অলকনন্দার ওপারে নবনির্মিত যন্ত্রযানের পথে।

বড় ভাল লাগছে দেখতে। খাড়ির ধারে ধারে জাল নিয়ে নিয়ে তখনও মানুষের ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্লান্তি নেই। মুগ্ধ চিত্তে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। কলকাতার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে এ যেন শিশির সিক্ত গ্রাম বাংলার শিউলিঝরা স্নিগ্ধতার মত প্রলেপ মাখানো।

আকাশে রোদের তেজ তখনও বেশ প্রখর। তবু ভট্‌ভটির দেয়ালের বেড়ার মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বেরিয়ে এসে ছাদে বসলুম ছাতা মাথায় দিয়ে। যতদূর দেখা যায় দেখছি, এধার ওধার। অকস্মাৎ যেন খাড়ির পাড়গুলো বড় বেশি রকমের খাড়া হয়ে উঠেছে। যত খাড়া দামোদরের বাঁধও নয়। খাড়িও মনে হয় নেতিয়ে পড়েছে। ভাটার টান পড়েছে হয় তো। বাঁ দিকে দেখি—অঙ্গবসন খুলে ফেলা হাড়গোড় বের করা এক গঞ্জের মত স্থান। ঘরগুলো ঝুঁকে পড়েছে খাড়ির জলের ওপর। ঘন জড়াজড়ি করা অরণ্যবৃক্ষের মত কিছু

গায়ে গায়ে লেগে থাকা ঘর। পাড়ে পানসীর মত বেশ কিছু ভট্ ভটি দাঁড়িয়ে। ভূধর বলল, স্যার এই হল গোসাবা বন্দর। ওপারে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত জনপদের একমাত্র গঞ্জ। মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, আটা, চাল, তেল, নুন সব এখান থেকেই যায় বাকী সব দ্বীপগুলিতে। এবার বাঁক ঘুরলেই দেখব সুন্দরবন।

সুন্দরবন। রূপকথার কাহিনীর মত শোনা কথা। দেখিনি কখনও। শব্দটা শোনা মাত্রই যেন শিহরণ বোধ করলাম প্রতিটি শিরায় শিরায়। খাড়ির ব্যাপ্তি যেন আরও ছোট হয়ে এসেছে। বোধহয় বড় রকমের ভাটার টান খাড়ির জলে। বললুম, কোথায় সুন্দরবন?

ভূধর বলল, বাঁক ঘুরে আর একটু এগুলেই বাঁয়ে সুন্দর বন, ডাইনেও। ডাইনে সজনেখালির সরকারি ব্যাঘ্র প্রকল্প।

আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলুম। খাড়ির ভাটার টান জলের প্রবাহকে তখন এত ছোট করে ফেলেছে যে—যেন আরণ্যক এক অজগরের মত এঁকে-বেঁকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে তা। খাড়ির মাতলামিও যেন অনেকটা কমে গেছে তখন। আর সামান্য একটু বাঁক ঘুরতেই ঝিলিক দিয়ে উঠল দুই ধারে ভেজা মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে গজিয়ে ওঠা ঘন সবুজের আস্তরণ।

ভূধর বলল, এই হল সুন্দরবন।

তাকিয়ে দেখলাম দুই দিকে। খাড়ির পাড় ঘেঁষে তখন বাঁধানো ইঁটের গৈরিকতা নেই। সোঁদা ধূসর মাটির ভাঙা ভাঙা প্রলেপ। বহু দূরে দিগন্তের কোন্ প্রান্তে গিয়ে সুন্দরী বৃক্ষসমূহের সবুজ শীর্ষ শেষ হয়ে সমুদ্রের বুকে ঝুঁকে পড়েছে কে জানে! আপাদমস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। ভূধর বলল, এটাই হল বাঘের রাজত্ব। তাদের অবাধ বিচরণ। আছে হরিণ, বুনো শুয়োর, অজগর আর শাখামৃগ।

ভটভটির মাঝি বলল, ঐ দেখুন স্যার, বাঘের পায়ের ছাপ। কালই এখানে তিনটে লোককে ধরে নিয়ে গেছে।

—লোকগুলো এখানে এসেছিল কেন?

—ব্যাঘ্র সুমারী করতে। বাঘ গুনতে। ঐ যে ছোট ছোট খালের মত ভেতরে ঢুকে গেছে—এখানে নৌকো ভিড়িয়ে—বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আন্দাজে একটা গণনা হয়।

—প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও গণনা!

—কী করবে স্যার, সরকার বাহাদুরের নির্দেশ।

—সরকার বাহাদুরের নির্দেশ হলেও প্রাণের ঝুঁকি নিতে লোকে স্বীকার করবে?

—প্রাণের ঝুঁকি যে দুই দিকেই স্যার?

—কী রকম?

—নিজের পেটের সংস্থান করতে হলে—বাঘের পেটে যাবার ঝুঁকি নিতেই হবে। হয় বাঘের পেটে যেতে হবে, নয়তো ক্ষুধার শিকার হতেই হবে। দুটোতেই যে মৃত্যু স্যার। ঐযে দেখছেন লোকগুলোকে নদীতে ঝাঁপাচ্ছে, জাল টানছে, এরাও তো যে কোন সময় বাঘের পেটে যেতে পারে, নয়তো কুমীরের। খিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য—বাঘ আর কুমীরের সেই জন্য তোয়াক্কা করে না এখানকার লোকেরা। এখানে শুধু দুটি পথই খোলা আছে আমাদের সামনে—হয় মৃত্যু, নয় জীবন। জীবনের জন্য যদি মরণকে বেছে নিতে হয়, নিতেই হবে। নইলে এমনিতেও তো মৃত্যু এসে দাঁত বের করে দাঁড়াবেই।

—বাঘ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ ধরে?

—সামান্য এই খাড়ির ধারের কথা কী বলছেন স্যার! ঐযে সার বেঁধে জেলে ডিঙিগুলো দাঁড়িয়ে আছে! রাতে একটু অসাবধান হলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাদেরও তুলে নিয়ে যায় বাঘেরা।

—এতদূর জলের মধ্যে এসে?

—কী বলছেন স্যার, এই মাঝ গাঙ্‌তো দূরের কথা, খাড়ির জল পার হয়ে ওপারে জনপদে গিয়ে কত মানুষজন গরু ভেড়া ছাগল ধরে নিয়ে আসছে!

—এর কোন বিহিত নেই?

—কি বিহিত স্যার?

—লোকের হাতে অন্তত বন্দুক থাকা উচিত।

—মাথা খারাপ! একটা বাঘ মারলে ফাঁসি হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ!

—বাঘের দাম যে মানুষের চাইতে বেশি আজ।

—বল কি?

—আশ্চর্যের কি আছে স্যার! বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আর মানুষের বাচ্চারা পিল্‌পিল্‌ করে বেড়ে উঠছে। একশটা বাঘ মারলে সুন্দর বনের বাঘই হয়তো সাবাড় হয়ে যাবে। কিন্তু কত মানুষ মরছে—মানুষের সংখ্যা তবু কমছে কই! একদিন দেখবেন কাটাকাটি হানাহানি করে মানুষ নিজেরাই মরে যাবে। জলদা পাড়ার গন্ডারের মত শুধু কয়েকটা মাত্র মানুষই বেঁচে থাকবে।

—কারা সেই মানুষ?

—যারা রাজনীতি করে স্যার।

—অর্থাৎ?

—ওদের আর গন্ডারের চামড়া সমান কিনা। গন্ডারের চামড়ায় গুলি ফিরে যায়। ওদের বুলেট প্রুফ গাড়ি গুলি ভেদ করতে পারে না।

বুঝলুম, মাঝিটি যথেষ্ট রসিক আছে। মার খেতে খেতে বুকের ভেতর থেকে এমন তিক্ত শিল্প বেরিয়ে আসছে। ও বলল, মন্ত্রীরা এখন দেবতার

মতন। চোখ নেই, কান নেই, লাজ নেই, লজ্জা নেই। যে সাধুবাবার মন্দিরে যাচ্ছেন, সেই সাধু বাবার বিগ্রহের মত—জগন্নাথের মত! ব্যতিক্রম শুধু এই যে, জগন্নাথ ঠুঁটো। হাত নেই, পা নেই। এদের হাত আছে—দুটোই, বিশেষ করে বাঁ হাত। পা আরও সচল। বিপদ দেখলে এখন দৌড়বে হয়তো সেই সুইজারল্যাণ্ড। আমাদের মধু আছে সুন্দরবনে। চুরি করতে গেলে বাঘের পেটে প্রাণ যায়। ওদের মধু আছে সুইস ব্যাঙ্কে—সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হাল্কা পায়ে ঘুরে বেড়ায়।

ভূধর ধমকে উঠল, অ্যাই, স্যারের সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস?

—না, দুটো মনের দুঃখের কথা বলছি।

—থাক। আর কথা বলতে হবে না। বাত্ থামা।

আমার সঙ্গে যাচ্ছিল খিদিরপুরের রায়বাবু, রাজেন রায়। আর বহুদিন বিদেশে থাকা ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতুল সাহা। সুন্দরবন দেখার স্বাদেই আমার সঙ্গ নিয়েছিল, নইলে আমার ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা শোনার মত ধৈর্য ওদের নেই। ওদের চোখ ছিল অরণ্যের রন্ধ্র পথে—যদি হঠাৎ বাঘ দেখা যায়, হরিণ অথবা বাঁদর। পাষাণ প্রাচীরে ক্ষয়ে যাওয়া চোখে বাসের ধোঁয়া, আর মাফিয়াচর কয়েকটি পকেটমার, পেটোহস্ত বা রাজনৈতিক মিছিল ছাড়া কলকাতায় আর দর্শনীয় আছে কি। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জিভের স্বাদ ফেরাতে যেমন পুদিনা পাতার ঝোল বা বেতের ডগা সেদ্ধ প্রয়োজন, তেমনই শহুরে জীবনে ক্লান্ত ওরাও, এসেছে চোখের স্বাদ ফেরাতে। ফুস ফুস ভরে একটু অনাবিল প্রকৃতির হাওয়া নিতে।

হঠাৎ রায়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐযে বাঘ! বাঘ! মাঝি স্টিয়ারিং নেড়ে বোটের হাল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—না স্যার, ওটা বাঁদর।

আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করলাম, না, বাঁদরই। এ-সব বাঁদর আর হনুমান দেখার অভ্যাস আমার বহুদিনের। কারণ, আমি বেড়ে উঠেছি সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড়ের কোলে, সাঁওতাল বস্তীর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আঙিনাতে। হরিণ, নীলগাই, ময়ূর, বাঁদর, বাঘ সবই আমার দেখা। তবে যাকে বলে রয়াল বেঙ্গল টাইগার—সেই ব্যাঘ্র মহারাজকে দেখিনি। সেজন্য একটা কৌতূহল আছে। তাই ফিরে তাকিয়ে বাঁদর দেখে হেসে উঠলুম।

কিছুকাল পরে বোটম্যান বলল, ঐ দেখুন স্যার হরিণ।

সকলেই চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। অরণ্যের গভীর ছায়া খাড়ির ধূসর মাটিতে এসেও পড়েছে। একটা সুন্দরী গাছের আড়ালে লাল রঙের একটা বড় হরিণ দাঁড়িয়ে ছিল একটু ক্যামোফ্লেজিং ভঙ্গীতে। অরণ্যের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের একটা সহমর্মিতা থাকার জন্য আমি তাকে দেখতে পেলেও ওরা পেল না। একটা হয়তো ব্যর্থতার বিষাদই লেগে গেল ওদের চোখে মুখে। ভট্‌ভাট তখনও অক্লান্ত ফুস ফুসে হাওয়া টেনে বোটটিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আর একটু এগিয়ে যেতেই ডাইনে পড়ল সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিস। খাড়ির জল থেকে ডাঙায় বেয়ে ওঠা কাঠের সিঁড়ি। ঘেরা বাংলো। কাঠের দণ্ডের উপর প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক মানুষের ঘরের মত মাচান ঘর—যেখানে দাঁড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে মানুষ কদাচিৎ কদাচিত, স্বাধীন অরণ্যের অবাধচারী বাঘ দেখে। কলকাতার চোখগুলো প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল।

খাড়িটা আরও নেতিয়ে পড়েছে। দু-ধারের সুন্দরীবৃক্ষগুলো যেন ঝুঁকে পড়তে চাইছে ভটভটিটার উপর। স্যাঁতসেঁতে মাটি। যেন অনবরত খাড়ির জল শুষে নিয়ে নিজের পেট ভরাচ্ছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা যেন কোনদিনই তার মেটার নয়। খাড়ির জল বোধহয় তার এতটা আগ্রাসন পছন্দ করে না। তাই ধারালো দাঁতে যেখানে পারছে সেখানেই খাবলে দেবার চেষ্টা করছে মাটির কোমর। কিন্তু মাটির অতন্দ্র প্রহরী হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে অনুগত সৈনিকের মত গণনাতীত সুন্দরীবৃক্ষ। বাঘের থাবার মত শেকড়গুলো বাড়িয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে চাক চাক মাটি। খাড়ির জোয়ারের জলকে তীর কেটে ভেতরে ঢুকতে দেবে না কিছুতেই।

একদিন গঙ্গা পর্যন্ত বোধহয় বিস্তৃত ছিল সুন্দরবনের সাম্রাজ্য। মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে ধীরে ধীরে তিলে তিলে ইঞ্চির পর ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিয়ে ক্রমশ তাকে পিছু হটে যেতে হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। নিজের বুকের নিচে সন্তানের মত পুষে রাখা শ্বাপদকুলকে সে ছেড়ে দিয়েছে আগ্রাসী মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। কত অসংখ্য মানুষ বাঘের থাবায় প্রাণ হারিয়েছে, বিষাক্ত সর্পদংশনে প্রাণ দিয়েছে। পঙ্গপালের মত মানুষের হূণদলকে তবু ঠেকাতে পারে নি। কৃষ্ণ হূণ, শ্বেত হূণদের মত ঝাঁকের পর ঝাঁক এসে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তীর ধনুক, কুঠার, বন্দুক সব নিয়ে। একে একে সরে যেতে হয়েছে সুন্দর বনকে। তার বিশ্বস্ত সৈনিক ব্যাঘ্রের দল, শুয়োরের দল, সর্পকুল—অরণ্যরক্ষার সংগ্রামে নিজেদের জীবন হারিয়েছে—যেমন করে ইউরোপীয় আগ্রাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা ধীরে ধীরে সরে গেছে পেছনে। ইনকা, মায়া, অ্যাজটেক প্রভৃতি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে তারা পাহাড়ে, পর্বতে, অরণ্যে। সুন্দরবনও তেমনি করে হটে গেছে পেছনের দিকে। হটতে হটতে শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে বঙ্গ-দিগন্তের শেষ কয়টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। এবার শেষ সংগ্রামের জন্য করাল দংষ্ট্রা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে জনপদের দিকে তাকিয়ে।

মানুষ আর এগোয়নি। প্রাচীন উপজাতিগুলির কিছু কিছুকে যেমন শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত অঞ্চলে রেখে দিয়েছে ইউরোপীয়েরা, তেমনই—এখানেও মানুষ রণে ক্ষান্ত দিয়েছে শেষ কয়টি দ্বীপে এসে। আর নয়, আদিম অরণ্যের সাক্ষ্য হিসাবে রেখে দিতে হবে কিছু কিছু সেই মহাপ্রাচীন সাম্রাজ্যের অংশকে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য হিসেবে। কিন্তু মানুষকে অরণ্যের বিশ্বাস নেই। তাই সদাজাগ্রত

প্রহরীর মত সার বেঁধে অসংখ্য সুন্দরী বৃক্ষ তাকিয়ে আছে খাড়ির জলের দিকে চোখ রেখে। জলযান যাত্রী মানুষকে তার বিশ্বাস নেই। কখন আবার তীরে নেমে কুঠার চালাবে, তীর ছুঁড়বে, বন্দুক চালাবে কে জানে!

অতীত সাক্ষ্যের প্রতি বহু মানুষের আজও তেমন কোন শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা নেই নিজেদের পেটের তাগিদের জন্য। তাই আইনের বেড়াজাল ভেদ করে লুকিয়ে লুকিয়ে বহু মানুষ আজও এই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে সুন্দরী বৃক্ষের কাঠের জন্য, বিশাল মহীরুহে ঝুলে থাকা বড় বড় মৌচাক থেকে মধু ছিনিয়ে নেবার জন্য; হরিণের চামড়ার জন্য, মাংসের জন্য। অরণ্যও তাদের ক্ষমা করে না। শেষ সংরক্ষিত বাহিনী ব্যাঘ্রকুলকে ছেড়ে দেয়। বনে যারা ঢুকে পড়ে তাদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরতে পারে না। মানুষের এই অবাঞ্ছিত পদক্ষেপের প্রতিবাদ স্বরূপ খাড়ির জল পার হয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরাও ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। সুন্দরবনের একটা হরিণের বিনিময়ে তারা হয়তো ধরে নিয়ে আসে দুটো মানুষকে। এখন চলছে এই হানা প্রতিহানার পালা।

ভট্‌ভটি এখন একদম যেন সুন্দরী বৃক্ষের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, হাত দিলেই যেন দু-একটা সুন্দরীবৃক্ষের পাতা ছোঁয়া যায়। বাঘের পায়ের চাপ দেখা যাচ্ছে ভেজা মাটির বুকে। কাছেই হয়তো কয়েকটি ঘন বেষ্টন সুন্দরী বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর কোন শার্দুল। হয়তো তক্কে তক্কে আছে, আমাদের অসাবধানতা নজরে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কিনা ভট্‌ভটিটা উপর। সে কথা মনে পড়তে মাঝে মাঝে ভয়ে শরীর শিউরেও উঠছে। কিন্তু এত কাছে এসে সুন্দরীবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কেমন ভালও লাগছে। মনে হচ্ছে প্রতি পত্রের লক্ষ লক্ষ রন্ধ্রপথে অসংখ্য চক্ষু নিয়ে ওরা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। দেখছে, ভাবছে। আমাদের মানসিকতার একটা হিসাব কষে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারবার্তার মত তা পাঠিয়ে দিচ্ছে অরণ্যের পাতায় পাতায় সমগ্র সুন্দরবনে। ঢেউয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে পাতায় পাতায় সেই বার্তা চলে যাচ্ছে গভীর গহনে বসে থাকা অরণ্যের কোন মহা পিতৃপ্রতিম বৃক্ষের কাছে, যে তাদের রাজা —ভয় নেই, এরা দস্যু নয়।

অচল জীবনের এই অসংখ্য বৃক্ষ কতকাল দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। এই জড় জীবনে প্রাণের কি প্রসাদ পায় এই বৃক্ষগুলি? প্রাণের আনন্দের কেমনতর ধারা এদের? এদের কি সমাজ আছে? পারস্পরিক সম্পর্ক? জন্ম যখন আছে, বৃদ্ধি, ক্ষয়—সুতরাং প্রাণ যে এদের আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধি, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা? ভাব বিনিময়?

বৃক্ষের যে প্রাণ আছে—আচার্য জগদীশ বোসের কাছে তা জেনেছি। কিন্তু প্রাণের স্বাদ উপভোগ করার জন্য আরও যে বৃত্তি সেগুলির উপর অদ্ভুত একটা বই এখনো আমি পড়ে যাচ্ছি। বইয়ের নাম 'The Secret Life of Plants.

লেখক—Peter Tomkins and Christopher Bird. আরণ্যক জীবনের, উদ্ভিদ-জীবনের কি অকথিত কাহিনীই না তাঁরা তুলে ধরেছেন! বিভূতিভূষণের আরণ্যকে মরমিয়া অনুভব, হাডসনের 'গ্রীণ ভ্যালি'র আরণ্যিক আত্মা, তা যে শুধুমাত্রই কল্পনার বিলাস নয়—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তার সত্যতা তাঁদের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন গ্রন্থকারদ্বয়। আশ্চর্য, চমকিত, শিহরিত হবার মত উদ্ভিদজীবনের রহস্য উন্মোচন!

গ্রন্থের ভূমিকাই আশ্চর্য মরমিয়া স্বাদের গন্ধে ভরা। ও'রা বলেছেন, সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদাইতের পরেই আমাদের এই গ্রহে যদি কোন নয়ন-মুগ্ধকর কিছু থাকে তবে তা উদ্ভিদ, উদ্ভিজ্জ পুষ্প—উদ্ভিদের চাইতেও যা প্রয়োজনীয়। মনুষ্যজীবনের যথার্থ গর্ভাশয়ই হল কচি ঘাসের চাপড়া। যদি না ধরণীর বুক জুড়ে থাকত অরণ্য-বৃক্ষ-শস্যাদির সবুজ সমারোহ—প্রাণবায়ু রূপে যা বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের, জীবনের সেই—প্রধান উপাদানটিই পেতাম না আমরা কখনও। পত্রান্তরালে লুকিয়ে থাকা অজস্র নাসারন্ধ্র প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরিত্যাগ করছে অক্সিজেন। পঁচিশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ধরণীর মৃত্তিকার উপর আস্তরণ সৃষ্টি করে আছে যে সবুজের আস্তরণ, প্রতিনিয়ত তাই ফটোসিন্থেসিস করে মানুষ ও পশুর জন্য তৈরি করছে অক্সিজেন ও খাদ্য। প্রতিবছর কোটি কোটি টন যে খাদ্য মানুষের প্রয়োজন—তাও আসছে এদেরই কাছ থেকে। এদেরই উপর পশু জগৎ বেঁচে আছে, আবার সেই পশু জগতকে উদরস্থ করে খাদ্যের আর এক অংশ পূরণ করছি আমরা। ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল, উত্তেজক পানীয়, ভেষজ ঔষধী যার ওপর আমাদের জীবন, সব কিছুরই দাত্রী তো এই অরণ্য, উদ্ভিদ, লতা গুল্ম ইত্যাদি। অরণ্য যে আমাদের মা, পিতামহী, বিশ্বমাতা, সব।

এই অরণ্য শুধুমাত্র আমাদের ক্ষুধার অন্ন দেয়নি, দিয়েছে নয়নের তৃপ্তি, দিয়েছে হৃদয়ের উদারতা, দিয়েছে আরণ্যক অধ্যাত্ম জগতের উপলব্ধি। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, বাইবেল, অবেস্ত কিছুই হয়তো রচিত হত না যদি না উদার প্রকৃতি তার সবুজের ছত্র তুলে ধরে রাখত আমাদের মাথার উপর। মানুষের মাথার উপর আচ্ছাদনটুকু গড়ে উঠত না যদি না অকৃপণ হস্তে অরণ্য দান করত আমাদের তার কাষ্ঠ সম্পদ।

আমরা কি শুধু ছিনিয়ে নিয়েছি অরণ্যের কাছ থেকে আমাদের সম্পদ, বেঁচে থাকার জন্য প্রাণের সকল প্রকার উপাদান? না অরণ্য সচেতন ভাবেই দান করেছে আমাদের বহু জিনিস! দেবার মত সেই যে মানসিকতা, মন, তা কি তার আছে?

প্রাচীনকালে গ্রীসে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন—'অরণ্যের প্রাণ, আছে, উদ্ভিদের জীবন আছে, কিন্তু বোধ নেই।' সেই প্রাচীন বিশ্বাসের ধারা মধ্যযুগ থেকে বয়ে এসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর উঠান পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না আধুনিক উদ্ভিজ্জ

বিদ্যার জনক Carl Von Linne বললেন, মানুষ এবং পশু জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ জীবনের ফারাক সামান্যই। মানুষ ও পশু চলতে পারে উদ্ভিদ চলতে পারে না এই যা। কিন্তু চার্লস ডারউইন লিনির এ ধারণাকেও ছুটিয়ে দিলেন সদর্পে ঘোষণা করে যে, লতা গুল্ম বৃক্ষ, সকলেরই লতাতন্তুর মধ্যে রয়েছে গতিময়তা। প্রয়োজন হলে, সুযোগ পেলে এ গতি সে প্রদর্শন করে। মানুষকে অবাক করে দিয়ে বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভিয়েন্নিজ জীবতত্ত্ববিদ Raul France Gallic নামে অপর একজনের সঙ্গে একত্রে কাজ করে জগতকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, দক্ষ পশু আর মানুষেরই মত উদ্ভিদাদিও চলতে পারে, নড়তে পারে—এবং পারে স্বাধীন ভাবেই। উদ্ভিদের শেকড় মাটি খুঁড়ে নিচে যায়, ফুলের কুঁড়ি, বৃন্ত নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে নড়ে চড়ে। লতাতন্তু নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সশঙ্কায় বাইরের দিকে এগুতে থাকে। তার ভৌতিক বাহু বাড়িয়ে চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশকে সে পরীক্ষা করে নেয় যেমন করে শামুকের খোলার ভেতর থেকে লতাতন্তু আকারের একটি নরম শুড় ডগার প্রান্তে বিন্দুর মত দুটি গোল চোখ নিয়ে চারদিক দেখে ধীরে ধীরে এগোয়। মানুষ যদি একটু ধৈর্য নিয়ে দেখে এ গতি তার দৃষ্টি এড়াবে না।

আজ মরমিয়া সত্যে আর বিজ্ঞানের তত্ত্বে কোন ভেদ নেই—বিশেষ করে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের আবির্ভাবে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের দুঃসাহসিক অভিযানে। প্রাচীন মরমিয়া অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণে আজ সত্য প্রমাণিত। তাই কবির অনুভূতিকে আজ বিজ্ঞানের পুরোধা বলে ধরতে দ্বিধা নেই। তাই গ্যেয়টের মত কবি ও রুডলফ স্টাইনারের মত দার্শনিকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক এই সত্যটুকু এড়িয়ে যেতে পারে নি। ফলে উভয়ের চোখেই ধরা পড়েছিল যে, উদ্ভিদ বেড়ে উঠে বিপরীত গতিতে। মাটির নিচে তার শিকড় ছড়িয়ে যায় যেন মাধ্যাকর্ষণের টানে, হাওয়ায় তার লতাতন্তু ঊর্ধ্বে উঁকি দেয় মাধ্যাকর্ষ শক্তির বিপরীত টানে, যোগীদের ভূমিত্যাগের মত।

ডারউইন মনে করতেন, বৃক্ষের কেঁচো জাতীয় শেকড় মস্তিষ্কস্নায়ুর মত কাজ করে। ভেবে চিন্তে ধীরে ধীরে মাটির স্তর ভেদ করে নিচে নামে পাছে কোথাও তার আঘাত লাগে। যদি মাটির স্তর কোথাও কঠিন হয় ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যায় ভেজা মাটির দিকে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছের শেকড় এই ভাবে মাটির নিচে কাজ করে। কোথাও যদি পাথরে হোঁচট খেয়ে উপল খণ্ডে আঘাত পেয়ে গাছের এই শেকড়গুলি আহত হয়, বিক্ষত হয়, বালু-কণাতে ক্ষয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহ গজিয়ে নিয়ে আবার সে চলতে শুরু করে। যে মুহূর্তে শুড়গুলি প্রাণশক্তি আহরণের সম্পদ খুঁজে পায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে স্থান করে দেয় নতুন কোষ সমূহের জন্য যাতে তারা খনিজ লবণ ইত্যাদিকে দ্রবীভূত করে শিরায় শিরায় ঊর্ধ্বে টেনে তুলতে পারে প্রাণের রসে। এই প্রাণের রস ছড়াতে থাকে এক কোষ থেকে আর এক কোষে

—এই ভাবে সূর্যের দিকে তুলে ধরা উচ্চশির উদ্ভিদ-চূড়ায়। তৈরি করে প্রটোপ্লাজম, এক ধরনের ঘন জলজাতীয় রস, জৈব দেহের যা ভিত্তিক উপাদান। সুতরাং গাছের শেকড় হল এক ধরনের জলআহরী পাম্পের মত—যা প্রাণশক্তির মূল উপাদানগুলিকে তরল করে টেনে তোলে ঊর্ধ্বশীর্ষ পর্যন্ত। পাতার অজস্র রন্ধ্রপথে বাষ্প আকারে হাওয়া আকাশে ছেড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় মৃত্তিকার তরল সত্তা আহরণে। একটি মানুষের দেহ থেকে সারা দিনে যে ঘাম বেরয় ঠিক সমপরিমাণ ঘর্মজাতীয় জিনিস সাধারণ একটি সূর্যমুখী থেকেই নিত্যদিন জলীয় বাষ্প আকারে বেরিয়ে আসে।

সুতরাং ফ্রান্সের (France) সিদ্ধান্ত এই যে, গতিহীন কোন উদ্ভিদই নেই। তার বৃদ্ধিই হল ধাপে ধাপে তার গতি মাত্র। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রয়োজন হলে উদ্ভিদগুলি বেঁকে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, কাঁপছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে দেখা যাচ্ছে তার যৌগিক স্নায়ুধরনের অজস্র তন্ত্রী প্রাণের অক্ষরেখা থেকে বেরিয়ে এসে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কাঁপতে শুরু করেছে পত্রের ডগাগুলিকে প্রাণের রসে সিক্ত রাখার অক্লান্ত চেষ্টায়।

পরাশ্রিত লতাগুলিকে লক্ষ্য করা গেলেই দেখা যাবে যে, নিকটবর্তী যে আশ্রয় আছে তাকেই সে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। সূর্যরশ্মি থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে যদি কোন লতা জাতীয় গুল্মের তন্তুকে সরিয়ে দেওয়া যায়—রোদ্দুরের গন্ধ পেয়ে আবার তা বাইরের দিকেই মুখ ঘোরাবে —ঠিক যেন কেঁচোর মত। লতাতন্তুগুলি কি দেখতে পায়? অথবা ব্যাখ্যার অতীত এক উপায়ে গন্ধ নিতে পারে? রোদ্দুরেরও কি গন্ধ আছে? কে জানে!

অতি প্রাচীন কালে গ্রীসের লোকেরাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৃণভূমির প্রাণীরা অর্থাৎ লতাগুল্মাদি ঘাসেরা এক অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে যেন পারিপার্শ্বিকের অবস্থা পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পারে—যে অনুভব-শক্তি মানুষের মধ্যেও দেখা পাওয়া ভার। এক ধরনের গুল্ম গাছ, ইংরেজিতে যাকে বলে sundew, বিল জাতীয় জায়গায় গজায়। এরা পতঙ্গভোজী। তার শিকার্য কোথায় আছে ঠিক সেই দিকে ঘুরে যায় একেবারে নির্ভুল ভাবে, তার পর ধরে ফেলে। যে মাছিগুলি সচেতন মানুষের হাতের তালুর আঘাত প্রায় পরিহাস ছলেই এড়িয়ে যায়, এই ধরনের উদ্ভিদের বাহু থেকে কিন্তু তাদেরও মুক্তি নেই। ধরা সে পড়েই। এই ধরনের এমন কিছু পরগাছা লতা আছে যাদের শিকার্য অর্থাৎ পতঙ্গ এদের ঘ্রাণ-শক্তিকে সামান্যতমও এড়িয়ে যেতে পারে না। যতরকমের বাধাই আসুক না কেন, সব কিছু অতিক্রম করে সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করেই। সুতরাং উদ্ভিদের গতি নেই একথা বলবে কে?

আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, কোন্ পিঁপড়ে মধু চুরি করে উদ্ভিদেরা তা ভাল করেই জানে। এই পিঁপড়েগুলি কাছে এলেই মধুভাণ্ডার

সে ঢেকে ফেলে। তাদের ডগায় যখন প্রচুর পরিমাণে শিশির ঝরে, সেই শিশিরের জল ভেদ করে পিঁপড়েদের আর মধু ভাণ্ডারের কাছে যাবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না, তখনই তারা আবার তাদের ঢাকনা খুলে দেয়। আবার এমন অনেক গাছ আছে পিঁপড়েকে যারা বন্ধু বলে ভাবে, যেমন বাবলা জাতীয় গাছ। তৃণভোজীদের থেকে বাঁচার জন্য পিঁপড়ের কাছে তারা তাদের মধু ভাণ্ডার খুলে দেয় যাতে বিষাক্ত পিঁপড়ের কামড়ের ভয়ে তৃণভোজী পশুরা তার কাছে না আসে। এ ঠিক যেন মোষ বা ষাঁড়ের সঙ্গে শালিক বা কাক জাতীয় পাখির সখ্যতা। তারা নির্বিবাদে তাদের দেহের উপর এদের বসতে দেয় আঠালি জাতীয় পোকাগুলি বেছে দেবার জন্য, যাদের রক্তশোষক কামড়ে যন্ত্রণাদগ্ধ হয় এই পশুগুলি। এমন কি বাঘের দাঁত থেকে এরা নিঃসংশয়ে মাংসের টুকরো খুঁটে খুঁটে খেয়ে দন্তপ্রদাহ থেকে বাঘগুলিকে রক্ষা কার।

মধুস্রাবী পুষ্প, কেশরধারী লতা বা বৃক্ষের উদ্ভব কি আকস্মিক একটা ঘটনা মাত্র? প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম? যাদের ফুল নাকি পতঙ্গদের আমন্ত্রণ জানায়? আমন্ত্রণ জানায় পুংকেশরের পরাগ নিয়ে গর্ভকেশরে মিশিয়ে দেবে বলে, যাতে স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরে ভ্রূণের উদয় হয়? এর মধ্যে কি মননশীলতার কোন বালাই-ই নেই?

এই যে কণ্টকবৃক্ষ চোখে পড়ে তার কাণ্ডে কাণ্ডে যে কণ্টক, তা কি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা? না সচেতন প্রয়াসের ফল, শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবে বলে? লজ্জাবতী জাতীয় লতা তার উপর গুবড়ে পোকা বা ঐ জাতীয় কোন কীট বা পতঙ্গ পড়লে বা নবোদ্গত পত্রের কাছাকাছি এলে ডগা গুলোকে দাঁড় করিয়ে—হঠাৎ পাতাগুলো মুড়ে নেয়। ভয় পেয়ে কীট বা পতঙ্গগুলি ছিটকে যায়। মানুষের হাত পড়লেও তারা পাতাগুলি গুটিয়ে নেয়। কিন্তু পাতাগুলোকে ভালবেসে বার বার হাত দিলে, চিনে ফেলে, আর নিজেকে গুটিয়ে নেয় না—যদি না ব্যথা পায়। একি রি-অ্যাকশন না রিফ্লেক্স অ্যাকশন?

পতঙ্গভোজী লতার দেহে যদি পাথরের টুকরো বা কোন ধাতব দ্রব্যের টুকরো রাখা যায়—তার স্বাভাবিকতার মধ্যে সে তখন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কিন্তু এক টুকরো মাংস রাখলেই লোভে লোভে নড়েচড়ে উঠবে—কারণ মূলত সে যে মাংসভোজী! আবার বিশেষ বিশেষ কোন জিনিসের চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার লতাতন্তুগুলি গুটিয়ে নেবে।

এমন অনেক উদ্ভিদ আছে—যেগুলি হাওয়ার নিশানা দিতে পারে। (মিসিসিপির রেড ইন্ডিয়ান হান্টাররা—সূর্যমুখী জাতীয় ফুলকে দিক্ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করত। ভারতীয় যষ্টিমধু গাছ বিদ্যুৎ তরঙ্গ সহজেই ধরতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করার ক্ষমতাও এদের রয়েছে।) অনেকে এ জন্য এদের আবহাওয়ার খবর রাখার জন্য ব্যবহার করে। ঘূর্ণীঝড়, ঝঞ্ঝা ইত্যাদির আভাস

এরা পূর্বাহ্নেই দিতে পারে। এমন কি ভূমিকম্পের ইঙ্গিতও দিতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও এরা পূর্বাহ্নে অনুমান করে।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা এও লক্ষ্য করেছেন যে, মনুষ্যকর্ণে অশ্রুতব্য শব্দ উদ্ভিদেরা অতি সহজেই ধরতে পারে। শব্দের মত রঙ ধরতেও তাদের অসুবিধা হয় না। X-ray ও টেলিভিশনের জন্যও তারা অতিরিক্ত পরিমাণে সংবেদনশীল। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এমনকি মহাবিশ্বের প্রভাবও এরা মানুষের চাইতে বেশি বোধ করতে পারে। উদ্ভিদের কোন প্রত্যঙ্গ যদি কেটে ফেলা যায়, আবার দেখা যায় সেখানে সে তা গজিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ফ্রান্স (Farnce) এই জন্য ধারণা করেছেন যে, চেতনাপ্রবাহ, বুদ্ধিবৃত্তি সবই উদ্ভিদের মধ্যে কাজ করে—কাজ করে বাহির এবং ভেতর উভয় দিক থেকেই।

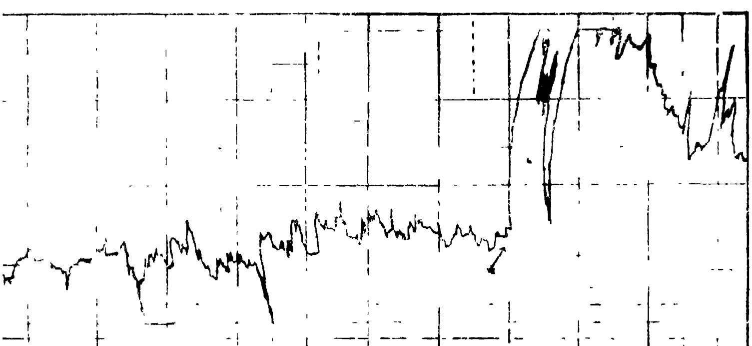
অর্ধশতাব্দী আগে ফ্রান্স যে উদ্ভিদের মধ্যে জৈবতত্ত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন অধুনা উদ্ভিদ চর্চা তার চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। তিনি যে চিন্তা করেছিলেন, অতিপ্রাকৃত কোন ক্ষেত্র থেকে তার এই সহনশীলতা নিয়ন্ত্রিত, বর্তমানে field তত্ত্ব—তাও যেন প্রমাণ করছে। মরফোজেনেটিক ফিল্ড আবিষ্কৃত হবার পর আর কোন সন্দেহই নেই যে, প্রাণ, মন, বুদ্ধির ক্ষেত্র রয়েছে অন্যত্র। জীবনের যে যন্ত্রগ্রাহ্য জিনরূপী সূক্ষ্মতম উপাদান তার মধ্যেও নয়—তারও বাইরে এক ধরনের শক্তি-বলয়ের মধ্যে জড়, অজড়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সব কিছুকে ঘিরেই তা বিরাজমান। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী সভাপতি ডঃ সত্যেশ পাকড়াশী ও তদীয় পত্নী ডঃ অনিতা পাকড়াশী লেখককে বায়োকেমিস্ট্রির রিসার্চের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদের জৈনিক গঠন ও মানুষের জৈনিক গঠনপ্রণালীর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদ নেই এ ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণই পাওয়া গেছে।

জীবনের চতুর্দিকে এই যে বস্তুহীন শক্তিক্ষেত্র—তাকেই হয়তো ভারতের প্রাচীন ঋষিরা দেবতা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রমাণ সাপেক্ষেই একথা বলা যায় যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে, প্রেম আছে, ভালবাসা আছে। উদ্ভিদ অচলায়তনে বাঁধা অনড় প্রাণের বিকাশ নয়, আপাত অগতির মধ্যে প্রাণের গতিতে সে গতিময়।

এ শুধু দার্শনিক তত্ত্বে ধরা সত্য নয়—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও প্রমাণ সিদ্ধ। নিউ ইয়র্কস টাইমস স্কোয়ারের মুখোমুখি একটি ধূলো জমা অফিসে উদ্ভিদ জগতের এক আশ্চর্য দুনিয়া রয়েছে, যে জগৎ তৈরি করেছেন ক্লেভ ব্যাকস্টার নামে এক উদ্ভিদ পাগলা বৈজ্ঞানিক। হাতে-নাতে প্রমাণ করে জগৎকে তিনি চমকে দিয়েছেন এই দেখিয়ে যে, উদ্ভিদের চিৎশক্তি আছে আমাদেরই মত। তাঁর এই প্রচেষ্টা আজও খ্যাতির নিশান তুলে দাঁড়িয়ে আছে 'Backster Effcet' নাম নিয়ে।

যে যন্ত্র দ্বারা উদ্ভিদজগতের এই মানস শক্তির পরিচয় ব্যাকস্টার আমাদের

কাছে এনে দিয়েছেন তার নাম Galvanometer. মানুষের দেহে এই যন্ত্র লাগিয়ে তার মানসিক অবস্থার বিচার হয়, ভাবাবেগের পরিমাপ নেওয়া হয়। এখন এটা কাজ করছে Lie Ditector হিসেবে।) একটা ড্রাগন গাছে গ্যালভ্যানোমিটার লাগিয়ে ব্যাকস্টার দেখতে পান যে, গ্রাফে যে ধরনের রেখা ওঠা নামা করেছে তা মানুষের আবেগের ওঠা নামার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। একটি Dracaena পাতার উপর পরীক্ষা করে তিনি দেখেন—যে মানসিকতা নিয়ে কেউ পাতার দিকে এগুচ্ছে সেই মানসিকতা অনুসারে পাতার স্পন্দন ওঠানামা করছে—ভয়ের কারণ থাকলে—ভীতি-রেখায়, শঙ্কার কোন কারণ না থাকলে অনুরূপ নিঃশঙ্ক রেখায়—ঠিক মানুষের মত। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, উদ্ভিদ মানুষের মানসিকতায় সাড়া দিতে জানে। এবার শুধু Dracaena নয়—আরও নানা ধরনের উদ্ভিদের উপর পরীক্ষা করে ব্যাকস্টার এবং অন্যান্য সতীর্থ বৈজ্ঞানিকরা দেখতে পান যে, প্রায় সব ধরনের উদ্ভিদই মানুষের ভাবাবেগে সাড়া দিতে পারে। শুধু যে মানুষের ভাবাবেগের মত ভাবাবেগই তারা প্রদর্শন করতে পারে তা নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা এ ক্ষমতা তাদের আরও বেশি। মানুষের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিপ্রবণতা (E.S P) রয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণতা রয়েছে উদ্ভিদের মধ্যে। মানুষের মানস তরঙ্গ, মানুষের ইন্দ্রিয় যা ধরতে পারে না, দেখা যায়, উদ্ভিদ তা অনায়াসেই ধরতে পারে। দুজন বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের গায়ে পলিগ্রাফ



পলিগ্রাফ

যন্ত্র লাগিয়ে সেই উদ্ভিদের মালিককে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। কয়েকটি প্রশ্নের জবাব যেন তিনি ভুল দেন এমন নির্দেশও দেওয়া হয়। আশ্চর্য! দেখা যায় গ্যালভানোমিটারের মাধ্যমে উদ্ভিদগুলি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, কয়েকটি প্রশ্নের শুদ্ধ জবাব তার মালিক দেননি।

উদ্ভিদ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিতে পারে কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্য

ব্যাকস্টার জন্য ছয়েক ছাত্র যোগাড় করেন। ঘরে থাকবে দুটি গাছের চাড়া। ছাত্রদের চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। এদের মধ্যে একজন একটি চাড়াকে মেরে ফেলবে। কাজ হবে খুব গোপনে। একমাত্র হত্যাকারী ছাড়া আর কেউ, এমন কি ব্যাকস্টার পর্যন্ত জানতে পারবেন না যে, কে হত্যা করেছে গাছটিকে। শুধু সাক্ষী থাকবে দ্বিতীয় গাছটি। যে গাছটি বেঁচে থাকবে, তার গায় পলিগ্রাফ লাগিয়ে—একের পর এক ছাত্রদের তার সামনে দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গাছের চাড়াটি বলে দেবে, কে হত্যা করেছে তার সঙ্গীটিকে। দেখা যায় যথার্থ হত্যাকারীকে ঠিকই ধরিয়ে দিয়েছে জীবিত চাড়াটি।

ব্যাকস্টার—গাছ ও তার মালিকের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদান কতদূর যেতে পারে সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন যে, গাছ মালিককে দূরে রাখলেও তার সঙ্গে হৃদয়ের ভাব বিনিময় করতে পারে। বহু দূরে থাকলেও দুয়ের মধ্যে ভাব তরঙ্গের বিনিময় হয়। এমন কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভও যাতায়াত করতে পারবে না এমন পাত্রে উদ্ভিদকে রেখেও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেখানেও মানুষের হৃদয়ের ভাবপ্রবাহকে সে ধরতে পারে। ব্যাকস্টারের এই অভূতপূর্ব নিরীক্ষা লক্ষ্য করে তার চিকিৎসক পরামর্শদাতা এবং জীবকোষ তত্ত্ববিদ ডঃ হাওয়ার্ড মিলার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সকল জীবের মধ্যেই একটা 'কোষিক চেতনা' আছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকস্টার নানা ধরনের প্রাণীর জীবকোষ পরীক্ষা করে এই ধরনের স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'যে-কোন একটি জৈব কোষের মধ্যেই সমগ্র স্মৃতি সঞ্চিত থাকতে পারে।' তাঁর ধারণা হয়, এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক গঠনশৈলী শুধু সুইচটেপা বোতামের মত কাজ করে, স্মৃতিগুলি যে সেখানেই সঞ্চিত হয়ে থাকে তা নয়। চিৎশক্তি শুধু যে কোষের মধ্যেই থাকে তা নয়, তা মলিকুল, অণু, এমন কি অব আণবিক কোন এককের মধ্যেও থাকতে পারে। বর্তমানে অবশ্য দেখা গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনকে অতিক্রম করে মরফো জেনেটিক ফিল্ড অর্থাৎ এক ধরনের শক্তিবৃত্তের মধ্যেই তা থাকে—, যে কারণে দেহের মৃত্যু হলেই স্মৃতি-সত্তার মৃত্যু হয় এমন নয়)।

মার্সেল ভোগেল নামে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক রসায়ন গবেষক উদ্ভিদ অপরের মনের হদিস করতে পারে কিনা এবিষয়ে রীতিমত চর্চা শুরু করে দেন। গবেষণা করতে করতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মানস শক্তিকে ধরে রাখা যায়, অথাৎ ব্যাঙ্কে টাকা রাখার মত কোথাও তা জমা রাখা চলে। কিন্তু সে আধার কি, যে আধারে মানুষের ভাবতরঙ্গকে জমা রাখা যাবে? এ জন্য তিনি অধ্যাত্ম চর্চারত তার এক বান্ধবী Vivian Wiley-এর শরণাপন্ন হন—এবং এ ব্যাপারে একটা স্পষ্ট জবাব পাবার চেষ্টা করেন। Wiley এ ব্যাপারে অদ্ভুত ভাবে এক পরীক্ষা চালিয়ে এর জবাব পান। তিনি একটি লতানো গাছ থেকে দুটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাঁর একটিকে তার বিছানার পাশে বসানো টেবিলের উপর রেখে দেন। আর একটিকে রাখেন ঘরের অন্যত্র। তিনি টেবিলের উপর

রাখা পাতাটির দিকে তাকিয়ে এই ইচ্ছা ছুড়ে দিতে থাকেন যে, পাতাটি বেঁচে থাকুক, সতেজ অবস্থাতে থাকুক। কিন্তু আর একটি পাতার দিকে একেবারেই নজর দেন না। একমাস পরে দেখা যায় যে, যে-পাতাটির দিকে তিনি একেবারেই নজর দিতেন না সেটি শিথিল হয়ে ধূসর রঙ ধরেছে। তার মধ্যে স্পষ্ট অবক্ষয়ের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে পাতাটির দিকে তাকিয়ে তিনি সেটি তরতাজা অবস্থায় বেঁচে থাক এমন ভাবতেন,—সেটি সত্যিই যথেষ্ট সতেজ সবুজ ও প্রাণময় রয়েছে।

ভোগেল তাঁর বান্ধবী Wiley-এর এই গবেষণা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, টেবিলের উপর রাখা পাতাটির মধ্যে Wiley-এর আত্মিক শক্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। এ থেকে তিনি এই সিধান্তে আসেন যে, আত্মিক শক্তিকে অন্যত্র সঞ্চিত করে রাখা যায়। তিনি আরো মনে করেন যে, আত্মিক ইচ্ছা এক ধরনের মানস ক্ষেত্র (psychic field) তৈরি করে।

ভোগেল পরীক্ষা করে দেখেন যে, আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করে ঝিমিয়ে পড়া উদ্ভিদকে তার সক্রিয় প্রাণশক্তির মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায়। অবশ্য এ জন্য আত্মিক শক্তি যিনি প্রয়োগ করবেন তাকে তার (আত্মিক শক্তির) মাত্রা (Dimension) বাড়াতে হবে—এবং এই অতিরিক্ত মাত্রাকে—উদ্ভিদের দিকে সপ্রেমে ছুড়ে দিয়ে ভাবতে হবে যে, সে সুখী হোক। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষে উদ্ভিদে, বা উদ্ভিদে এবং তৃতীয় কোন কিছুতে আত্মিক আদান প্রদান হতে পারে। মানুষ এই আত্মিক শক্তির অতিরিক্ত মাত্রা অর্জন করতে পারে নিবিড় মনঃ সংযোগের ফলে, যাকেই বলে যোগ। যোগকালে মানুষের আত্মিক শক্তির মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার মস্তিষ্কস্নায়ু থেকে ভিন্নতর তরঙ্গ উঠছে। তার দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের মানসতরঙ্গ থেকে এ তরঙ্গের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। (যে যন্ত্র দিয়ে এই আত্মিক শক্তির তরঙ্গ ধরা হয়—তার নাম ইলেকট্রোএনসেফেলোগ্রাফ।)

বৃক্ষাদি থেকে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়—মানুষের পক্ষে তা সত্যি সত্যি কল্যাণকর। এই জন্য প্রাচীন রেড ইনডিয়ানরা আত্মিক শক্তি, এমন কি দৈহিক শক্তিকে নতুন করে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন হলে বনে গিয়ে দুহাত ছড়িয়ে পাইন গাছের গায়ে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের লুপ্ত শক্তিকে গাছ থেকে আহরণ করে নেবার চেষ্টা করত। জীবকোষ থেকে এক ধরনের শক্তিস্রোত নির্গত হয় যোগকালে আমি তা লক্ষ্য করেছি। গভীর ধ্যানের পর উচ্চস্তর থেকে যখন নিচে নেমে আসা যায়—তখন অন্ধকারের মধ্যেও নিজের দেহের দিকে তাকালে স্পষ্ট সেই দেহ নজরে পড়ে, দেখা যায় যে, দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে এক ধরনের ধূম্রাকার বাষ্প বেরিয়ে আসছে। এমন কি ঘরের চার পাশে অদৃশ্য যে শক্তি প্রবাহ থাকে তাও ঘনীভূত হয়ে ধুঁয়ার আকার নিয়েছে। জৈব-

কোষের প্রতিটি সত্তাতেই রয়েছে এই শক্তিপ্রবাহ। ভোগেল যোগ করতেন কিন্তু জানি না, ধ্যানে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের কলাকৌশল তাঁর জানা ছিল কিনা বলতে পারব না—কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা রোগীদের অভিজ্ঞতার অনুরূপ! তাঁর ধারণা, কেউ যদি তার আত্মিক শক্তিকে উদ্ভিদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চায়—তাহলে সেই উদ্ভিদও এক ধরনের তরঙ্গ ছড়াতে থাকে। তার এই তরঙ্গ আসে বাইরে থেকে অপর কারো আত্মিক শক্তি তার মধ্যে ঢুকে যাবার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

মানুষের দেহের চতুর্দিকে জলীয় একটা বৃত্ত ঘুরে বেড়ায়, তারা রোম কূপের মধ্য দিয়ে তা যাতায়াত করে। তাতে এক ধরনের বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয়। জলযুক্ত এই শক্তিই ধূম্রাকারে দেহ থেকে নির্গত হয়। যারা আত্মশক্তির খেলা দেখান তাঁরা এই আত্মিক শক্তিকে ধূম্রাকারে বাইরে ঠেলে দিয়েই এই খেলা দেখান। এই আত্মিক শক্তি প্রয়োগের পর দেখা গেছে; তাঁদের দেহের ওজন কয়েক পাউণ্ড পর্যন্ত কমে গেছে। হয়তো দেহ এই আত্মিক শক্তির আহার্য উপাদান, যেমন অগ্নির আহার্য উপাদান হল কাঠ, তেল, ঘি, ইত্যাদি। দেহের যে ওজন কমে তা এই দেহরসরূপ জল নিষ্কাসনের জন্য।

এই আত্মিক ক্রিয়ার রহস্য রীতিমতই চমকপ্রদ। দেখা গেছে কোন মানুষ যদি অপর কোন লোক দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়—এবং মনের মধ্যে এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা পুষে রাখে—তাহলে সে এক ধরনের স্নায়বিক অস্থিরতার মধ্যে পড়ে যায়। এবং এই অস্থিরতাকে যদি এই আত্মিক পঞ্জর থেকে বের করে দেওয়া না যায় তাহলে তার দেহের রাসায়নিক আদলের সবটাই পাল্টে যেতে পারে. অন্তত Dr Wilhelm Reich অনেক গবেষণার পর এমনতর সিদ্ধান্তেই এসেছেন।

এই আত্মিক আঘাত শুধু মাত্র যে মানুষের ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল তা নয়—উদ্ভিদ-জীবনের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে সক্রিয়। দেখা গেছে, কোন গাছের পাতার কাছে গিয়ে 'আঘাত করব' মনে মনে এমন চিন্তা করলেই পলিগ্রাফের সূঁচ উপরের দিকে লাফিয়ে উঠছে।

গাছের যে শুধু এই ধরনের অনুভূতি প্রবণতা আছে তা নয়, তারা কথাও বলতে পারে। এটা প্রত্যক্ষ করেছেন কালিফোর্ণিয়ার মেরিনা রে ডেল-এর তরুণ আমেরিকান John Francis Dougherty. তিনি এটা প্রত্যক্ষ করেছেন জাপানে মিসেস হাসিমোতোর গবেষণাতে। এক ধরনের ফণীমনসার গাছ হাসিমোতো-এর কথার জবাব দিচ্ছে, তিনি স্বকর্ণে তা শ্রবণ করেছিলেন। হাসিমোতো পরিবার উদ্ভিদের সঙ্গে এমন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যে, তাঁরা এদের গণনা করতে পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। গাছগুলি কুড়ি পর্যন্ত গণনা করতে পারত। দুইয়ে দুইয়ে কত হয় জিজ্ঞেস করলে বলত—চার। উত্তর দিত শব্দ করেই। যন্ত্রে সেই শব্দ ধরা হলে খাতায় ফুটে উঠত চার সংখ্যা।

গাছের এই ভাষা ধরা কি করে সম্ভব একথা মিসেস হাসিমোতোর স্বামী ডঃ হাসিমোতোকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন যে, প্রকৃতিতে এমন সব ব্যাপার আছে যা বর্তমান পদার্থবিদ্যার তত্ত্বে ধরা পড়ে নি। পদার্থবিদ্যার ত্রিমাত্রিক জগৎ চতুর্মাত্রিক জগতের ছায়া মাত্র। এই চতুর্মাত্রিক জগৎ ত্রিমাত্রিক জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে মানস শক্তি দ্বারা। অবশ্য আমার বিশ্বাস এই যে, এই মানস শক্তির ক্ষেত্র পঞ্চম মাত্রীয় জগৎ থেকে আরম্ভ। ত্রিমাত্রিক জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে চতুঃমাত্রিক অবস্থা—সময় ও দেশ। এটা মানুষ সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না বলেই স্থূলজগৎকে ত্রিমাত্রিক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ) ভাবে। সময় ও দেশকে হিসেবের মধ্যে আনে না। যাই হোক, ডঃ হাসিমোতো কিন্তু যে সে লোক নন, তিনি হাসিমোতো ইলেকট্রনিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান। তাঁর সাড়া জাগানো দুটি গ্রন্থও রয়েছে—Introduction to E. S. P ও Mystery of the Fourth Dimensional world এই চতুর্মাত্রিক জগতের জ্ঞান থাকার ফলে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়ের উপর মনের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। বস্তুর উপর আত্মিক শক্তির এই প্রভাব এত প্রবল যে, অধিপদার্থদর্শনের মনোবিজ্ঞান বিভাগীয় জনৈক ইউরোপীয় গবেষক Sauvin একটি কৌশল আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে, মানসশক্তির দ্বারা ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে (রামায়ণ মহাভারতের যুগে সম্ভবত বড় বড় যোদ্ধারা অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আত্মিক শক্তি দ্বারা তা নিয়ন্ত্রণ করতেন)। তিনি এজন্য যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম Device 3. এই বিদ্যায়তনেরই এক পাদ্রী Reverend. R. William Daut আত্মিক শক্তি দ্বারা পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বলে দাবি করেন। তা যে পারেন, এ সম্পর্কে প্রমাণসহ কিছু নথিও উত্থাপন করেন। তিনি বিশেষ এক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে পরলোকগত আত্মার কণ্ঠস্বরও ধরেছেন। আত্মিক শক্তির এই পরিচয় পেয়ে Dr Daut অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাই বলেছেন—'ধর্ম' (অধ্যাত্মতা) অর্থ-'নিখিল বৈশ্বিক বুদ্ধি' মাত্র। Dr Daut যে আত্মিক জগতের পরিচয় পেয়ে এমনতর মন্তব্য করেছিলেন, প্রাচীন গ্রীসের ডেল্‌ফিতে, মিশরে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই দিব্য ভবিষ্যৎ-বাণীর কেন্দ্র সমূহ গড়ে উঠেছিল।

এই ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অতীন্দ্রিয় শক্তি বিচার করতে গিয়ে জনৈক জার্মানীজাত আমেরিকান ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার L. George Lawrence স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন যে, সজীব উদ্ভিদ মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি সংবেদনশীল, এবং উদ্ভিদের স্নায়ুসমূহ অনেক বেশি দূরবর্তী সংকেত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ধরতে পারে। ওদের মত সংবেদনশীল সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও হতে পারে নি। জৈব তেজতরঙ্গ জৈব কোষগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অপেক্ষা অনেক বেশি ভাল ভাবে ধরতে পারে। লরেন্স আবিষ্কৃত যন্ত্রের মধ্যেই এদের এই অতিঅনুভূতি

প্রবণতা ধরা পড়েছে।

ভারতীয় সাধুসন্তেরা উদ্ভিদের এই অতিপ্রকৃত অনুভূতিপ্রবণতার কথা জানতেন। কেশকে তারা উদ্ভিদতুল্য মনে করতেন। কেশের জৈব কোষগুলি অতীন্দ্রিয় শক্তিকে ধরতে পারে বলে তাঁরা দীর্ঘ কেশ ও বিলম্বিত শ্মশ্রু গুম্ফ রাখতেন এবং অধিপদার্থিক জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে বাস করতেন। অনেক সাধু সন্ত আছেন যাঁরা মস্তিষ্ক মুণ্ডন করেন। তাদের বিশ্বাস নবোদ্গত কেশমুখ আরও বেশি অনুভূতিপ্রবণ। এই জন্য তাঁরা ন্যাড়ামুণ্ড হন এবং শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডন করেন। এই জন্যই বোধহয় স্যামসন কেশের মধ্যে তার অতীন্দ্রিয় শক্তি পেতেন বলে বাইবেলীয় পুরাণ-কাহিনীতে গল্প রয়েছে।

রাশিয়ান এক হিস্টোলজিস্ট (যিনি জৈব ও উদ্ভিজ স্নায়ুতন্ত্রী নিয়ে চর্চা করেন) তাঁর গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রত্যেকটি জীবন্ত কোষই এক ধরনের তেজ বিচ্ছুরণ করে।

ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস জীনস বহু পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মানুষের জ্ঞানপ্রবাহ নিরপেক্ষভাবে এক অযান্ত্রিক সত্যের দিকে ছুটে চলেছে। জ্ঞান যতই এগুচ্ছে ততই মানুষের জ্ঞানের আলোতে ধরা পড়ছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা যান্ত্রিক অস্তিত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি মানসিক অস্তিত্ব। বস্তুর জগতে মনের অনুপ্রবেশ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। বরং এই মানস সত্তাই বস্তুবিশ্ব সৃষ্টি করে এর নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করছে।

Dr. W. G. Roll—১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড Parapsychological Association এবং সপ্তম বাৎসরিক অধিবেশনে নতুন এক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন, যার নাম Psi-field বা আত্মিক ক্ষেত্র। এ অনেকটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মত। সম্ভবত জড় অজড় সব কিছুর চতুর্দিকেই রয়েছে এই field বা ক্ষেত্র। স্থূলবস্তু বা সত্তার সঙ্গে এর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার খেলা চলতে পারে। কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের ভিত্তিতে অনুরূপ একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে Dr. G. D. Wasserman এই বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি Ciba Foundation Symposium-এ। Wasserman এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, এই আত্মিক ক্ষেত্র, যার জন্য মানুষের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়—এটা হয় এখান থেকে সামান্যতম শক্তিপিন্ড (quanta of energy) লাভের জন্য। ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার যথার্থ স্থূল বস্তু যতটুকু এই শক্তিপিণ্ড গ্রহণ করতে পারে এই শক্তিপিণ্ড তা অপেক্ষা বহু বহুগুণ ক্ষুদ্র। এই সব পরীক্ষা থেকে লরেন্স সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করেছেন এই ধরনের যে, এই অতীন্দ্রিয় মাতৃকাশক্তির সামান্যতম অংশ হল আত্মিক ক্ষেত্র। বৈদ্যুতিক তারের গ্রিডের মত মহাবিশ্বের সমগ্র প্রাণসত্তাকে সে এক বৃন্তে বেঁধে রেখেছে। বাহ্যত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের বহু ক্ষেত্রে এর প্রকাশ লক্ষ্য

করা গেলেও মূলতঃ এই আত্মিক ক্ষেত্র ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার জ্ঞানবৃত্তের বাইরে অবস্থিত। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ উদ্ভিদরাজি এই মহাবৈশ্বিক আত্মিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারে বলেই বহু দূরস্থানে অবস্থান করলেও গাছের চাড়া বা গাছ তার মালিকের সঙ্গে আন্তরিক ভাবপ্রবাহ বিনিময় করতে পারে।

আত্মিক ভাববিনিময় ক্ষমতা উদ্ভিদের মধ্যে এত প্রবল যে, ঘন সংবদ্ধ অরণ্য থেকে কোন একটি বৃক্ষকে সরিয়ে নিলে একক বৃক্ষটি নিঃসঙ্গতার একটা বেদনা অনুভব করে। এই বিয়োগ ব্যথার আঘাত এত প্রবল হতে পারে যে, নিঃসঙ্গ বৃক্ষটি মরেও যেতে পারে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যদি তাকে সবুজ অরণ্যের নিবিড়তায় ফিরিয়ে দেওয়া যায় আবার সে প্রাণের সবুজ তেজে উজ্জীবিত হয়েও উঠতে পারে। সুতরাং আপাত অচলায়তনে আবদ্ধ কোন বৃক্ষই গতিহীন নয়, ভাবহীন নয়, ভালবাসাহীন নয়। যথার্থই এরা প্রাণের আনন্দে ভরপুর অর্থবহ জীবনের ভূঁইফোড় প্রাণের বিজয়কেতন।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীতে যে বিদ্যুৎবাহী শিহরণ আছে, বৃক্ষের স্নায়ুনালীতেও তার অভাব নেই। সোভিয়েত রুশীয় উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ অধ্যাপক Ivan Isidorovich বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছিলেন—, যে জন্য প্রাভ্দার মত কাগজও ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে 'What Leave Tell Us' নামে একটি নিবন্ধ বের করেছিল।

উদ্ভিদের যে জৈব মৌলশক্তি, যা নাকি আঘাতের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রকাশ করে প্রাণশক্তিকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, দেখা গেছে সেই মৌলশক্তি ক্লোরোফরম প্রয়োগ করলেই মানুষের দৈহিক মৌলশক্তির মতই নেতিয়ে পড়ে। রুশ বৈজ্ঞানিকরাই অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন যে, উদ্ভিদেরা ইন্দ্রিয়ে কোন সাড়া অনুভব করলে স্নায়ুতন্ত্রীর বিশেষ রন্ধ্রপথে তাকে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রীর মতই তা গ্রহণ বর্জনের পর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেয়। মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুর মত উদ্ভিদের এই জটিল স্নায়ুক্ষেত্র রয়েছে মাটির নিচের শেকড়ে, যে শেকড় মানুষের হৃদপিণ্ডের মত সংকুচিত ও বিকোচিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আচার্য জগদীশ বসু, যিনি উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের উপস্থিতির প্রথম প্রদর্শক, তিনি এই স্নায়ুতন্ত্রীর খেলা উদ্ভিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে জড় ধাতব দ্রব্যের মধ্যেও দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষের ক্লান্ত স্নায়ুর মত ধাতব স্নায়ুও ক্লান্তিবোধ করে। মানুষের হৃদপিণ্ড-স্নায়ুর মত তারও সংকোচন বিকোচন আছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্ম দিয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ক্লোরোফর্ম করা মানুষেরই মত তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার ক্লোরোফর্মের বিষাক্ত গ্যাস উবে গেলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

শুধুমাত্র দার্শনিক অনুমানে নয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ তিনি দেখিয়ে দেন যে, জান্তব স্নায়ুতন্ত্রীর মত উদ্ভিদের স্নায়ুগুলিও কাজ করে। চর্মচক্ষে এই স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশেষ ধরনের অক্ষিদণ্ড পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন। যে নিবন্ধে উদ্ভিদের এই স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার কথা লিখেছিলেন সেই নিবন্ধের নাম 'Response in the Living and Non-Living. বোসের এই আবিষ্কারের প্রতি কোন রকম স্বীকৃতি না জানিয়েই অধ্যাপক Waller তাঁর নতুন গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্যই রেখেছিলেন—'যে কোন ভেষজ প্রটোপ্লাজম বিদ্যুৎ স্পর্শে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।'

আচার্য বোস এক ধরনের আক্ষিক স্পন্দনিরূপ (optical pulse recorder) যন্ত্র আবিষ্কার করে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে দেখিয়েছিলেন যে, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ প্রভৃতির চামড়ার মত আঙ্গুর, টম্যাটো এবং অন্যান্য ফলের এবং শাকশব্জির ত্বকও একই ধরনের ব্যবহার করে। (উদ্ভিদের রক্তবাহী স্নায়ুনালীর আবিষ্কারও তিনিই প্রথম করেন।)

উদ্ভিদের ব্যবহার সত্যি সত্যি আশ্চর্য! যদি তার গোড়ায় মাদক পানীয় দেওয়া যায় মানুষেরই মত তা উত্তেজিত হয়ে উঠে, মাত্লামীর ভাব করে। বারের মদ্যপের মত টল্মল্ পর্যন্ত করে। আবার নির্দিষ্ট সময়ে নেশার ঘোর কেটে গিয়ে স্বভাবজ ব্যবহারই করে।

মরমিয়ার অন্তরোপলব্ধি আর বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই সপ্তদশ শতাব্দীতেই মানুষ অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, উদ্ভিদের যৌনজীবন আছে। গ্যয়টে বলেছিলেন, উদ্ভিদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির বিপরীত ঊর্ধ্বগতির টান আছে। তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, আমাদের এই পৃথিবীও প্রাণহীন নয়। সেও শ্বাস নেয়। আমরা যেমন নিই অক্সিজেন—সে নেয় জল। প্রশ্বাসে সে ত্যাগ করে ঊর্ধ্বমুখি জলীয় বাষ্প।

(Fechner বলেছেন—মানুষ ত্রিস্তরীয় জীবন যাপন করে—(১) গর্ভধারণ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার প্রাক্কাল পর্যন্ত নিদ্রার জীবন, (২) পৃথিবীতে অর্ধজাগরণের জীবন এবং (৩) মৃত্যুর পর পূর্ণ চৈতন্যের জীবন। তাঁর মতে প্রাণের স্পর্শ রয়েছে সর্বত্র, জীবে-অজীবে)

(উদ্ভিদের আত্মা তার স্নায়ুতন্ত্রীর সঙ্গে ততটুকুই যুক্ত, যতটুকু মানুষের দেহের সঙ্গে তার আত্মার সংযোগ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণপ্রবাহ দেহের সর্বাঙ্গে, প্রতি কোষে, প্রতি তন্ত্রীতে প্রবাহিত। তথাপি এই দেহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন, যে দেহকে সে পরিচালিত করে। এই আত্মিক ক্ষেত্র নিখিলবৈশ্বিক আত্মিক ক্ষেত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত।)

(ফেক্নার এই জন্য জ্ঞানবৃক্ষে এক নতুন শাখা যুক্ত করেছিলেন, যার নাম Psychophysics. এই আত্মিক পদার্থ বিদ্যাতে তিনি দেহ ও মনের কৃত্রিম ব্যবধানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এরা হল একই সত্যের দুটি দিক।

প্রভেদ এই যে, মনকে মনে হয় আত্মিক, এবং দেহকে মনে হয় বৈষয়িক। এ যেন এমন এক বস্তু কোথাও যা নতোদর (concave) কোথাও মধ্যোচ্চ (convex)। পার্থক্য শুধু দর্শকের অবস্থানের উপর—, অর্থাৎ দর্শনীয় বিষয়ের ভেতর থেকে দেখার বা বাইরে থেকে দেখার! প্রত্যেকটি জিনিস সেই একই প্রাণশক্তির প্রকাশক—কোথাও ক্ষুদ্র স্থূল বিশ্বরূপে, কোথাও মহাবিশ্বরূপে। এই প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল বিশ্ববিকাশে, এর শেষ হবে বিশ্বের মৃত্যুতে।

ডারউইন 'যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীই বেঁচে থাকে' একথা বলে পরোক্ষভাবে জীবনকে আকস্মিকতার দান না বলে অন্য কিছুর অবদান বলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

L. Burbank—উদ্ভিদ জীবনের গভীর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে এটাই প্রকাশ করেছিলেন যে, যখন তিনি বিশেষ ভাবে তাদের বেড়ে ওঠার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, যে বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার স্বাভাবিক বিকাশের কোন মিল নেই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, উদ্ভিদে বিশটিরও অধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের সূত্র আছে। যেহেতু তাদের গঠনশৈলী আমাদের অপেক্ষা অনেকটাই পৃথক সেই জন্য আমরা তাদের সংবেদনশীলতাব সূত্রগুলির যথার্থ হদিশ করতে ব্যর্থ হই। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগিয়াবা তাঁদের এই মনুষ্যোর্ধ্ব অনুভূতির কথা জানতেন বলেই দেবতা হিসেবে তাদের পুজো করতেন অর্থাৎ বৃক্ষপুজো! আমরা যাকে কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিই, ততটা কুসংস্কারপূর্ণ সে নয় বরং একে উচ্চতর সংস্কার বলাই বিধেয়।

L. Burbank—উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করলেও একটি জিনিস বুঝে উঠতে পারেননি যে, লতাগুল্ম ও ফুলেরা তাঁর ভাষা বুঝতে পারে কি না। সরাসরি তার ভাষা বুঝতে না পারলেও তিনি একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন যে, টেলিপ্যাথি ধরনের এক প্রকার যোগাযোগের ফলে ভাষা না বুঝলেও লতাগুল্মাদি মানুষের অন্তরের অবস্থা বুঝতে পারে।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক বিভাগের প্রধান ডঃ টি. সি. সিং—তাঁর এক তরুণী সহকর্মিনী স্টেল্লা পোন্নাইয়াকে একটি ইহাড্রিল্লা উদ্ভিদের পাশে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাতে বলেন। মহিলাটি নৃত্য ও বেহালা বাদনে রীতিমত পটিয়সী ছিলেন। দেখা গেল একটি নির্দিষ্ট গ্রামে সুর তুলে বেহালা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদটির প্রোটোপ্লাজমার গতি বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মে যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোচারণ ক্ষেত্রে বাঁশী বাজিয়ে এই ভাবে তৃণভূমি ও বৃক্ষাদিতে শ্যামলিমা ফুটিয়ে তুলতেন। এই সুরের জাল বিস্তার করে তানসেনের মত গায়কও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারতেন। সুরের জাল বিস্তার করে তিনি বর্ষা নামাতে পারতেন, আগুন জ্বালাতে পারতেন। শুধু তাই নয়, সময়ের আগেই পুষ্পবৃন্তে ফুল

ফোটাতে সক্ষম হতেন। সম্ভবত অরণ্যভূমি ও উদ্ভিদজগৎকে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরে তোলার জন্য এই কারণেই প্রকৃতির এক অদ্ভুত ব্যবস্থাপনায়—সেখানে পাখির গান ও ঝিল্লির তানের প্রয়োজন হয়েছে।

একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদজগতের উপর সুরসঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। সুর সঙ্গীত সৃষ্টি করে অবশ্য একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে, যেমন প্রতি সেকেন্ডে একশ থেকে ছয়শ সাইকেল তরঙ্গ তুলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, ফল ধরা সব ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাদ্যযন্ত্রের এবং নূপুরের সাহায্য ছাড়াই ভারতনৃত্যের সুরছন্দ তুলে ডেইজি, মেরিগোল্ড, পিটুনিয়া প্রভৃতির বৃদ্ধি দ্রুততর করা গেছে। পনের দিনের মধ্যেই তাদের বৃন্তে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মৃত্তিকাতে এই চরণসম্পাতের ফলে যে নৃত্যছন্দ ফুটে উঠেছে তারই স্পন্দন উদ্ভিদ স্নায়ুতে সাড়া জাগিয়েছে বলে।

(এই যে অসংখ্য রকম পতঙ্গ আমরা দেখতে পাই তারা পঞ্চাশ হাজার সাইকল পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। এই ধরনের সাইকল বাদুরের ডানা সঞ্চালনে ফুটে উঠে, যা শুনতে পেয়েই তাদের এই জাতশত্রু সম্পর্কে পতঙ্গেরা সাবধান হয়ে যায়। উদ্ভিদ জগৎ লক্ষ্য করে দেখা গেছে যেখানে বাদুরের উপস্থিতি নেই সেখানে শস্যকণা অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ কীটদুষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে বাদুরের উপস্থিতি আছে সেখানে এই ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ শতাংশ। তাছাড়া বাদুরের উপস্থিতিতে শস্য-চাড়ার দৈর্ঘ্যও কমপক্ষে দুইঞ্চি বেড়ে যায়। উদ্ভিদের উপর আলট্রাসনিক শব্দ প্রযোগ করে দেখা গেছে যে তাদের এনজাইম ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর এর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে - বিশেষ করে সূর্যমুখী, জ্যাকপাইন প্রভৃতির উপর। এই ফ্রিকোয়েন্সি উদ্ভিদের পক্ষে এক ধরনের উত্তেজক দাওয়াইয়ের মত কাজ করে।)

The Book of The Secret Enoch-এ বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু, মৃত্তিকার লতাগুল্মাদি থেকে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব নিয়ন্ত্রক শক্তি বা দেবতা রয়েছে। প্রাচীনকালেই হারমিস ট্রিসমেজিসটাস বলেছিলেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, মন আছে, আত্মা আছে, ঠিক যেমনটি আছে পশুজগতে, মানুষের জগতে। এই জন্য গ্রীকরা হারমিসকে দারুন শ্রদ্ধা করতেন। অনেকের ধারণা, প্রাচীন মিশরের শিল্প, বিজ্ঞান, জাদুবিদ্যা, রসায়ন-বিজ্ঞান, ধর্ম, সব কিছুরই উদ্ভাবক হারমিস।

একটা সুরছন্দ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুরই উদ্ভব সম্ভব নয়। এমন কি এক কণা অণুর মধ্যেও তার নিজস্ব সুরসঙ্গীত আছে। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডোনাল্ড হ্যাচ এনড্রুজই এমন মন্তব্য করেছেন। এই সুরছন্দের ফ্রিকোয়েন্সিই মহাকাশকে তেজদৃপ্ত করে রেখেছে। এই তেজ, ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গ, কোন মাধ্যম ছাড়াই মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এই

বৈদ্যুতিক গতিই প্রাণশক্তি উদ্ভাবনের পশ্চাতে এক বড় রকমের উপাদান। এই বিদ্যুৎ শক্তির মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের ক্ষমতা যা-প্রাণী দেহের মধ্যেও বিদ্যমান থেকে তার মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণীশক্তি তৈরি করে—Mesmer সাহেব যার নাম দিয়েছেন Animal Magnetism.' প্রাণশক্তির মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ প্রাণের উদ্ভবের একটা মৌল উপাদান। উদ্ভিদ জীবনের উপরও বিদ্যুৎশক্তির এই পরিমাণ, গুণগতমান, স্থায়িত্ব প্রভৃতি একটি বড় ঘটনা। এমন যে জড় পদার্থ তা থেকেও লক্ষ্য করা যায় প্রতি নিয়ত একটা তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে—যাকে বলে রেডিও অ্যাকটিভিটি। এমন যে মাটি তা থেকেও প্রতিনিয়ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবিত পার্টিকুলসমূহ আকাশের দিকে ছুটে চলেছে। আয়ন নামক পার্টিক্‌ল হয় অণু, অণুপুঞ্জ বা মলিকুল,—যার মধ্যে ধনাত্মক বা নঞর্থক একটা চার্জ আছেই। তার ধনাত্মক ও নঞর্থক চরিত্র নির্ভর করে কতটা ইলেকট্রন সে পেল বা কতটা হারাল তার উপর।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিনে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর, ধরণীতে তখন পাওয়া যাবে নঙর্থক ইলেকট্রিক চার্জ. কিন্তু আবহাওয়া মণ্ডলের চার্জ হবে ধনাত্মক। মাটি থেকে, উদ্ভিদ থেকে ঊর্ধ্বদিকে ছুটে চলে ইলেকট্রন। কিন্তু ঝড় ঝঞ্ঝা দেখা দিলেই সবটা উল্টে যায়—মৃত্তিকাই তখন ধনাত্মক হয়ে উঠে, মেঘের স্তর নঞর্থক।

পৃথিবীতে শক্তিপ্রবাহ আসে মহাকাশ থেকে!

মহাকাশীয় তেজ যে মহাশূন্যতার সঙ্গে যুক্ত তা নয়। ইথার (যদিও বর্তমানে ইথার চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে) যে সম্পূর্ণ ভাবেই বস্তুগুণহীন তা নয়। নানা শক্তিপ্রবাহের এক অপূর্ব সমন্বয় মাত্র। এ হল এক ধরনের সর্বব্যাপী মাধ্যম, যার মধ্যে বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি রূপান্তরিত হয়ে ইলেকট্রিকাল পার্টিকুলের রূপ নেয়।

উদ্ভিদ যদি বিচার করি তাহলে দেখতে পাব উদ্ভিদের কোষগুলি এক ধরনের ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে, বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। এবং এরাই তার স্নায়ুমণ্ডলি রূপে দেখা দেয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি এই বৈদ্যুতিক স্নায়ুতন্ত্রীর জন্য—হরমোন বৃদ্ধির জন্য নয়।

উদ্ভিদ. পশু, মানুষ সকলেরই এক ধরনের ক্ষেত্র আছে। অর্থাৎ অবআণবিক বা প্রটোপ্লাজমিক শক্তির একটা সূক্ষ্মাবরণ। এই সূক্ষ্ম সত্তা স্থূলদেহের মলিকুল ও অণুগুলিকে সিক্ত করে আছে। উদ্ভিদের পত্রগুলিকে দুই দিক থেকে ফিল্ম দিয়ে চেপে ধরে ফটো নিলে এক ধরনের—দৃষ্টিভ্রমী ছবি তুলে ধরে। এই দৃষ্টিভ্রমী ছবিগুলিকে এ পর্যন্ত শুধু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেত। এর মধ্য থেকে যে নানা ধরনের রঙ বিচ্ছুরিত হয় দিব্যশক্তি সম্পন্ন পুরুষদের চোখে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে (এই রঙ মানুষের দেহের রোগের ধরন নির্ণয় করে দিতে পারে—ঠিক কিরনিয়ান

ফটোর মত)। পাতার চতুর্দিকে যে একটি স্বাভাবিক বর্ণবলয় আছে পাতাটিকে ছিঁড়েকুটে দিলে তা বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। আহত বৃক্ষপত্রের মৃত্যু হতে থাকলে এই বর্ণবলয়ও ধীরে ধীরে উবে যায়। খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাতা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে এক ধরনের রঙ আকাশের দিকে ভেসে যাচ্ছে।)

(কিরলিয়ান ফটো পরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছে যে, প্রাণহীন ধাতব বস্তু, যেমন ধাতব মুদ্রার উপরও একপ্রকার জ্যোতির্বলয় আছে। একটা মানুষের নখের ডগায় সেই বর্ণবলয় যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত। কিরলিয়ান এই জ্যোতি অথবা বর্ণবলয়গুলিকে বলেছেন—'Electrical Properties', কিন্তু আমেরিকানরা এর নাম দিয়েছেন—'Biological Plasma Body' প্রাচীনেরা একেই বলত 'আকাশ দেহ'—Astral Body. পদার্থবিদ্যায় এই প্লাজমা অর্থ হল এক প্রকার বৈদ্যুতিক ভাবে নঞর্থক অতি উচ্চ ধরনের আয়নীভূত ধূম্র। এর মধ্যে রয়েছে আয়ন, ইলেকট্রন ও নিউট্রাল পার্টিকল। এই বাইওপ্লাজমিক দেহই বস্তুর চতুর্থ মাত্রা। বস্তুর বাকী তিন মাত্রা হল—ঘন, তরল ও গ্যাসীয়। এই সূক্ষ্ম দেহে একধরনের জটিল গোলকধাঁধা জাতীয় গতি রয়েছে। যে গতি বস্তুসত্তার শক্তিমাত্রা থেকে একটুখানি ভিন্ন ধরনের। তাই বলে যে এই বাইওপ্লাজমিক দেহ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ তা নয়। এর মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের ঐক্যবন্ধ জৈবসাত্ত্বিক অবস্থা। এরও একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। এই ফিল্ডই জৈবসত্তার বা জৈব ফিল্ডের ভিত্তিভূমি।)

এই যে বাইওপ্লাজমিক দেহ, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এই দেহই বিশ্বনিখিল সত্তার সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে। এই দেহই প্রাক-স্থূল জৈব দেহ, যে দেহের সঙ্গে বস্তুসত্তাহীন বিশ্বসাত্ত্বিক অবআণবিক ঘূর্ণায়মান আকর্ষক্ষেত্রের যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ যে দেহ বিশ্বসত্তার সঙ্গে প্রাণীসত্তার মিলন ঘটিয়েছে, বিশ্বসাত্ত্বিক সার্বিক অবস্থা যারই মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বসত্তা এই প্রাকস্থূলজৈবসত্তার মাধ্যমে জৈবসত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। (মানুষের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ, সবই এই বায়োপ্লাজমিক দেহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এই জন্য অধিমনোবিজ্ঞানীরা একে নিখিল বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গ্রহ গ্রহান্তর, মানুষের মানস তরঙ্গ, সব কিছুর আন্তক্ষেত্রের সন্ধান ব্যক্তিসত্তা এই সূক্ষ্ম সত্তার মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। যদি এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্য একটুও হেরফের ঘটে সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্ষ্মসত্তার অতীন্দ্রিয় আকর্ষক্ষেত্রে তার ছোঁয়া লাগে, রাডারে যেমন দূরবর্তী তরঙ্গের সাড়া পড়ে। মানুষের অতিলৌকিক ক্ষমতা এই সূক্ষ্মদেহের সাহায্যেই এসে থাকে।)

এই সূক্ষ্মদেহকে যারা আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত করতে পারে তারা এই পৃথিবীতেই এমন কিছু কাজ করতে পারে সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না —যেমন স্পর্শ না করেই শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গির সাহায্যেই পেপার ক্লিপ, দেশলাই

সিগারেট এবং অন্যান্য আরো জিনিসকে নাড়িয়ে দেওয়া। লেখকের কাছে যোগ শেখেন এমন এক আমেরিকান মহিলা Marge Ranney-র মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নিনা কুলাগিনা এমনতর শক্তি প্রদর্শন করে বস্তুবাদীদের রীতিমত চমকিত করে দিয়েছিলেন। মনোস্তত্ত্ববিদেরা একে বলেন Psycho Kinesis অর্থাৎ আত্মিক শক্তি। নব মনস্তত্ত্ববিদ Genady Sergeyev এই অতীন্দ্রিয় শক্তি প্রদর্শন কালে নিনা কুলাগিনার ছবি তুলে দেখেছিলেন যে, যখন সে এই ধরনের শক্তি প্রদর্শন করে তখন তার স্থূলদেহের উপরস্থ বায়োপ্লাজমিক দেহ স্ফীত হয়ে ওঠে ছন্দে ছন্দে স্পন্দিত হয়। তার চোখ থেকে এক ধরনের জ্যোতি বেরিয়ে আসে।

এই বায়োপ্লাজমিক দৈহিক বলয় যে শুধু প্রাণসাত্ত্বিক একককে কেন্দ্র করেই রয়েছে তা নয়, একটি মৃত পাতার চারদিকেও এই বলয় লক্ষ্য করা যায়। তবে জীবন্ত পাতার চতুর্দিকস্থ এই বায়োপ্লাজমিক দেহ যেমন বর্ণচ্ছটা ছড়ায় মড়া পাতার চারদিকে তা দেখা যায় না। এখানে এই সূক্ষ্ম আবরণ হল অবিচিত্র একটা আলোর আভা মাত্র। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির সাহায্যে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, আহত পত্রের কেন্দ্রস্থলে রক্তবর্ণের একটা আভা ফুটে বেরিয়েছে। তার সেই নয়নহরণ সবুজের বাহার হারিয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক টিল্লার মনে করেন, বৃক্ষপত্র থেকে যে আলোর জ্যোতি বেরয় বা মানুষের অঙ্গুষ্ঠাগ্র থেকে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে তা সম্ভবত এই বায়োপ্লাজমিক দেহ থেকেই আসে।

অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে এই যে, কোন বৃক্ষপত্রের কিছু অংশ কেটে নিয়ে যদি তার কিরলিয়ান ফটো তোলা যায় তাহলে দেখা যায় যে, সরিয়ে ফেলা অংশটুকুর বায়োপ্লাজমিক চিত্রও সেখানে ফুটে উঠেছে। সম্ভবত এ বিশ্বাস প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও ছিল ; যে জন্য তারা মনে করত যে, স্থূলদেহের সামান্যতম অংশও যদি মৃত্যুর পর থেকে যায়, তাহলে সূক্ষ্মদেহ তাকে কেন্দ্র করেই ঘোরাফেরা করে। এই বিশ্বাস থেকেই কাপালিকরা নরকরোটি কাছে রাখতেন মৃতের সূক্ষ্মদেহকে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য। তান্ত্রিকেরা একেই বলে ভৈরব।

জৈবদেহকে ঘিরে বৈজ্ঞানিক মানসের চেষ্টা কত না বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের উপহার দিয়েছে। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যারা উত্তর বা দক্ষিণমুখী হয়ে শুয়ে থাকে তাদের স্মরণশক্তি রীতিমত বেড়ে যায়। কিন্তু মেরুপ্রদেশীয় এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূব ও পশ্চিম দিকে যারা মাথা রাখে তাদের স্মরণশক্তি অনেক কম হয়। অত্যাধুনিক এই বৈজ্ঞানিক তথ্য ভারতীয়েরা বোধহয় বহু প্রাচীন কালেই অবগত হতে পেরেছিলেন, যে জন্য দক্ষিণ শিয়রে তাঁরা শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে উত্তর

শিয়রের গুরুত্ব ততটা অনুভব করতে পারেননি।

মানুষ যেন একটা দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত—ভাবাবেগে কখনও এদিক, কখনও ওদিকে দুলতে দুলতে চলেছে। প্রেমপ্রীতির আবেশ প্রশান্ত ছন্দময় গতিতে চলে। ক্ষুব্ধ চিত্ততা এই গতিপ্রবাহকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ করে তোলে। গতি এবং তার এই উত্থান পতনই জীবন। যখন এই গতি কমে যায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যখন তা থেমে যায়, তখন মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

যে-কোন দৈবসত্তার উপরের যে দেহ তা যেন পৃথিবীর উপরের আবহাওয়া মণ্ডলের মত। যতই উপরে ওঠা যায় ততই সে হাল্কা হতে থাকে। আর এই সূক্ষ্ম সত্তার এককগুলি শক্তিবলয়রূপে আরও উপরের কোন চিৎসত্তা থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার দেহের উপরকার শক্তিক্ষেত্র (Energy field) তাতে রীতিমত বিঘ্নিত হতে পারে। Chrysanthemum (এক ধরনের উদ্ভিদ) এর উপর যে শক্তিক্ষেত্র অর্থাৎ গাছের বা গাছের পাতার যে বায়োপ্লাজমিক দেহ আছে, দেখা গেছে, যদি কোন লোক কাছে থেকে সেই গাছ বা গাছের পাতা লক্ষ্য করে জোরে জোরে চিৎকার করে ওঠে তবে তার নিবিড় সবুজ রঙ কেমন ফেকাসে হয়ে যায়। আর তার প্রাণশক্তি-প্রবাহের তরঙ্গ নেতিয়ে পড়ে। অর্থাৎ গ্রাফের রেখাতে তা এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে—মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যারা অনবরত চিৎকার করে—তাদের মাথার কাছে প্রায় তিন ফিট দূরত্বে কোন গাছের চারাকে প্রতিদিন দু-ঘণ্টার বেশি রাখা হলে তার নিচের দিকের পাতাগুলি ঝরে পড়ে এবং তিন দিনের মধ্যে গাছটিও প্রায় শুকিয়ে যায়।

সুতরাং ··সুতরাং গাছেরও প্রাণ আছে, মন আছে, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ, সবই আছে। অচলায়তনে আবদ্ধ কোন প্রাণহীন, গতিহীন, ভাবলেশহীন অস্তিত্ব মাত্র না এই বৃক্ষ। সুন্দরী বৃক্ষেরও প্রাণ আছে।

তিন

জানিনা কতক্ষণ আত্মস্থ হয়ে ছিলাম আরণ্যক রহস্যের অন্তর রহস্য ভেদ করার মানস প্রচেষ্টায়। অকস্মাৎ ভটভটিটা একটু কেঁপে উঠতে আন্তচিন্তার সেই প্রবাহের সূত্রটি যেন কেটে গেল। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালাম পরিপার্শ্বের দিকে। ভাটার টান খুবই বেশীরকমে টান দিয়েছে খাড়ির জলে। ভেজা ভেজা ধূসর মৃত্তিকার পাড় আন্ত দৈন্য প্রকাশ করে খাড়ির তলদেশের অনেকটা পর্যন্ত নেমে এসেছে। জল যেন মাটির কঙ্কালের উপর চর্মাচ্ছাদনের মত। জল সরে

যেতেই হাড় গোড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের তটরেখা ভট্‌ভটি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক তো চলে এসেছি, তবু সেই সাতজিলিয়া দ্বীপ কতদূরে কে জানে! এখনও তার কোন হদিশ নেই। ভূধর বলেছিল মাত্র সাত ঘণ্টার জার্নি। এখন মনে হচ্ছে অন্ততঃ দশ ঘণ্টাতেও সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারব না।

সুন্দর বনের তটরেখা দূরে সরে গেলেও তার মাথার উপর সতেজ সবুজ পাতার ঢেউয়ে এতটুকু মলিনতা নামেনি। প্রাণের বিজয়কেতন উড়িয়ে সুন্দরবন যেন একটা রহস্যময় হাসি হেসে আমাদের দেখছে। সূর্যটা আকাশে অনেকটাই হেলে পড়েছে। কিন্তু তখনও তার অগ্নিদাহের তেজ তেমন কমেনি। ভূধরের ছোট ভাই মাথার উপর ছাতা তুলে ধরে রোদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। মানুষের জীবনসংগ্রামের শেষ নেই। পড়ন্তবেলার হাত-ছানি পড়লেও ছোট ছোট জাল নিয়ে খাড়ির কিনারে কিনারে অজস্র মানুষের জাল ঝাঁপানোর ভিড় কমেনি। প্রাণের তাগিদ, বাঁচার তাগিদ, উদ্ভিদ ও বনের শ্বাপদকুল অপেক্ষা মানুষেরও তো কম নয়!

একটু দূরে আরেকটি বাঁকে খাড়ির প্রশস্ততা অনেকটা যেন বড় বলে মনে হচ্ছে। ডান দিকে সুন্দরবনের স্বচ্ছন্দ বিস্তার বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো সর্বগ্রাসী মানুষ সেখানে দুর্ধর্ষ প্রাণের আবেগে বন কেটে বসত তৈরি করেছে। তাদের নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতে আঘাতে ওধারের শেষ সুন্দরী বৃক্ষগুলি আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের মত সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্তু বাঁয়ে তাদের অবাধ বিস্তারে এখনও কোন হস্তক্ষেপ হয়নি। যেন সার্বভৌম আরণ্যক শিরোপা মাথায় পরে স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। এরাজ্যে প্রবেশের জন্য মানুষের কোন ছাড়পত্র নেই।

হঠাৎ দেখি ভূধর ভট্‌ভটির ছাদে উঠে এসেছে। তার অন্তরে কেন যেন একটা সাড়া পড়েছে। হঠাৎ ওর বাবার কথা মনে পড়েছে। বহুদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। তিনি ভাল আছেন তো? মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমার পাশে এসে বসল সে, স্যার একটু দেখবেন?

—কি?

দেখুন তো আমার বাবার শরীরটা কেমন আছে?

আমি ধ্যান করি। জানিনা কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে বায়োপ্লাজমিক দেহের মাধ্যমে বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমি আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি কিনা। কিন্তু একটু চোখ বুজলেই মনে হয় লক্ষ যোজন দূরে অনন্ত মহা-দেশের কোন্ সুদূর কেন্দ্রে চলে গেছি আমি। আমাদের সৌর মণ্ডল, ছায়া-পথ, নেবুলা সব ছাড়িয়ে মহাবৈশ্বিক এক স্বচ্ছ ঘূর্ণাবর্ত স্তরের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। তখন সময়ের কোন গতি থাকে না, দেশের কোন ব্যবধান থাকেনা।

মনে হয় এক চির বর্তমানের মধ্যে আমি রয়েছি। অথচ এই বর্তমানের নির্দিষ্ট বিন্দু ঠিক করা তো চারটিখানি কথা নয়! এই বর্তমান কতক্ষণ সময়ের জন্য স্থির? অনন্তবার সময়কে ভাগ করলেও এর হদিশ নাও পাওয়া যেতে পারে। একমাত্র গতিহীন মহাশূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়তে না পারলে বর্তমানের হদিশ পাওয়া যাবে না।

সে যা-ই হোক—ধ্যান করতে করতে একটি ক্ষমতা অন্ততঃ আয়ত্ত হয়েছে এই যে, স্থূল পদার্থের অভ্যন্তর ভাগ দেখতে পাই। মানুষের স্থূল দেহ ভেদ করে তার অন্তর্জগৎ ধরা পড়ে। বহুদূরে কোন জিনিস থাকলেও চোখের দৃষ্টির নিকট-বৃত্তের মধ্যে তা ধরা পড়ে যায়।

ভূধর বাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই দেখি—গোলগাল চেহারার একটি লোক, গোল মাথা, বিরল কেশ, কার কোলে মাথা রেখে অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে হেলে রয়েছেন। কপালে বিন্দু বিন্দু সঞ্চারিত ঘর্ম। পেটের মধ্যে লাল। আলসার জাতীয় রোগ হলে এরকম রঙ দেখা যায়, বা রক্ত আমাশয়। ভূধরের বাবা যে একেবারেই সুস্থ নয় তা স্পষ্ট বোঝা গেল। বললুম, তোমার বাবার শরীর ভাল নেই। পেটের যন্ত্রণা। সম্ভবত আলসার। মাথা ঘুরছে। ভূধরের ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানা গেল—হ্যাঁ, রোগটা আমি যা বলেছি তাই। তার কাছে এরকম খবর এসেই পৌঁচেছে।

ভূধরের কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠল। বলল, দেখুন তো স্যার বেঁচে আছেন তো?

আবার চোখ বুজলুম। দেখি স্তব্ধ দেহ। উপরে সেই ধূম্রাকৃতি বায়ো-প্লাজমিক দেহ। এ নিশ্চিত মৃত্যুর লক্ষণ। কিন্তু মৃত্যুর কথা তো কাউকে বলতে নেই। বললুম, খুব একটা ভাল ঠেকছে না। আর ঘণ্টাখেক ঘণ্টার মধ্যে গিয়েতো পৌঁছুব। দ্যাখো কেমন আছেন।

বুঝলুম ভূধর খুব খারাপ সংবাদটা পাবে বলেই ধরে নিল। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল—সেটা যেন আগত সন্ধ্যারই মত নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল।

খাড়ি নতুন বাঁকে গিয়ে পড়ল। রোদের গায়ে তখন ছায়ার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তার জ্বলন্ত কামড়টা অনেক কমে এসেছে। হাওয়ার গায়ে জড়িয়ে আসছে স্নিগ্ধতা। খাড়ির পরিধিটাও একটু বেড়ে গেছে। ভূধরের ভাই ছাতাটা এবার নামিয়ে নিল—রোদের গায়ে সেই ক্রোধের আমেজ আর নেই। আমি আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনের মধ্যে ডুব দিলুম।

মানুষের স্থূল দেহটা শেষ হলেই যে তার সব শেষ হয়ে যায়—তা নয়। আমাকে বহুজন তাদের পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে চোখ বুজে আমি তাদের ছবি দেখতে পেয়ে বলে দিয়েছি। তাতে তারা রীতি মত অবাক বোধ করেছেন। আমি যাঁর দেওয়া দামি ক্লিপ-বোর্ডে এখন লিখি

তিনি একজন বড় ডাক্তার। নাম ডঃ হিমাংশু ব্যানার্জী। তাঁর মেডিক্যাল উপাধি বিরাট— B. Sc. M. B B. S D. C H (Cal) M. I. C. P (U S. A) ইত্যাদি চিকিৎসা করেন বটে—তবে অধ্যাত্ম জগতের প্রতি দারুণ আগ্রহ। আমার কিছু বই পড়েছিলেন এবং লোক মুখে শুনেছিলেন যে, আমার কিছু Occult Faculty আছে। কৌতূহলবশত একদিন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও সহজে এ-জগতের কোন লোককে বিশ্বাস করতে রাজি নন। বাজিয়ে দেখতে চান। প্রথম এসেই জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারেন আমি দীক্ষিত কিনা ?

আমি কারো কপাল পড়তে পারি না। হাত দেখতেও জানি না। কাক চরিত্র বলে যে একটা বিদ্যা আছে আমার তাও জানা নেই। কণ্ঠস্বর শুনে মানুষের চরিত্র অনুমান করার ক্ষমতাও আমার নেই। বলতে গেলে একথাটাই আমার পক্ষে অত্যন্ত খাঁটি যে, জাগ্রত অবস্থায় আমার সমগ্র ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত ভোঁতা। কিন্তু চোখ বুজলে নিকট তো দূরস্থান আমি তখন বহু দূরদর্শী। ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে আমি চোখ বুজলুম—দেখলুম তিনি দীক্ষিত। বললুম, হ্যাঁ, দীক্ষিত।

কি মন্ত্রে দীক্ষিত বলতে পারেন ?

শুনেছি—কে কি মন্ত্রে দীক্ষিত একথা নাকি বলা যায় না। কিন্তু আমি চোখ বুজলে—কার শক্তি তরঙ্গ কি ধরনের, ইষ্ট দেবতা কে, দেখতে পাই। তাই চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগলুম তাঁর ইষ্টদেবতার জন্য। দেখি ধীরে ধীরে চোখের সামনে মাতৃদেবতা ভেসে উঠলেন। বললুম, আপনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত।

তবু যে ডাক্তার বাবুর সবটুকু সন্দেহ ভাঙল তা নয়। তিনি আরও একটু পরীক্ষা করলেন আমাকে। আমার মায়ের কথা বলুন।

চোখ বুজেই বুঝতে পারলাম যে, ওঁর মা ইহ জগতে আর নেই। বললুম, তিনি তো জীবিত নেই।

—কোথায় আছেন ?

-- অর্থাৎ ?

—আপনি আপনার গ্রন্থে লিখেছেন—মৃত্যুর পরে মানুষের সূক্ষ্মদেহ দেশের বিভিন্ন স্তরে থাকে। কখনও কখনও গ্রহান্তরে গিয়েও জন্ম নেয়। এমন কি ভিন্ন সৌর মণ্ডল, ছায়াপথ—অথবা ভিন্ন বিশ্বেও জন্ম নিতে পারে। আমার মা কি আমাদেরই বিশ্বের জন্ম নিতে পারে ? কোন্ স্তরে আছেন ? না ভিন্ন কোন বিশ্বে গিয়ে জন্ম নিয়েছেন ? অথবা এই বিশ্বেরই কোন গ্রহে গিয়ে আবার জন্ম গ্রহণ করেছেন ?

চ্যালেঞ্জ খুব বড় রকম সন্দেহ নেই। আবার চোখ বুজলুম। দেখি একটি মহিলা ছায়া মূর্তিকে আর একটি উজ্জ্বল ছায়া মূর্তি দেশের তৃতীয় স্তর ও চতুর্থ স্তরের মাঝামাঝি কোন এক স্থান থেকে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন।

বুঝলুম, সেই উজ্জ্বলদেহী সূক্ষ্ম সত্তাটি তাঁর গুরু। বললুম—, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মাঝামাঝি তিনি আছেন।

—আমার মা কি মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন বলতে পারেন?

চোখ বুজে দেখি মানস নেত্রে মা ৺কালী দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম, শক্তি মন্ত্রে।

ডাক্তারবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন।

পরে ডাক্তারবাবু খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, হ্যাঁ তিনি ৺কালীকেই পূজো করতেন। তবে হিন্দুদের দেবতাদের ক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবারের মত একটা সহাবস্থান আছেই। তাই একই বেদীতে কৃষ্ণও থাকেন ৺কালীও থাকেন। তেমনই তার ৺মায়ের বেদীতেও নানা ধরনের দেবদেবীর প্রতিমা ছিল।

মাস কয়েক পরে ডাক্তারবাবু আবার আসেন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে। আবার তিনি ৺মায়ের প্রশ্ন করেন। বলেন, আমার ৺মা কোথায় আছেন দেখুন তো? চোখ বুজে দেখি সেই একই ক্ষেত্রে চেতনাহীন অবস্থায় তাঁর স্বর্গীয় মাতৃদেবী রয়েছেন। এবার দৃশ্য ভিন্ন। যেন তিনি নিচে পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর অধ্যাত্ম জগতের গুরু তাকে আপ্রাণ উপরে তুলে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। মনে হচ্ছে মায়ের সর্বাঙ্গ অবশ। তিনি পক্ষাঘাতদুষ্ট। সে কথা তাঁকে বলতেই তিনি বললেন, আশ্চর্য! আমার মায়ের মৃত্যু হয় পক্ষাঘাত রোগেই।

পরে জেনেছি ডাক্তারবাবুর নিজেরও ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে। এই শক্তির জন্য বিশেষ রূপে তিনি খ্যাতিমান। বিনা পরিশ্রমিকে এবং নিজে বিনা মূল্যে অষুধ দিয়ে বহুবার আমাকে তিনি চিকিৎসা করেছেন। তবে ডাক্তারবাবুর ছেলে সম্পর্কে কিন্তু আমার দেখা নির্ভুল হয়নি।

উত্তর কলকাতার কোন এক কলেজের অধ্যাপিকা। অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে সারা ভারত তিনি চষে বেড়িয়েছেন। আমাকে তিনি কয়েকবার ভাল ভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। আমার অদ্ভুত ধরনের যোগপদ্ধতি অনুসরণ করে এমন তিনি নিজেই প্রচণ্ড অকাল্ট ফ্যাকাল্টির অধিকারিণী। তবুও নিজস্ব কোন প্রশ্ন থাকলে এখনো তিনি আমার কাছে আসেন। ডাক্তার যেমন নিজের বা নিজের বাড়ির চিকিৎসা করেন না, ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি তার নিজের বোনকে নিয়ে এলেন। মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে—নিজের পিতৃদেবকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন তো আমার বাবাকে একটু?

চোখ বুজে দেখি চতুর্থ স্তরের প্রান্ত ঘেঁষে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। বুঝতে অসুবিধা হল না, তিনি আর ইহ জগতে নেই।

বললুম, তিনি তো দেহত্যাগ করেছেন?

—হ্যাঁ।

- পায়ের নিচের দিকটা ফোলা দেখছি কেন ?

—ফুলেছিল।

—নিজের নাড়ি টিপে টিপে দেখছেন। নিশ্চয়ই হার্টের অসুখ করেছিল ?

—হ্যাঁ।

-কি জানতে চান ?

—কেমন আছেন তিনি।

—এখনও পার্থিব চেতনাতে আচ্ছন্ন আছেন।

—মৃত্যুর সময় কোন দোষ লেগেছিল কি ?

—না।

—কোন কিছু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?

—না।

বছর দুয়েক আগে। সকাল দশটা নাগাদ রবিবার দিন সস্ত্রীক একটি ছেলে এসে হাজির। এসেছে টালাপার্ক থেকে। শরীর ভাল না থাকায় সকাল বেলা কারো সঙ্গে সাধারণত দেখা করিনা। বলতে গেলে নির্মম ভাবেই সবাইকে ফিরিয়ে দিই। হঠাৎ কি মনে হল বললুম, পাঠিয়ে দাও। বিমর্ষ মুখে এক তরুণ দম্পতি এসে হাজির। তখন কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলাম। প্রথমটা অতটা লক্ষ্য করি নি। পরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ বুজতেই দেখি তার বৃহস্পতির ক্ষেত্রে কোন একটি সর্পফণা তুলে আছে। অর্থাৎ—গৃহে নিশ্চয়ই কোন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, নিজের ঘরের কথা বল।

ছেলেটি বলল, আপনিই বলুন।

কি বলব ভাবতে লাগলুম। চোখ বুজে ধরবার চেষ্টা করলুম—কি ওরা জানতে চায়। দেখি আট দশ বছরের একটি মেয়ে। ফ্রক পরে অপূর্ব নৃত্যরতা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলুম, এই যে মেয়েটিকে দেখছি এ কে ? দম্পতি যুগলের চোখ দেখি ছলছল করছে। সুতরাং আবার চোখ বুজলুম। দেখি শরীরের বিরাট অংশ জুড়ে অপেরেশনের রেখা। একেবারে মাথা পর্যন্ত। বুঝলুম মেয়েটি আর ইহ জগতে নেই। বললুম, এত বড় অপারেশন! কি হয়েছিল ?

—'কি আর, বলুন।' কান্নার আবেগে ওরা তখন ভরে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ক্যান্সার ?

—হ্যাঁ। কিন্তু এমন কেন হল ?

চোখ বুজে সেই জবাবটা খুঁজবার চেষ্টা করলুম। বুঝলুম, মহাশক্তির অংশ, হ্লাদিনী শক্তির অংশ মেয়েটি। কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ। কেন যে, পৃথিবীতে এসছিল কে জানে! কিন্তু হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে, আবার সে আসবে—ওদেরই ঘরে। সময়ও দেখালো। ওদের সে-কথা বললুম। ছেলেটি বলল,—কিন্তু আর তো

চোখ বুজে ওর সমস্যা ধরবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম ওর স্ত্রীর মাসিক

বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একটি 'ক্যাটস আই' পরলে অবশ্য আবার তার মাসিক হবে। সুতরাং মেয়েটিকে 'ক্যাটস আই' পরতে বললুম। 'ক্যাটস আই' সে পরেছে। পিরিওডিক্যালসও নরমাল হচ্ছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সেই সন্তান আজো তাদের ঘরে আসে নি। কেন আসেনি সে কথার জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই। আমাদের মানবিক দর্শনের বাইরেও একটি জগৎ আছে—সে জগতের পূর্ণ অধিবাসী হতে না পারলে নির্ভুল বলার অধিকার কখনই হয় না।

কিন্তু ওদের দেখলাম- সন্তান অপেক্ষা শান্তির জগতের সন্ধান পাওয়া সবচেয়ে বড়—বিশেষ করে ছেলেটির। সে বলল, অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান দিন যাতে শান্তি পেতে পারি। আমি আমার রহস্যময় যোগসাধনার সূত্রটি ওদের জানালুম, যে যোগ সাধনার নির্দেশের কথা আমার 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' নামে গ্রন্থদুটির মধ্যে লিখেছি। অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সেখানে আছে। সেই ব্যাখ্যার একটা স্মৃতি মনের মধ্যে টেনে আনলুম।

যোগ সাধনায় বহু উচ্চ জগতে এখন তাঁরা বিচরণ করছে। তাঁদের কন্যার সূক্ষ্ম দেহ তারা প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পায়। এমন কি তাঁর স্পর্শ পর্যন্ত অনুভব করে। ছেলেটির নাম মহাদেব ভট্টাচার্য। স্ত্রীর নাম মণিকা। পরলোক-গতা কন্যার নাম শ্রীরূপা ভট্টাচার্য। যে নৃত্যের ভঙ্গীতে তাকে দেশের উচ্চস্তরে দেখেছিলাম। নৃত্যরতা সেই ভঙ্গীতে মেয়েটির ছবি মনে ভেসে উঠছে।

সূক্ষ্মদেহীর কত যে বিচিত্র ব্যাপার কে জানে! কালীঘাট থেকে এক বৃদ্ধ এলেন দেখা করতে! তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তার মনের উদ্দেশ্য জানার জন্য চোখ বুজলুম। অদ্ভুত এক মহিলার ছবি ফুটে উঠল। দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় বিদুষী। কিন্তু কোমর থেকে তলপেট পর্যন্ত একটা অদ্ভুত বেদনা। ছট্ফট্ করছেন।

জিজ্ঞেস করলুম, মহিলাটি কে?

—আমার স্ত্রী।

- কোমরে ও তলপেটে ব্যথা, কি হয়েছিল?

—ইনটারনাল হার্নিয়া।

—দেখছিতো অপারেশন হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—আপনিই বলুন?

-- ইহলোকে আর নেই। এই তো?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি চান?

—আপনি আপনার গ্রন্থে লিখেছেন যে, সূক্ষ্মাত্মা দেখা যায়। আমি কি তাকে দেখতে পাব?

—হ্যাঁ।

—কি ভাবে?

তাঁকে সহজ পথ বলে দিলুম।

তিনি বললেন এত সহজেই সম্ভব?

—আমিতো তাই জানি। আর এও জানি জটিল হওয়া যত সহজ, সহজ হওয়া ততই কঠিন। একবার চেষ্টা করে দেখুন না।

ভদ্রলোক বললেন, দেখব।

দিন তিনেক পরেই তিনি এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? বললেন, সত্যি সত্যিই আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আমি কি সত্যিই দেখেছি না—এ আমার মনের ভ্রম?

—সত্যিই দেখেছেন।

—মৃত্যুর পর কোন সূক্ষ্ম সত্তা তাহলে থাকে?

—থাকে এবং ইদানীং বৈজ্ঞানিকভাবেও তা প্রমাণিত।

ভদ্রলোকের সেই অভিজ্ঞতার কথা যখন তিনি জানাচ্ছিলেন, তখন—আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন নবপত্র প্রকাশনের প্রসূন বসু।

সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল একটি কাঁচ মেয়েকে নিয়ে। থাকে লেক গার্ডেনস-এ। একদিন তার বাবা আর দিদিকে নিয়ে লেখকের কাছে এসে হাজির। আমার সঙ্গে যারা দেখা করেন সাধারণত তাদের কোন প্রশ্ন করিনা। চোখ বুজে যে ছবি দেখি সেই ছবি হিসেবে তাদের বলে দিই। মেয়েটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেই চোখ বুজলুম অমনি—এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চমকে উঠলুম। পাহাড়ি একটা দেশ। একটি গাছের ডালে একটি ভাঙা প্লেনের টুকরো। রোমশ কৃষ্ণকায় সুস্থ একটি যুবক। কিসের উপর পায়ের চাপ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আছে। একটু নিচেই একটি ঝিলের ছবি দেখা যাচ্ছে। সেকথা জিজ্ঞেস করতেই ওরা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলুম, ছেলেটি কে?

ওর বাবা বললেন, ওর স্বামী।

—প্লেন ক্রাশে পড়েছিল?

—হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে শিলং-য়ের কাছে যে প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছে আপনি সেই দৃশ্য দেখছেন। ওর স্বামীই প্লেন চালাচ্ছিল।

এত কাঁচ মেয়েটি যে, সত্যি বড় ব্যথা পেলুম। দেখলুম একটি বাচ্চা ছেলেও আছে। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে ওরা স্বীকার করল। মেয়েটির নাম সুস্মিতা বোস রায়চৌধুরী। স্বামীর নাম ক্যাপটেন ৺দেবাশিস বোস রায়চৌধুরী। কৌতূহল বশতঃ ওদের কাছ থেকে ছবি চেয়ে নিয়ে ছিলুম আমার সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে তা মেলে কি না দেখার জন্য। সত্যি সত্যি আশ্চর্য ভাবে তা মিলে গিয়েছিল মানে দেবাশিসের চেহারার সঙ্গে।

এরকম কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে হয়! মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন আমার এমন এক বন্ধু (নাম করছি না—ইচ্ছাকৃত ভাবে) একদিন এলেন অল্প বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটি গভর্নমেন্ট কলেজের এক অধ্যাপিকা। আমার বন্ধুটি বললেন, নিগূঢ়দা, ওর বিয়ে-সম্পর্কে কিছু বলুন।

চোখ বুজে দেখি ও বিবাহিতা! কিন্তু বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই স্বামী মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে। সে কথা বলতে মেয়েটি অবাক। সে বলল এ ধরনের কথা শুনেছি। কিন্তু এ ধরনের লোক যে সত্যিই আছে এই দেখলুম। কি করে আপনি বলতে পারলেন? বললুম, এর জবাব আমার দিব্যজগৎ ও দৈবী-ভাষা বই পড়লেই জানবে। এখানে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার একটা কিছু নেই। সবই বৈজ্ঞানিক। আর কিছু দিনের মধ্যে কমপিউটারাইজড টি. ভি তে-মৃতের আত্মাদের চলাফেরা করতে দেখা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে আমার বন্ধুটি আমাকে ঠাট্টা করে তোমার বিয়ের কথা জানতে চেয়েছেন। বলি শোন, আবার তোমার বিয়ে হবে!

মেয়েটি বলল, আর আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু বিয়ে তোমার হবেই।

মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার বিবাহের একটি দিন বলে দিয়েছিলুম। সম্ভবতঃ বর্ণনা দিয়েই। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তার বিয়ে হয়েছে।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই বিঙ্কু বলে একটি ছেলে থাকে। খুব ভাল অবস্থা। সুখী পরিবার। হঠাৎ এক মধ্যরাতে ওর বাবা মারা গেলেন হার্ট ফেল করে। তাঁর যে হার্টে কোন রকম অসুখ ছিল কেউ জানতই না। খুবই মর্মন্তুদ ঘটনা সন্দেহ নেই। বেশ কিছু দিন পরে হঠাৎ বিঙ্কু জানতে পারল যে, আমি মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার অবস্থান বলতে পারি! তাই একদিন এসে জিজ্ঞেস করল—জেঠু দেখ না বাবা কোথায় আছেন? আমাদের কিছু বলছেন কিনা?

অদ্ভুতভাবে এক জবাব পেলাম। কোন বায়োপ্লাজমিক বডি নয়, কোন আকৃতি নয়, কে যেন হঠাৎ একটা বেহালার মত জিনিস তুলে—নিচের দিকে দেখিয়ে দিল—ফেটে গেছে।

বিঙ্কুকে বললুম, তুই কি বেহালা বা ঐ জাতীয় কিছু বাজাস?

—হ্যাঁ, কেন?

—দেখে আয়তো, বাজনাটার নিচের দিকে কাঠ ফেটে গেছে কিনা। এক্ষুনি মেরামত করা দরকার।

মুহূর্তের মধ্যে বিঙ্কু বাড়ি গিয়ে বেহালাটা পরীক্ষা করে এসে বলল, তুমি সত্যি বলেছ জেঠু।

মৃত আত্মার এমন অদ্ভুত নির্দেশ—সত্যি আমি আগে কখনও পাইনি।

এমনতর অভিজ্ঞতা কত যে হয়! কুচবিহারের একটি মেয়ে। থাকে পার্ক-সার্কাসে। চাকুরী করে। আমার বই পড়ে একদিন দেখা করতে এল। বলল, আমার বাবার কথা বলুন। চোখ বুজতেই দেখি সৌখিন সুন্দর এক পুরুষ। চিবুকের পাশে একটা তিলও আছে। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জনৈক রিক্সাওয়ালাও এর সঙ্গে যুক্ত। বললুম, তোমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। সম্পত্তি ও টাকা পয়সা নিয়ে ব্যাপার। তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে বাঁ দিকের পেছনের ঘরে এ সম্পর্কিত একটি দলিল আছে। সেটা খুঁজে বের করে কাছে রাখ। তোমার ভাই আছে দেখছি। তাকে ভয় পেতে বারণ কোরো—কারণ সূক্ষ্মদেহ তার আশে পাশে থাকে। কাঁধে অনেক সময় অদৃশ্য হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে যাবে। ভয় পেতে বারণ কোরো। তবে তোমার বাবা আবার জন্ম নেবেন। তোমারই ঘরে। নবজাতকের চিবুকের তিল দেখেই বুঝতে পারবে। মুখের আদলও অনেকটা ঐরকম হবে

মেয়েটি সন্তান প্রসব করেছে। আর একটু বড় না হলে বোঝা যাবে না তার দাদুর মত হবে কিনা। সুতরাং শেষের কথা কয়টি মিলবে কিনা জানিনা। তবে এটা জানা গেছে যে, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। একটি রিক্সাওয়ালা ঐ অঞ্চল থেকে পলাতক। ওর ছোট ভাই সত্যিসত্যি কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে ভয় পাচ্ছিল।

বহু লোকের সূক্ষ্মাত্মা আমি দর্শন করেছি। অপরকেও করিয়েছি। তবে সর্বক্ষেত্রেই যে বলতে পেরেছি তাও নয়। আমার যে তত্ত্ব, তাতে আত্মা যদি নব জন্মও নেয়, তবু পরমাত্মার বুকে তার এ জীবনের লীলা, পূর্ব জন্মের লীলা সবই অঙ্কিত হয়ে থাকে। তাকে অন্তত দেখা যায়, চেনা যায়। এমন কি ভগবান শ্রীচৈতন্যের সূক্ষ্ম সত্তাও বিন্দুর মধ্যে আমার নজরে পড়েছে। দেব দেবীদের তো দেখেছিই। তাঁদের দুটো রূপ আছে—একটি আমাদের কল্পনা জাতরূপ যা—পরমাত্মার বুকে আমাদের ইচ্ছাতরঙ্গের প্রভাবে রূপ ধরে আছে, আরেকটি ভিন্ন গ্রহে তাঁর স্থূল দেহসত্তা। এই উভয়তঃ রূপই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। প্রচলিত ৺কালী মূর্তিকে দেশের বুকে চলন্ত ভঙ্গীতে দেখেছি—আবার অন্য কোন বিশ্বের ভিন্ন গ্রহে তাকে রক্তমাংসের রূপেও প্রত্যক্ষ করেছি।

যোগে একদিন সত্যি সত্যি অবাক হয়েছিলুম পরমাত্মায় অতীতের চিত্র হিসেবে সিনেমায় ছবির মত আঁকা—কিন্তু স্থির চিত্র নয়, চলমান চিত্র হিসেবে একটি প্রাণীকে নড়তে দেখে। লাল নেংটিপরা বালকৃষ্ণ নাড়ুগোপালের ভঙ্গীতে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল এ আমার মানস প্রতিফলন না ভ্রান্তি দর্শন! মাস কয়েক আগে তার যথার্থ অস্তিত্বের ও ক্ষমতার পরিচয় পাই। যথার্থই এক বিদুষী মহিলা আসেন আমার কাছে। বড় পোস্টে কাজ করেন—ডিরেক্টর র‍্যাঙ্ক। একটা সমস্যায় পড়ে এসেছিলেন আমার কাছে—যদি কোন প্রতিকার

আমি করে দিতে পারি। প্রতিকার খুঁজতে যেই চোখ বুজেছি—দেখি তাঁর শো-কেসে পেতলের ঢালাই করা বালকৃষ্ণ। বুঝতে পারলুম এই বালকৃষ্ণের পুজো করলেই ভদ্রমহিলার সমসা মিটবে। ভদ্রমহিলাকে বললুম,—আপনার শো-কেসে একটি পেতলের ঢালাই নাড়ুগোপালের মূর্তি আছে?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ।

—কাল থেকে তাঁর পুজো দিয়ে আগামী শনিবার জানাবেন। ভদ্রমহিলা আমার নির্দেশ মত কাজ করে পরের শনিবার এলেন। দুদিনের মধ্যেই অদ্ভুত ভাবে তাঁর অত্যন্ত জটিল সমস্যাটি মিটে গেছে—যা মেটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

এরকম আরও একটি অদ্ভুত ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আলিপুর কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি তিমির ব্যানার্জির ছেলের উপনয়নে গেছি। তিনি জানালেন তাঁর এক বাল্যবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ। আমি যদি একটু দেখে আসি। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন। লিভার সিরোসিস।

চোখ বুজেই বুঝেছিলুম, বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু গেলুম। ভদ্রলোকের স্ত্রী চোখের জল ফেলে অনুরোধ করলেন—আমার স্বামীকে বাঁচান।

মৃত্যুর উপর মানুষের হাত নেই। কি করা যায়—চোখ বুজে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ দেখি যোগাসনে বসা শিবমূর্তি ভেসে উঠেছে। বুঝলুম, ঈশ্বরের হয়তো এটাই ইঙ্গিত যে, শিব পুজো করলে তিনি বেঁচে যাবেন। বললুম,—আপনার ঘরে শিবমূর্তি আছে?

মহিলাটি বললেন, না, আমার স্বামী মূর্তি পুজো পছন্দ করেন না।

—তবু দেখুন না—শো-কেসটি খুঁজে?

—নেই।

—দেখুনই না।

অবশেষে ভদ্রমহিলা উঠলেন। সত্যি সত্যি শো-কেসে চীনামাটির যোগাসনে বসা শিব মূর্তি পাওয়া গেল। এতে যেন ভদ্রমহিলার চোখে অদ্ভুত একটা আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। এ যেন প্রায় অসম্ভব যে, তাঁর ঘরে শিব মূর্তি পাওয়া যাবে। বললুম, রোজ তিনটি বেলপাতা আর একটি শাদা ফুল দিয়ে পুজো দেবেন।

আমার নির্দেশ মহিলাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতে তাঁর স্বামী অবিশ্বাস্য ভাবে ভাল হয়ে ওঠেন। এরপর প্রায় কুড়ি বছর বেঁচে থেকে হিল্লীদিল্লি ঘুরে চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন। অল্প কিছুদিন আগে সেই লিভার সিরোসিসেই তিনি মারা যান। ত্রিমাত্রিক জগতে থেকে এর কোন লজিক্যাল এক্সপ্লানেশন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ-সব বুঝতে হলে বহুমাত্রিক জগতের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

আমার অন্ততঃ কোন অবিশ্বাস নেই—পরলোকে আত্মার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব

সম্পর্কে। অকাল্ট ফ্যাকাল্টি সম্পর্কেও আমার কোন দ্বিধা নেই। হয়তো মানুষের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সবটাই সত্য হয় না। তাই বলে এ জগৎটা যে মিথ্যে তা নয়। ডাক্তারী শাস্ত্রটা তো মিথ্যে নয়। তাই বলে রোগ ধরতে পেরেও ডাক্তার কি আর সব রুগীকেই ভাল করতে পারেন? পারেন না। এর কৈফিয়ৎ কি? বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ গ্রোড্ডেক চল্লিশ বছর চিকিৎসা জগতের বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, অদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় একটা সত্তা আছে সকলেরই মধ্যে। তার মর্জিতেই ভাল মন্দ সব কিছু হয়। সেই দুর্জ্ঞেয় সত্তার হদিশ পাওয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধিতে অসম্ভব।

তবুও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারবুদ্ধির মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে ধরা না পড়লে মানুষ কোন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। বিজ্ঞান কি সত্যি সত্যি এই অতীন্দ্রিয় জগতের হদিশ করতে পেরেছে?

একটা বইয়ের নাম মনে পড়ে যাচ্ছে—'Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain লেখক—Sheila Ostrander and Lynn Schroeder এর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন Ivan T. Sanderson. গ্রন্থটিতে এমনই একটি দেশের অধি-পদার্থিক জগৎ চর্চা করে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের রেকর্ড রয়েছে—যে দেশ বস্তুতান্ত্রিকতার উপর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করতে চায়নি—অর্থাৎ প্রাক্তন U S S R মানুষের সূক্ষ্মদেহ, আত্মা, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম নাম করা যেতে পারে—Dr. Sergeyev-এর।

Sergeyev—ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যু হবার পর মৃতদেহ থেকে সামান্য একটু দূরে ডিটেক্টর যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেন—স্থূল দেহের বাইরে কিছু থাকে কি—না। কিন্তু প্রাণের অস্তিত্বের কোন রকম সাড়াই তিনি পান না। মস্তিষ্ক তরঙ্গ, হৃদস্পন্দন কোন কিছুই সাড়া দেয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে ডিটেক্টরটিকে মৃতদেহ থেকে চারগজ দূরে স্থাপন করা হয় তক্ষুনি তা এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বৈদ্যুতিক শক্তিক্ষেত্রের জন্য স্পন্দন শুরু করে দেয়। মনে হতে থাকে কোথা থেকে এক ধরনের তেজ বেরিয়ে আসছে।

এই যে ফোর্স ফিল্ড বা শক্তিক্ষেত্র, এর উপর আমাদের গ্রহের প্রচণ্ড রকম প্রভাব রয়েছে। এই ফিল্ডকেই অধিমনোবিজ্ঞানে সাধারণত বলে Astral Body. বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে Energy Body, Subtle Body, Etheric Body, Fluidic Body, Beta Body, Counterpart Body, Pre-physical Body ইত্যাদি। বহু অধিমনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, দেহের চতুর্দিকে এই যে ফোর্সফিল্ড, এই ফোর্স ফিল্ড দিয়েই মানুষের দেহ গঠিত। স্পন্দমান এই ফোর্সফিল্ডের স্পন্দনের মাত্রা অর্থাৎ frequency of vibration যদি বাড়ানো যায় · তাহলে ঊর্ধ্বমাত্রার স্পন্দন বা খবরাখবর আমাদের মধ্যে এসে যেতে পারে।

মানুষের দেহের চতুর্দিকে এই ফোর্স ফিল্ডই এক ধরনের অদৃশ্য আবরণ সৃষ্টি করে থাকে। যে তেজপুঞ্জ আমাদের এই দেহ ঘিরে থাকে তা হল এক ধরনের ইলেকট্রনিক সাঁচ বা উপাদান। এইজন্য একে Force Field বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডও বলে। কখনও কখনও বা একে বায়োলজিকাল ফিল্ড বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে আবার একে বলে বায়োপ্লাজমিক বডি। খালি চোখে একে দেখা না যাবার কারণ, এর যে তরঙ্গ তা এত ছোট যে আলোর তরঙ্গের অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর।

এই যে শক্তিবলয়, কিরলিয়ান ফটোগ্রাফীতে দেখা গেছে জীবন্ত পত্রের চতুর্দিকে তা অত্যন্ত তেজসম্পন্ন! ম্রিয়মান পত্রে কম শক্তিস্পন্দন, মৃত পত্রের চতুর্দিকে এর কোন শক্তিই নেই।

ভ্যালেনটিনা নামে এক সোভিয়েত মহিলার আঙ্গুলের ডগা কিলিয়ান ফটো গ্রাফীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে—তা যেন আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণের বর্ণময় শক্তি বিচ্ছুরিত করছে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, মানুষের দেহের চতুর্দিকস্থ এই বলয় স্থূল দেহ অপেক্ষা অনেক বড়। দেহের চতুর্দিকে যে জ্যোতির্ময় আভা থাকে তা হল এই দ্বিতীয় দেহ অর্থাৎ বায়োপ্লাজমিক দেহের প্রান্তরেখা।

দেহের কোন অংশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বায়োপ্লাজমিক বডিতে কিন্তু সেই অংশের শাক্তিক অংশটি অর্থাৎ বায়োপ্লাজমিক অংশটি থেকে যায়। ফলে কোন ফটো তোলা হলে বিকৃত দেহের ফটো না উঠে কিরলিয়ান ফটোতে সবটা দেহের সূক্ষ্ম ছবিই ওঠে। এই যে ইথারিক বা বায়োপ্লাজমিক দেহ তাই হল মানসসত্তা ও দেহকোষের মধ্যে সংযোগ-সূত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, দেহের এই যে দ্বিতীয় সূক্ষ্ম অবস্থা তা হল এক ধরনের মৌলিক প্লাজমা জাতীয় সন্নিবেশ যা নাকি আয়নীভূত উত্তপ্ত ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্যান্য অবঅণু দিয়ে গঠিত।

দেহের যে দীপ্তি, যা কিরলিয়ান ছবিতে ধরা পড়েছে, তা দেহের কোন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ফলে ধরা পড়েনি—ধরা পড়েছে দেহের চতুর্দিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেঘ সদৃশ বায়োপ্লাজমার জন্য।

মানুষের মৃত্যু হলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, এই বায়োপ্লাজমিক দেহটি স্থূল মৃত দেহকে ত্যাগ করে চলে যায়। এই বায়োপ্লাজমিক দেহ স্থূলদেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকে। মৃত্যু হলে মানুষের মানস সত্তা স্থূল দেহের বন্ধন ত্যাগ করে এই বায়োপ্লাজমিক দেহে আশ্রয় নিয়ে থাকে।

চৈনিক বিশ্বাস এই যে,—মানুষের দেহের দু'ধরনের শক্তি আছে—(১) প্রাণশক্তি ও (২) বৈদ্যুতিক শক্তি। প্রাণ শক্তিতে বৈদ্যুতিক চরিত্র নেই, কিন্তু তার ভাবধারা বৈদ্যুতিক চরিত্রের মতই। বৈদ্যুতিক শক্তির মতই এর মেরু-প্রান্তিক অবস্থা আছে—অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক। এই জন্যই কি কির-

র্লিয়ান ছবিতে নীল থেকে রক্তিমাভ, হলুদাভ প্রভৃতি রঙ লক্ষ করা যায়? অনেক বিজ্ঞানীর মনে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে। মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে দেহের অন্যান্য জৈব কোষ বা এককের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক থাকে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে—ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মাথায় চর্মাচ্ছাদনের নিচে এমন একটি বিন্দুপ্রমাণ ক্ষেত্র আছে যেখান থেকে প্রাণশক্তি হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটে যায়। অঙ্গুষ্ঠাগ্রের এই পয়েণ্টগুলি থেকে বিচিত্র ধরনের রঙের স্ফুরণ ঘটে —যা নাকি কিরলিয়ান ফটোগ্রাফীতে ধরা পড়েছে।

যাদের দেহের শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি হেতু সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়েছে তারা এই বর্ণবলয় তৃতীয় নেত্রে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এই ধরনের দৃষ্টিশক্তি যাদের আছে, এমন চিকিৎসকেরা—রোগ বাইরে প্রকাশিত হবার আগেই ধরে ফেলেন এবং চিকিৎসা করেন। যাদের এ দৃষ্টি নেই তারা রোগ ফুটে ওঠার পর এর চিকিৎসা করেন। স্বর্গত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের এই দিব্যদৃষ্টি ছিল—যে জন্য চিকিৎসা জগতে তিনি অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করে গেছেন।

চৈনিক আকুপাংচার বিশারদরা মনে করেন যে, দেহের প্রাণশক্তি মানুষকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একসূত্রে জড়িত করে রেখেছে। মহাবিশ্বের কোথাও যদি সেই জন্য কোন পরিবর্তন হয় তক্ষুনি তার তরঙ্গাঘাত দেহের প্রাণশক্তিকে আলোড়িত করে। ফলে দেহের উপর তার প্রভাব পড়ে। নানা জিনিস দ্বারাই দেহের প্রাণশক্তি প্রভাবিত হতে পারে। ঋতু পরিবর্তন, চন্দ্রের কলায় কলায় পরিক্রমা, জোয়ার, ভাটা, বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড়, প্রবল বাতাস এবং শব্দ-তরঙ্গের উচ্চ বা নিম্নগ্রাম সবই দেহের উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং মানুষ একক কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জীব নয়। 'মানুষ' পরিবেশের মধ্যে মানুষ, বিশ্ব জগতের মধ্যে মানুষ। বিশ্বনিখিলের নাড়িতে নিকটতম সম্পর্কে সে যুক্ত।

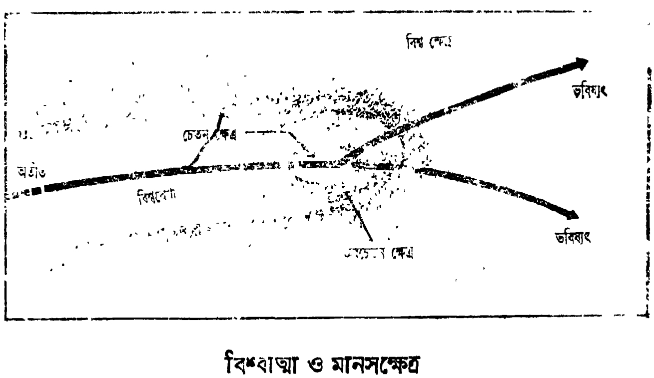
মানুষ যে টেলিপ্যাথি দ্বারা বহু দূরের জিনিসকে দেখতে পায়, দূরশ্রবণের অধিকারী হয়, সেই টেলিপ্যাথি-তরঙ্গ গ্রহণ করে মানুষের বায়োপ্লাজমিক দেহ। তার স্থূল দেহ নয়।

মানুষের যে আত্মিক শক্তি তা কাজ করে কয়েকটি বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের মাধ্যমে। যেমন, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড, পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি। কোন গ্ল্যাণ্ড যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, আকুপাংচার করে সেই গ্ল্যাণ্ডকে আবার শক্তিশালী করা যায়।

উদ্ভিদ জগতে লক্ষ করলে দেখা যায় তাদের দেহ থেকে আলো বিকিরিত হচ্ছে। এই আলো যেন তাদের দেহকে অঙ্গবস্ত্রের মত আচ্ছাদিত করে রাখে। বিভিন্ন উদ্ভিদের গঠনশৈলী ও জেনেটিক প্যাটার্ন অনুযায়ী তাদের দেহের উপর বর্ণবলয় ভিন্ন প্রকার। এই যে বর্ণবলয় বা উদ্ভিদের বায়োপ্লাজমিক বডি মানুষের বায়োপ্লাজমিক বডির সঙ্গে তার ফারাক অতি সামান্যই। উদ্ভিদের মধ্যেও চিৎশক্তি আছে, মনন শক্তি আছে। উদ্ভিজ্জ বায়োপ্লাজমিক বডি তাদের চারপাশের মানুষের চিন্তাতরঙ্গ ধরতে পারে। এমন কি বিশ্বতরঙ্গও তার সূক্ষ্ম

দেহে রীতিমত সাড়া তোলে।

উদ্ভিদ ও মানুষ, উভয়েরই এই যে সূক্ষ্ম বায়োপ্লাজমিক দেহ তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার সরাসরি যোগ আছে। এই সরাসরি যোগ আছে তাদের বায়োপ্লাজমিক দেহগঠনশৈলীর সঙ্গে বিশ্বাত্মার যোগ থাকার জন্য। এই সূক্ষ্ম দেহগুলিই মানসশক্তির আধার। এটাই বায়োপ্লাজমিক পর্যায়ে মন, সূক্ষ্মস্তরে অবচেতন মন এবং আরও সূক্ষ্মস্তরে অচেতন মন বা সর্বনিখিলবৈশ্বিক মন, যেখানে সময় ও দেশ সবই স্তব্ধ, অচল অথচ চিৎসত্তাময়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হেরমান্ মিনকোভ্স্কি একে 'ব্লক ইউনিভার্স' বা স্থির ইউনিভার্স' নামে আখ্যা দিয়েছেন। চেতন মন যে অবচেতন মন অপেক্ষা দুর্বল—অর্থাৎ বিশ্বমানস থেকে বেশ কিছু দূরে থাকে, দেহতত্ত্ববিদ H. F Saltmarsh এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাই, তাঁর মতে চেতন মনের কাছে যা ভবিষ্যৎ, অবচেতন মনের কাছে তা বর্তমান হতে পারে। মানুষ ও উদ্ভিদের বায়োপ্লাজমিক বডির যোগ হলে উভয়ের মধ্যে ভাবতরঙ্গের বিনিময় হয়। উদ্ভিদ মানুষকে বুঝতে পারে, মানুষ উদ্ভিদকে বুঝতে পারে। উভয়ের এই এনার্জি-বডি যদি সূক্ষ্মতর হয় তাহলে উভয়েই বিশ্বমানসসত্তায় একীভূত হয়ে আপাত পার্থক্যের রেখা সরিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে অভেদাত্মতা অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন মানসসত্তার ছবি এঁকে দেখালে ছবিটি যা দাঁড়াবে—সেই চিত্রকল্পটি মনের উপর ভেসে উঠতে লাগল :



বিশ্বাত্মা ও মানসক্ষেত্র

আত্মা যেমন এই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর দেহ, তেমনই তা এক ধরনের বৃত্তি-প্রবাহও। সেখানে নির্ভেজাল শক্তির বৃত্তিপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই পর্যন্তই মানুষ নিজের আত্মিক ক্ষেত্রকে অর্থাৎ energy field-কে প্রসারিত করে দিয়ে ধরতে পারে। মানসসত্তার যদি অচেতন স্তরে অবতরণ অর্থাৎ উত্তরণ ঘটে তখন সেই অচেতন স্তর (Block Universe, Static Universe) থেকে কোন রকম সাড়া পাওয়া যায় না। স্বাতন্ত্রিক আত্মসত্তার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

মৃত্যুর পর এই সব আত্মার তখন আর কোন হদিশ পাওয়া যায় না। ফলে ওইজা বোর্ড বা প্ল্যানচেট-এ এদের ধরা যায় না। মনও সে রাজ্যে গিয়ে কোন খবর নিয়ে ফিরে আসতে পারে না।

এনার্জি-ফিল্ডের উৎসরণ ঘটে কিন্তু স্থূল দেহে। ফলে দেহের এই শক্তি (প্রাণ) যাতে বাইরে যেতে না পারে সেই কারণে ডাইনী বিদ্যাবিশারদেরা দেহে কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করে। অপরপক্ষে কৃষ্ণবস্ত্র বাইরের শক্তি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে বলে তাদের ধারণা। মহাবৈশ্বিক শক্তিকে তারা ব্যক্তিদেহের কাছে ধরে আনে। সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই যে মৃতের জন্য শোকপ্রকাশের উদ্দেশে কালো পোশাক পরা হয়—তার উদ্দেশ্যেও এই যে, নিজেদের দেহের প্রাণশক্তিকে মৃতের আত্মা টেনে যেন বাইরে নিয়ে যেতে না পারে। অপর পক্ষে তার (প্রয়াত ব্যক্তির) প্রাণ-শক্তিও যেন তাদের কাছেই থেকে যায়। কারণ, কালো রঙ হল গ্রাহক—absorver. হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা ঠিক ভিন্নতর। তারা দেহে শাদা কাপড় পরে। এর কারণ শাদা রঙ হল প্রতিরোধক। তারা মৃতের আত্মা যেন দেহে প্রবেশ করে কোন ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য শাদা পোশাক পরে। অপর পক্ষে এই সাদা পোশাক দেহের প্রাণশক্তিকেও বাইরে যেতে দেয় না। বাইরের তাপ যাতে দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে এই জন্য আরব জগতের লোকেরা মরুভূমির তাপ এড়াবার জন্য শাদা গাত্রাবরণ ব্যবহার করে।

দেহের আবরণ স্বরূপ এই যে বায়োপ্লাজমিক-বডি বা এনার্জি-বডি, সেই বডিই মানসস্তরে বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা তৈরি করে। বৈজ্ঞানিকেরা এর নামকরণ করেছেন Psychotronic Energy,

আধুনিক মহাশিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষ ভোগবাদে এত আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে -এই সূক্ষ্মসত্তা সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা করারই তার অবকাশ নেই। ফলে, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম দেহ থেকে সে দূরে সরে গিয়ে বিশ্বাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এবং এই স্থূল দেহটাকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নিয়ে এর মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হয়ে আছে। একটি উচ্চমাত্রিক অবস্থা থেকে যে তার স্থূল দেহের উপাদানগুলি গঠিত একথা সে ভাবতেও পারে না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিদ চার্লস এ. মিউজেস (Chsrles. A. Muses) মনে করেন, জগতে যত বস্তু, জীব, সবই বিভিন্ন শক্তিতরঙ্গের যোগাযোগের ফলে।

এই যে তরঙ্গ—এই তরঙ্গের স্বরূপ প্রাচীন মানুষ জানত। উর্ধ্বমাত্রিক এই তরঙ্গের সঙ্গে সেই জন্য প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের যোগাযোগ প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। চেকোস্লোভাকিয়ার পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, মিশরের পিরামিডের কল্পনা এসেছিল মহাবিশ্বজাগতিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। এই জন্য প্রাচীন মিশরীয়েরা স্থাপত্যশিল্পের উপর বেশী জোর

দিয়েছিল। তারা মনে করত যে, অনন্তের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থাপত্যই হল যথার্থ আদর্শ। স্থাপত্য অনেক বেশী স্থায়ীও। এক্ষেত্রে রচনাশৈলীর স্থান অনেক পেছনে।

মানুষ এবং প্রাণীজগতের সবাই যে এক ধরনের শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন—আধুনিক বিজ্ঞান-মানস অংপাদিন হল এই সত্য আবিষ্কার করেছে। এই শক্তিকে এরা বলছে বায়ো-এনার্জি। এখন বলা হয় সাইকোট্রোনিক এনার্জি। মানুষের আত্মিকশক্তির পেছনে এই সাইকোট্রোনিক এনার্জিই বেশী ক্রিয়াশীল। প্রাণশক্তিকে যদি সাইকোট্রোনিক জেনারেটর দিয়ে আকর্ষণ করা যায় তাহলে তা আত্মিকশক্তির অনেকটা কাজই করে দিতে পারে।

সাধারণ জীবনী-শক্তিকে বলা হয় প্রাণশক্তি বা ভাইটাল এনার্জি। এর তীব্রতা যদি বৃদ্ধি করা যায় তখনই হয় ইলেট্রিক এনার্জি। এই যে ভাইটাল এনার্জি ইদানীং কালে অনেক বৈজ্ঞানিক একে X-force নামে আখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাইটাল এনার্জি দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই জন্যই জৈবদেহের ভাইটাল এনার্জি মহাবৈশ্বিক ভাইটাল এনার্জির সঙ্গে যুক্ত।

যুগে যুগে মনীষী ব্যক্তিরা যে ভাবে এই ভাইটাল এনার্জিকে দেখেছেন সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ঃ—

আবিষ্কার	X-force-এর নাম
১. প্রাচীন চৈনিক—	ভাইটাল এনার্জি
২. প্রাচীন হিন্দু—	প্রাণ
৩. প্রাচীন পলিনেশীয় হূণ	মনা
নবজাগরণের যুগ	
১। প্যারাসেলসাস	মুনিস।
২। ফন হেলমণ্ট	ম্যাগনেল ম্যাগনাম
অষ্টাদশ—বিংশ—শতাব্দী	
১। মেসমার	অ্যানিমাল ম্যাগনেটিজম
২। রাইচেনব্যাচ (Reichenbach)	ওডিক ফোর্স
৩। কীলি (Keely)	মোটর ফোর্স
৪। ব্লণ্ডলট (Blondlot)	এন্. রেজ (N. Rays)
৫। এল. ই. ঈম্যান (L. E. Eeman)	(এক্স ফোর্স X-force)
৬। আধুনিক ঔষধ	সাইকোসোমাটিক (?)
সদ্য বিগত সাম্যবাদী জগৎ	
১। সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিক	বায়োপ্লাজমিক এনার্জি
২। চেক বৈজ্ঞানিক	সাইকোট্রোনিক এনার্জি

মানুষের দৈহিক আচরণ হিসাবে এই যে দ্বিতীয় সত্তা এই সত্তাকেই অনেকে মনে করেন সূক্ষ্মদেহ বা জীবাত্মা। যোগিরা এই জীবাত্মাকে ধ্যাননেত্রে দেখতে

পেলেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে একে মানুষের চোখের উপর তুলে ধরতে পারেন নি। তাই এতদিন পর্যন্ত মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র জীবাত্মিক অস্তিত্বের কথা বস্তুবাদীদের কাছে হাস্যকর একটা ব্যাপার হয়েই ছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ চমকে দেয় বস্তুবাদী একটি দেশেরই আবিষ্কার—যে দেশের নাম U. S. S. R. সে আবিষ্কারকের নাম কিরলিয়ান।

মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বের স্বরূপ ধরতে এসে যখন বস্তুবিজ্ঞানের মধ্যে এর সন্ধান পাবার চেষ্টা করি তখনই কিলিয়ান ফটোগ্রাফির ইতিহাস আমি পেয়ে যাই।

জীবের সূক্ষ্মসত্তা অকস্মাৎই ধরা পড়ে যায়। ১৯৩৯ সালে জনৈক রুশ ইঞ্জিনিয়ার Semyon Kirlian একটি ইলেকট্রো-থেরাপি মেসিন সারাই করছিলেন। সারাই করছিলেন ইউক্রেনের একটি শহর Krasnodar-এ নিজের লেবরেটারিতে। ভুলক্রমে হাতটি জীবন্ত ইলেকট্রোড-এর খুব কাছাকাছি চলে যায়। এতে যে শক্ লাগে তাতে দেখা যায় ইলেকট্রিসিটি থেকে উজ্জ্বল এক আলোর ঝলক ঝিলিক মেরে ওঠে। Semyon-এর মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জমে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিদ্যুৎঝলকের পথে যদি একটি শক্তিকাতর কাগজটাগজ রাখা যায় তাতে কি ফল হবে? সেই হিসেবে একটি আলোকাতর কাগজের পেছনে হাত রেখে একটি ফিল্ম ডেভেলপ করে দেখেন যে, আঙুলের ডগা থেকে যেন আলোর ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে। খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করে তিনি বুঝতে পারেন যে, এই উৎসারিত আলোর ঝর্ণার এক একটি ধারাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তেজধারা দেখা যাচ্ছে। এতে রীতিমত চমকিত হয়ে তিনি এ বিষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা শুরু করেন। চল্লিশ বছর এ ব্যাপারে গবেষণা চালাবার পর শেষপর্যন্ত এই প্রমাণ তিনি পান যে, এই আলোর ঝলক দেহেরই একটি সূক্ষ্মসত্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি যন্ত্রে যে জৈব দেহ থেকে উৎসারিত তেজ বা আলোক-বলয় দেখতে পেয়েছিলেন কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই দিব্যদর্শী ও মরমিয়া সাধকেরা সেই আলোক-বলয়ের কথা বলে আসছিলেন যে, জৈবদেহের চতুষ্পার্শে একটা বর্ণবলয় আছে। এই দীপ্তিকে তারা বলতেন - জৈবদেহের দ্বিতীয় সত্তা। খালি চোখে বা খোলা চোখে এই দীপ্তির চারত্র কি ভাবে মরমিয়াদের চোখে ধরা পড়ে জানি না, কিন্তু যোগসাধনাবলে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে যে-কোন মানুষ সম্পর্কে চোখ বুজে চিন্তা করলে আমি তার দেহের চতুর্দিকে নানা বর্ণের এই বিচ্ছুরণ দেখতে পাই। আশ্চর্য! তা যে কাছাকাছি বসে থাকা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়—কলকাতায় বসে সুদূর আমেরিকায় বসে থাকা কোন ব্যক্তির দেহের আলোও আমি এমন ভাবেই লক্ষ্য করতে পারি। এমন কি মানুষের দেহের অভ্যন্তরের অংশগুলোও দেখতে পাই। একে X-Ray Eye, বা X-Ray মানস বলব, তা জানি না। কারণ

খোলা চোখে এ-সব আমি কিছুই দেখতে পাই না। এ-সব ঘটনা যে কি ভাবে ঘটে আমার 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। জানি না সে ব্যাখ্যা কতদূর গ্রাহ্য!

কিরলিয়ান ছবির বর্ণবলয়কে জৈবদেহের দ্বিতীয় সত্তা বলে অনেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করলেও এখনও এটা জানা যায়নি যে, কেন জৈবসত্তার চতুর্দিকে এই বর্ণবলয় ধরা পড়ে। তবে এক্ষেত্রে কিরলিয়ানকেই এই ধরনের ছবির পুরোধা বলে ভাবলে ভুল হবে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয় এক বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেস্‌লা USA-তে হাইভোল্টেজ ব্যবহার করে ফটো তুলে কিরলিয়ানের অনুরূপ ফলই পেয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক George de la Warr মানুষের দেহের চারদিকে সামান্য কিছু দূরে ক্ষীণ একটা 'ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক' ফোর্স' ফিল্ড' আবিষ্কার করেছিলেন। এই 'ফোর্স' ফিল্ড' কিছুটা জাফ্‌রি বা জালের মত ছড়িয়ে পড়ে। ভোল্টেজ-শীর্ষ উচ্চতায় প্রায় ৭০ মিলিভোল্টের মত। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানসিক ভাবের তারতম্যে এই ফিল্ডের স্পষ্টতার হেরফের হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে কিরলিয়ান-এর হাইভোল্টেজ ফটোগ্রাফী যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

আকস্মিক ঘটনা অনেক সময়ই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নতুন নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। কিরলিয়ানের ক্ষেত্রেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। যার ফলে ধরা পড়ে যে, কিরলিয়ান-ছবি দ্বারা রোগনির্ণয় করাও সম্ভব। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে তিনি তার নতুন এই ছবির কলাকৌশল দেখাবেন বলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের উপর যতবারই তিনি এই ফটো তোলার চেষ্টা করেন ততবারই ব্যর্থ হন। যন্ত্রে কোন ত্রুটি আছে কিনা তন্ন তন্ন করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন—নেই। অথচ যন্ত্রটা কাজ করছে না। বিরক্ত হয়ে তিনি স্ত্রী ভ্যালেনটিনাকে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াতে বলেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ভ্যালেনটিনার ছবি যথার্থই উঠেছে। কিন্তু তার ছবি কেন উঠছে না পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন যে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তার ফলে তার দেহের বর্ণবলয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে কিরলিয়ান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কিরলিয়ান-ছবিতে মানুষের রোগনির্ণয় করাও সম্ভব।

রাশিয়ার একটি বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্দ্রের প্রধান একবার কিরলিয়ানের ল্যাবরেটরিতে এলেন। এলেন একই সঙ্গে একটি গাছের দুটি টাট্‌কা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা করার সময় দেখা গেল দুটি পাতা থেকে একই ধরনের বর্ণবলয় আসছে না। একটি থেকে ক্ষীণ বর্ণবলয় আসছে। এই পার্থক্যের কারণ কি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে, একটি পাতা রোগাক্রান্ত হয়েছে। এতে এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয় যে, কিরলিয়ান-ছবিতে রোগ ধরা সম্ভব।

এর পর কিরলিয়ান আরও চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হন। একটি পাতা থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে ছবি তুলতে দেখা যায় বর্ণবলয় কিন্তু সবটা

পাতারই উঠে আসছে। এই ভৌতিক ঘটনার জন্য পাতাটির নাম দেন তিনি 'ভৌতিক পত্র' বা 'Phantom Leaf'. দিব্যদর্শীরা যে দাবি করতেন তাঁরা মানুষের ভৌতিক অঙ্গ দেখতে পান এতে যেন সেটা প্রমাণ হয়ে যায়।

অবশ্য এত সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হয়েও কিরলিয়ান-দম্পতি কিন্তু এই বর্ণবলয়কে দেহের দ্বিতীয় সত্তা বলতে রাজি হন না, যদিও অনেকে জৈবদেহের সূক্ষ্মসত্তা বলেই একে মনে করতে থাকেন। তবে ফটোর চোখে যত স্পষ্টই এই বর্ণবলয় ধরা পড়ুক না কেন দিব্যদর্শীরা বলতে থাকেন যে, তাঁরা যেমন স্পষ্ট ভাবে দেখেন এ ছবি তেমন স্পষ্ট নয়।

ঠিক এই সময় লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ ওয়ালটার কিল্‌নার লক্ষ্য করে দেখেন যে, একটা নীলরঙের ফাঁকে তিনি যদি তার রুগীদের দেখেন তবে দেখা যায় যে, তাদের দেহের উপর একটা অস্পষ্ট মেঘের বলয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সেই মেঘ-বলয় রুগীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর ভিন্নতর হচ্ছে। পরে কিল্‌নার নিজের দেহের শক্তিমাত্রা বৃদ্ধি করে অন্য কোন কৃত্রিম যন্ত্র ছাড়াই রুগীর দেহের উপর এই বলয় লক্ষ্য করার ক্ষমতা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের আওতার বাইরে পড়াতে সেটা তেমন বিচার্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি।

Alma Atta বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী নিয়ে দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালিয়ে Dr. Victor Inyushin এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জৈবদেহের চারদিকে যে আলোকবৃত্ত দেখা যায় তা আসলে biological plasma—দেহের বিদ্যুৎ শক্তির কোন ফল নয়। এই বায়োলজিক্যাল প্লাজমাকে তিনি দিব্যদর্শীদের আকাশী শরীর বা 'astral body'-এর সমকক্ষ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি জৈবদেহেরই শুধু স্থূল দেহই নেই যা নাকি অণু ও মলিকিউল দিয়ে গঠিত, একটি করে এনার্জি-বডি বা তেজকায়াও আছে। বর্তমানে তাঁর এই অনুমানের সপক্ষে যথেশ্ট প্রমাণও পাওয়া গেছে। জৈব দেহের চতুর্দিকস্থ এই তেজ-দেহের সঙ্গে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির যথেণ্টই মিল রয়েছে। তবে কিরলিয়ান ছবির পক্ষে বিপক্ষে যথেণ্টই তর্কবিতর্ক চলছে। ফলে স্থির সিদ্ধান্তেও আসা যাচ্ছে না। কিন্তু একথা সত্য যে, কিরলিয়ান—এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এক নতুন জগতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। তিনি মরমিয়া দিব্যদর্শনকে অনেকটাই বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন।

রুশ বৈজ্ঞানিকেরা যখন কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির সাহায্যে বায়োপ্লাজমা দ্বারা এনার্জি-বডি গঠনের কথা ঘোষণা করেন পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চাননি। এখনো যে এ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর পাওয়া গেছে তা নয়। একে সাধারণ এক দীপ্তি-বলয় ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয়নি। তবে এতে একটি লাভ হয়েছে এই যে, এই জ্যোতির্বলয়ের দীপ্তির তারতম্যের উপর মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার একটা হদিশ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

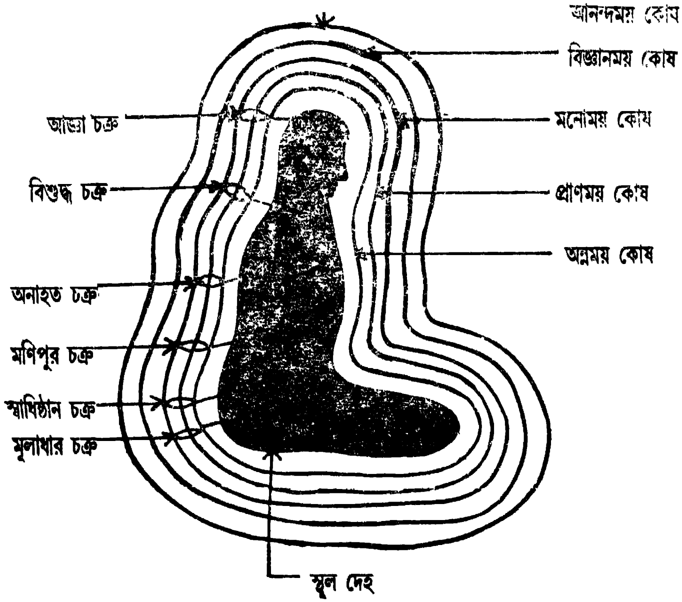
ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট একটা লাভ হয়েছে। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণগত মান সবকিছুই এই জ্যোতির্বলয়ের সাহায্যে বিচার করা সম্ভব হচ্ছে। রোগের চরিত্র কি, এই জ্যোতির্বলয় বিচার করে তাও জানা যাচ্ছে। ইঁদুরের উপর এই ফটোগ্রাফী প্রয়োগ করে নিউইয়র্কের রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ থেল্‌মা মস ও ডঃ মারগারেট আর্মস্ট্রং দেখেছেন যে, ক্যানসার আক্রান্ত ইঁদুর ও সাধারণ ইঁদুরের এই ফটো নেওয়া হলে বর্ণবলয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এই ফটো সবচেয়ে পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে হাত এবং পায়ের।

কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী নিয়ে এখনও চার ধরনের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যাচ্ছে। যেমন (১) যারা সন্দেহবাদী তাঁরা বলছেন এটা হল ব্যক্তি বা বিষয়, ফিল্ম ও মেসিনের মধ্যে যোগাযোগের স্বাভাবিক একটা ফল মাত্র। এই বর্ণবলয় থেকে নির্ভুল রোগনির্ণয় সম্ভব নয়। গবেষকের নিজস্ব অনুভবশক্তিই এখানে বেশী কার্যকর। (২) অধিমনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, দৈহিক অবস্থা কিরলিয়ান ফটোগ্রাফীতে কাজ করলেও এবিষয়ে আরও বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এই ফটোগ্রাফী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তখনই হবে যখন energy body, aura, bioplasmic body, প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যাবে। (৩) তৃতীয়ত এ-ব্যাপারে যারা অতি উৎসাহী তারা মনে করেন যে, জৈবদেহের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে এই বর্ণবলয় হল আত্মিক শক্তি। মরমিয়া ও দিব্যদর্শীরা একেই আত্মা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (৪) চতুর্থত একদল মনে করেন যে, এটা যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, এই ফটোগ্রাফী দৈহিক ও আত্মিক একটা অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে—তবু এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ভাবে না জেনে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।

এ ব্যাপারে যে-সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা হল এই যে, দেখতে হবে, দৈহিক অবস্থা যেন জ্যোতির্বলয়কে প্রভাবিত না করে। যাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে তাকে মানসিক দিক থেকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। সামান্য কৃত্রিমতাও এই জ্যোতিবলয়ের যথার্থ চরিত্র নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আকুপাংচার, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনই এই ফটোগ্রাফী নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করছে।

নানা ভাবে কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী কাজে এলেও এর জ্যোতির্বলয় নিয়ে এখনও দ্বিধা কাটে নি। একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি জৈবদেহেরই চতুর্দিকে একটা শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তবে এই শক্তিপ্রবাহ যে কি, আজও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। মনোস্তত্ত্ববিদেরা যাকে সূক্ষ্মদেহ বলেন তাকে তাঁরা স্থূলদেহ থেকে ভিন্ন একটি দেহ বলে মনে করেন। জৈবদেহের মানসিক অবস্থার উপর এর তারতম্য নির্ভর করে। প্রথম সূক্ষ্মদেহ যাকে etheric body বলে, প্রচলিত বিজ্ঞানের কাছে আজও তা অজ্ঞাত।

সাধারণ বিশ্বাস, এর মধ্যে নানা ধরনের প্রাণশক্তি রয়েছে। যাকে বলে আকাশী-দেহ (Astral Body) স্থূলদেহ এবং সেই আকাশী-দেহের মধ্যে এই প্রাণশক্তি এক ধরনের যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করে। এই আকাশী-দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মদেহ হল মানসিকদেহ। এই মানসদেহ অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মদেহ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে একেই কোষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয়দের মতে এই কোষ রয়েছে—পাঁচটি—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই কোষের সঙ্গে—দেহের এনার্জিলেবেল বা চক্রের (ষট্‌চক্র) নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।)



স্থূলদেহ, কোষ ও চক্র

অন্নময় কোষ থেকে মনোময় কোষকে এরা বলেছে সূক্ষ্মশরীর বা রহস্যময় শরীর। বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষকে বলেছে কারণ-শরীর।

এই যে সূক্ষ্মদেহ, এ যে কোন সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে গঠিত তা নয়, যা নাকি স্থূলদেহ ভেদ করে বাইরে প্রক্ষেপিত হয়। এই সূক্ষ্মদেহ যে ভিন্নস্তরে থাকে তাও নয়, (যদিও দিব্যদর্শীরা তাকে তেমন ভাবেই চিন্তা করেন) অথচ দেহ থাকাকালীন তার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত থাকে। একে জাগ্রত ও স্বাপ্নিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্থূলবৈশ্বিক দেশের মধ্যে

রয়েছে এমন না ভাবাই ভাল। মনোস্তত্ত্ব বিশারদ যখন সূক্ষ্মদেহ দর্শন করেন তখন স্থূলদেহের যথার্থ অবস্থা কোথায় একথা তিনি অনুমান করতে পারেন না। আবার স্থূলদৃষ্টিতে এই সূক্ষ্মদেহ দেখা যাবে এমন সম্ভাবনাও কম।

কিরলিয়ান ফটোর ছবিগুলির চরিত্র—যন্ত্র, যান্ত্রিক পরীক্ষণীয় বিষয়, তার মানসিকতা, নানা কিছুর উপর নির্ভর করে। এতগুলো শর্তসাপেক্ষে এই ছবির নির্ভুল চরিত্র উদ্ধার করা সত্যি সত্যিই একটা সমস্যার ব্যাপার। এই জন্য এর যাথার্থ নিয়ে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ রয়ে গেছে। এতে যে সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা যে যথার্থ কি, এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। যদিও মরমিয়া দিব্যদর্শী ব্যক্তি, যাঁরা নিজেদের দেহের এনার্জি-লেবেল অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর গতি ঊর্ধ্বমুখি করতে পারেন, তাদের কাছে এই ছবি সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। জৈবদেহে অনুরূপ আলোর বৃত্ত তাঁরা সত্যি সত্যি দেখতে পান—অন্ততঃ আমি অজস্র ক্ষেত্রে এর নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু এই আলোকবৃত্ত দেখার জন্য খোলাচোখ অর্থহীন- মস্তিষ্কের স্নায়ুতরঙ্গের বিশেষ একটি অবস্থাই এখানে বেশি কার্যকর।

আত্মিক এই শক্তির কথা বাদ দিয়ে সত্যি সত্যি যদি স্থূল দেহের কথাই ভাবা যায়—তা হলে দেখা যাবে যে, মানুষের দেহের চতুর্দিকে একটা 'ফোর্স ফিল্ড' রয়েছেই। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে এটা ভাবতেই হবে যে, মানুষের দেহ একটি electro-chemical-machine. একটা বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহ এর মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে। ফলে মানবদেহ weak magnetic ও ইলেট্রিক ফিল্ড দ্বারা আবৃত। দেহ ও পরিবেশের মধ্যে তাপমাত্রারও হেরফের আছে। ফলে চতুর্দিকে একটা তাপক্ষেত্র থাকেই। এই তাপক্ষেত্রই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে থার্মোগ্রাফীর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। মানুষের দেহ বায়ুর এক ক্ষেত্র দ্বারাও পরিবৃত। এ জন্য দায়ী তাপমাত্রার পার্থক্য। এ ছাড়া মানব দেহের চতুর্দিকে দেহনির্গত পার্টিকুলের জন্যও একটি 'পার্টিকুল ফিল্ড' তৈরী হয়। দেহ থেকে যে ঘর্ম নির্গত হয় তার মধ্যে থাকে নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান। এই ঘর্মের পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ভর করে শরীরী পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থার উপর। এ ছাড়া আছে মানসিক অবস্থা। কেউ যদি ড্রাগ নেয় তাতেও এই পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিরলিয়ান ফটোগ্রাফীতে দেহের চতুর্দিকে যে বর্ণবলয় দেখা যায় তাকে অনেকে বলেন জ্যোতির্নির্গমন (corona discharge)। বায়ু সাধারণত ভাল বিদ্যুৎরোধক। তবে যদি তড়িতাঙ্ক বেশী হয় এই নিরোধকবৃত্ত ভেঙে যেতে পারে। ফলে দেহের বায়ুবেষ্টনী ভেদ করে কিছু বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ অনবরত বাইরে আসতে পারে।

জ্যোতির্নির্গমন স্বল্প তড়িতাঙ্কেই হয়। এর মধ্যে সামান্য একটু বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহও থাকে। মাঝে মাঝেই এই স্বাভাবিক তাপমাত্রা তড়িতাহত হয়। এর ফলে কিরলিয়ান ছবিতে আলোকবৃত্ত ফুটে উঠে। তা ছাড়া যে যন্ত্রে এই

ছবি তোলা হয় এর প্রভাবও এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া পড়ে বিষয়ের চাপ, পারিপার্শ্বিক হাওয়ার প্রভাব প্রভৃতি। রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যের উপর রঙের বৈচিত্র্য নির্ভর করে। যেমন, সোডিয়ামের আধিক্যে হলে দেখা দেয় হলুদ রঙ, পারার আধিক্য হলে নীল-বেগুনী ইত্যাদি রঙ। দেহের চতুষ্পার্শ্বস্থ হাওয়ার মধ্যে বেশির ভাগই থাকে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন—ফলে দেখা দেয় নীল ও লোহিত বর্ণ। যদি আঙ্গুলের ডগায় ঘাম বেশী হয় তার কিরলিয়ান ছবি নেওয়া হলে হলুদ রঙও দেখা দিতে পারে। এর কারণ ঘামের মধ্যে থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ জাতীয় জিনিস। এ ছাড়া কিরলিয়ান ছবি তোলার যান্ত্রিক ব্যবস্থাও এই ছবির উপর প্রভাব ফেলে। ফলে এই ছবির জ্যোতির্বলয়কে আকাশীদেহ (astral body) বা দেহের সূক্ষ্মসত্তা বলা যায় না। কিন্তু এত সন্দেহ থাকা সত্বেও অনেক বিজ্ঞানীই প্রাচ্যের প্রাণশক্তির সঙ্গে কিরলিয়ান জ্যোতির্বলয়-এর প্রচণ্ড মিল খুঁজে পান। ফলে এবিষয়ে যে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে তা নয়।

তা হলে? তাহলে কিরলিয়ান ছবি নিয়ে কি করা যাবে? একে কি মানুষের সূক্ষ্মসত্তা বলে ধরে নেওয়া যাবে, বা যাবে না? কিরলিয়ান ছবির যাথার্থ নির্ণয় করতে হলে একই সঙ্গে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার, মনস্তত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও শারীরতত্ত্ববিদের সমবেত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন আছে। এছাড়া অধিমনোবিজ্ঞানীর সাহায্যেরও প্রয়োজন। উপরোক্ত সব কিছু প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়কে একত্রে সঙ্গে নিয়েই Leonard W. Konikiewizc আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্যানসিলভেনিয়াতে হ্যারিসবার্গের পলিক্লিনিক মেডিকাল সেন্টারে নিবিড় গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। তবে আমার ধারণা—, দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা যে বড় যন্ত্র—মানুষের জটিল গঠনশৈলীর দেহ, সেই দেহ-যন্ত্রে কুলকুণ্ডলিশক্তি জাগরিত করে এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা না করলে সত্যের হদিশ এরা কখনই পাবেন না। যোগসাধনা করলেই মানুষ দেখতে পাবে যে, astral body, আকাশী দেহ বা সূক্ষ্মদেহ কিংবা জীবাত্মা সত্যি আছে এবং মৃত্যুর সময় মানুষের অন্তস্থ চৌম্বকক্ষেত্র (inner space) দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ এই বায়োপ্লাজমিক বডিকে ধরে রাখতে পারে না এবং জীবাত্মা রূপে এই দেহই ভাসমান হয়ে উপরে উঠে যায়—উঠে যায় মানুষের বৃত্তিপ্রবাহকে সঙ্গে নিয়ে।

সূর্যের চোখে বোধহয় ক্লান্তি দেখা দিয়েছে। সারাদিন জাগ্রত প্রহরা দেখার পর এখন ঘুম ঘুম ভাব। তাই তার রক্তচক্ষুর অগ্নুদগীরণ বন্ধ হয়ে গেছে। কমলারঙের আমেজ লেগেছে রোদের গায়। আকাশের অনেকটা নিচে নেমে গেছে সে। ওপারে সার বাঁধা সুন্দরীবৃক্ষের অজস্র পাতায় পাতায় এখন যেন একটা নিশ্চুপ কানাকানি। আরণ্যক শ্বাপদদের বোধহয় সিগন্যাল

দিয়ে দিয়েছে, এবার বেরুতে পার, তৈরী হতে পার। ধরণীর সর্বাপেক্ষা হিংস্র জানোয়ার মানুষের শক্তি এবার কমে এসেছে। রোদের মধ্য দিয়ে একটা সূক্ষ্ম ছায়ার স্রোত কানে কানে হয়তো বা কিছু বলে যাচ্ছে ওদের। আরেকটা বাঁক নিয়ে নতুন খাড়িতে পড়েছে ভট্‌ভটিটা। ভ'টার টান সমানেই চলেছে। কিন্তু খাড়ির পরিধিটা এখানে আরও চওড়া বলে জলের উদ্দামতাকে বেশি বলে মনে হচ্ছে। ভূধরের ভাই মাথা থেকে ছাতাটাকে নামিয়ে নিয়েছে। কতদূরে আছে সাতজিলিয়ার সেই দ্বীপটি কে জানে! এ-যেন প্রাচীন বর্বরদের সেই পরলোক ক্ষেত্র—কোথায় তার অবস্থান কেউ জানে না। ভূধরের বাবার ছবিটা আবার চোখের উপর ভেসে উঠছে—স্থির শক্তদেহের উপর ধূয়াকৃতি একটা আবরণ—হয় তো বায়োপ্লাজমিক বডি। ভেতরে চৌম্বক ক্ষেত্ররূপী যে প্রাণসত্তা তা চলে গেছে। তবু কেন যে তা ঐ নিথর দেহটি ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে কে জানে! এই হয়তো মায়া। জীবাত্মা এই পার্থিব দেহটিকে ঘিরে এখনও পার্থিব লীলার স্বপ্ন দেখছে হয়তো। জীবাত্মার মধ্যে প্রাণশক্তির উপর এই বৃত্তিপ্রবাহ 'মন' নামে এক অদৃশ্য সত্তার মধ্য দিয়ে কেমন করে আসে কে বলবে!

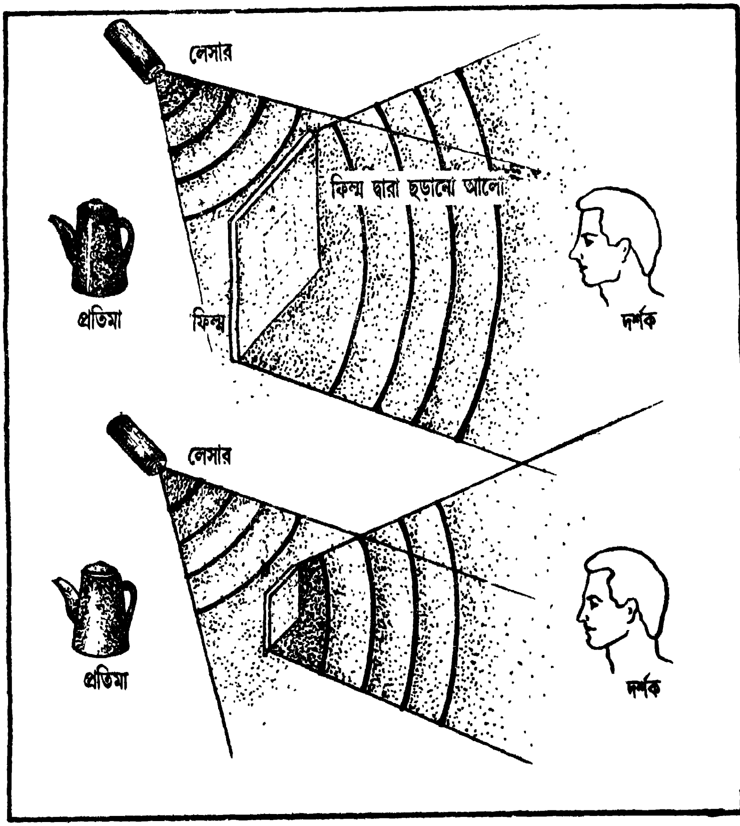
মনের সৃষ্টি হয়তো যান্ত্রিক দেহের মস্তিষ্কে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে। মানুষের যে মস্তিষ্কস্নায়ুমণ্ডলী আছে বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতা সেখানে সঞ্চিত হয়ে মানসবৃত্তিরূপে বোধহয় প্রকাশ পায়।

এ ধরনের চিন্তা বোধহয় মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম করেছিলেন প্রাচীন গ্রীসে আরিস্টটল। তাঁর ধারণা ছিল, করোটির মধ্যে নরম মোমজাতীয় পদার্থ আছে, বাইরের প্রভাব তার উপর ছাপ ফেলে, যেমন ফটোর নিগেটিভে বাইরের ছাপ ওঠে। একের পর এক এই ছাপ পড়তে পড়তে তা একটা ভাণ্ডাররূপে গড়ে ওঠে। মস্তিষ্কস্নায়ুতে তার ফলে যে উত্তেজনা দেখা দেয় তাই স্মৃতিরূপে, মনরূপে ফুটে ওঠে। আধুনিক বিশ্বাস, মানস অভিজ্ঞতা 'হলোগ্রামে' ধরে রাখা ইনফরমেশনের মত। এ ধরনের বর্ণনা অ্যারিস্টটলের বর্ণনা থেকে একটু পৃথক হলেও মূলত একই। এই তত্ত্বমতে মস্তিষ্কস্নায়ুতে সঞ্চিত স্মৃতি বহুদিন পর্যন্ত টিকে থাকে। আবার এক ধরনের স্মৃতি আছে মস্তিষ্ক স্নায়ুতে যা স্থিত হয়ে বসবার আগেই মুছে যায়। যেমন নতুন কোন ফোন্ নাম্বার। এটা হয় মস্তিষ্ক-স্নায়ুবলয়ে সাময়িক একটা তরঙ্গ ওঠার জন্য। কিন্তু যখনই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির প্রশ্ন দেখা দেয়, সমস্যা আসে তখনই—কারণ তখনই মানসসত্তার একটি প্রশ্ন এসে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির তত্ত্ব নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁরা দেখেছেন যে, জীবন্ত

' ক্যামেরা ছাড়া ফিল্মের উপর যে ত্রিমাত্রিক ছবি ফুটে উঠে তা ফুটে উঠে বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর ব্যতিকরণ জাতীয় ধরন থেকে। এই ছবি ফিল্মের ভিতর দিয়ে আলো ভেদ করালে দেখা যায়। ৬৮ পৃঃ দেখুন।

প্রাণীর রূপোদ্ভবের পেছনে রয়েছে একটি মূল বা আদি উৎপাদনীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ জৈবসত্তার এক মূল ক্ষেত্র যা বিশেষ একটি প্রাণস্পন্দনে রূপ সৃষ্টি করে। এখানে মানসসত্তার একটি সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেই কোন্ সুপ্রাচীন প্রাণশালা থেকে যে স্মৃতির একটা তরঙ্গ ভেসে আসছে কেউ তা জানে না। সেটাই ধীরে ধীরে সংগ্রহের ভারে বেড়ে উঠছে, বৈজ্ঞানিকেরা যার সূত্র খুঁজে পেয়েছেন জিনের মধ্যে। আদি প্রাণপ্রবাহ জিনে জিনে এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। কখন কোন্ জিনের মহাপ্রাচীন স্মৃতির ছবি জেগে উঠে স্বপ্নের



হলোগ্রাফ

মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে কেউ তা বলতে পারে না। গণনাতীত জিনের প্রবাহ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরের স্মৃতিকে কখনও একক, কখনও সমবেতভাবে বহন করে নিয়ে আজ এসে উপস্থিত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের দুয়ার পর্যন্ত—যার খবর পেয়ে য়ুঙ সৃষ্টি করেছেন তাঁর collective unconscious-এর তত্ত্ব।

স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে এই জিন মূলত কাজ করে মস্তিষ্কস্নায়ুতে। সেই

মস্তিষ্কস্নায়ু যদি কখনও ক্ষতবিক্ষত হয়, ধ্বংস হয়, তখন দেখা যায় যে, মানুষ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এতে এইটুকু বোঝা যায় যে, মন বা স্মৃতি থাকে মস্তিষ্কেই। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাই যে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা তা নয়। এই প্রসঙ্গে একটা সুন্দর তুলনাও পাওয়া যেতে পারে। যদি টেলিভিশন সেটের কোন অংশ নষ্ট হয়ে যায় তার মানে এই নয় যে টেলিভিশনে যাদের দেখি তারা সবাই হারিয়ে গেছে। টি. ভি-র বৈদ্যুতিক চার্জ যদি যথাযথ ফিরিয়ে আনা যায় তবে আবার তা ছবি আনতে আরম্ভ করবে। এর ফলেই এমন চিন্তা এসেছে, যাতে মনে হয়, স্মৃতি মস্তিষ্কস্নায়ুতে সঞ্চিত না থাকলেও অন্যত্র থাকতে পারে। ফলে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে, স্মৃতির স্মরণীয় বিষয়গুলি মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে। ছবি দেখার জন্য যেমন টি. ভি-র যন্ত্রাংশগুলি ঠিক থাকা প্রয়োজন, তেমনই কোন কিছু মনে রাখতে হলে মস্তিষ্কস্নায়ুও যথাযথ থাকা প্রয়োজন এই যা। স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া মানে অতীতের ঘটনাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ব্যর্থতা। তাই বলে অতীত ঘটনাগুলি যে কোথাও নেই তা নয়। অন্য কোনও মস্তিষ্কস্নায়ুতে তা থাকতে পারে। কিংবা সার্বিক কোন এক ভাণ্ডার আছে যার বুকে সময়ের এক্তিয়ারের মধ্যে তা জমা থাকে। এই সার্বিক ভাণ্ডার হল নির্বিকল্প দেশ। স্মৃতি তার মধ্যে সময় ও সবিকল্প দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।[1]

তবে মস্তিষ্কস্নায়ুর মধ্যেই স্মৃতিগুলো সঞ্চিত থাকে এই ধারণা সহসা যাবার নয়। সুতরাং Wider Penfield-এর তত্ত্ব ধরে অনেকে আজও প্রাক্তন চিন্তার মধ্যেই নোঙর ফেলে থাকতে চান। পেনফিল্ড দেখিয়েছেন যে, মৃগী রোগীদের মস্তিষ্কস্নায়ুতে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা গেলে প্রাক্তন স্মৃতি আবার হুবহু ফিরে আসে। ফলে ধরা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের মধ্যেই মননশক্তি স্মৃতির ফিল্ম তৈরী করে থাকে। কিন্তু এরকম চিন্তা যে নির্ভেজাল চিন্তা তা নয়। আশ্চর্য ঘটনা তো টি. ভি. সেটের টিউনিং সারকিটে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করা গেলেও পাওয়া যায়। দেখা যাবে, শক্তিপ্রবাহ চ্যানেলে চ্যানেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, ফলে বিকৃত ছবি আসছে। তার মানে এই নয় যে ছবিগুলো টি. ভি. সেটের মধ্যেই থাকে।

মস্তিষ্কে স্মৃতি থাকে এর বিরুদ্ধে আরও বড় প্রমাণ এই ধরনের তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে (Trace Theory=মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে)। এ-ধরনের ভাবনা বেশ অস্পষ্ট ধরনের। যদি একে গ্রহণীয় বলেও ধরে নেওয়া যায় তবু বৈজ্ঞানিক মহলে এনিয়ে একটা দ্বিধা থেকেই গেছে। এটা সাধারণ

---

[1] নির্বিকল্প দেশ হল Absolute Space. সবিকল্প দেশ হল সময় থেকে যা স্ফীতমান এবং সময়ের গতির সঙ্গে যার সম্প্রসারণ। ভারতীয় ভাষায় যাদের বলা যায় পরব্রহ্ম ও ব্রহ্ম।

বাস্তব বিশ্বাসের মত—যেখানে মনে করা হয় যে, মস্তিষ্কস্নায়ুতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রবাহের উপর 'স্মৃতি' নির্ভর করে অর্থাৎ মস্তিষ্কস্নায়ুতে বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রবাহের বৃত্ত রচনার উপর 'স্মৃতি' নির্ভরশীল।

বিংশ শতকের ৭-এর দশকে একটা বিশ্বাস খুব চালু ছিল যে, Ribonu-cleic Acid (R N A)-এর জটিল গঠনশৈলীর মধ্যে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। স্মৃতি এই মলিকুলগুলির অভ্যন্তরে থাকে। তবে এখন একে আর তেমন কোন মূল্য দেওয়া হয় না। হয় না এই কারণে যে, স্মৃতিধারণ করার মত এমন একটা জটিল ব্যাপার সাধারণ কিছু মলিকুল দ্বারা কখনই সম্ভব হতে পারে না।

স্মৃতি সম্পর্কে তৃতীয় যে তত্ত্ব আছে তার নাম Synaptic Modification। বিভিন্ন স্নায়ুকোষের সঙ্গে ক্রোমোজম যে সংযুক্তিকরণের খেলা খেলে তাকেই বলে Synaptic Moditication. এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এক ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া তোলে। একই ধরনের তরঙ্গ বার বার একই ধরনের সাড়া তুলে এই কোষের অধিকারী প্রাণীকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেয়। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্টও একই ধরনের অনুমান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, দেহের রোমকূপ দিয়ে যে তরল স্বেদ জাতীয় রসায়ন বের হয়– তারই উপর স্মৃতিশক্তি নির্ভর করে। এই তরল রাসায়নিক স্বেদ জাতীয় জিনিস যতই বেরুবে—এই রোমকূপের মুখ ততই বড় হবে! তাতে স্বেদপ্রবাহের কাজ সহজ হবে। তার মানে স্মৃতিশক্তিও বেড়ে যাবে।

Synaptic Modification তত্ত্ব কতকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই জোরদার হয়ে ওঠে। এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল কয়েকটি শামুকের ওপর। শামুক জাতীয় প্রাণীর দীর্ঘ স্নায়ুতন্ত্রী আছে। প্রথম প্রথম যদি এর দীর্ঘ বহিঃাগত স্নায়ুতে সুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নায়ুতন্ত্রী সে খোলের ভিতর ঢুকিয়ে নেবে। ক্রমে ক্রমে সে যখন বুঝতে পারবে যে. এই আঘাত তার পক্ষে ক্ষতিকর নয় তখন সুঁচের আঘাত আর গ্রাহ্য করবেনা। এই ভাবে অভ্যস্ত হতে হতে তার ক্রোমোজম-এর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে যাবে। তবে কেন এ পরিবর্তন ঘটবে আজও তা তেমন স্পষ্ট নয়। এ ধরনের পরীক্ষা থেকে জটিল স্নায়ুমণ্ডলীসমন্বিত প্রাণীর মধ্যে যে বিচিত্র ধরনের জ্ঞান হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্য করলে নিশ্চয় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখতে দেখতে মস্তিষ্কস্নায়ুর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। তবে এ থেকে কি মানস-আধারে স্মৃতিসঞ্চয় সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা যায়? K. S Lashley পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেন যে, স্মৃতি যদি মস্তিষ্কস্নায়ুতেই থাকে—তাহলে কোথায় থাকে সেটা ধরা যাবে। ফলে মস্তিষ্কস্নায়ুর বিভিন্ন অংশ একের পর এক সরিয়ে নিয়ে তিনি দেখার চেষ্টা করেন যে, কোন্ অংশ সরালে কোন্ স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। বহুদিন এ-ধরনের পরীক্ষা চালিয়েও তিনি

এর কোন হদিশ করতে পারেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মস্তিষ্কস্নায়ুর বিরাট অংশ সরিয়ে নিলে তবেই কাউকে স্মৃতিভ্রষ্ট করা যায়। কতটা অংশ সরিয়ে নিলে কাউকে স্মৃতিভ্রষ্ট করা যায় সেটাই শুধু দেখার। স্মৃতিসঞ্চয়ের কোন বিশেষ অংশ নিরূপণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। সুতরাং মস্তিষ্কস্নায়ুর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্মৃতি সঞ্চিত থাকে একথাটা সত্য নয়। সমগ্র মস্তিষ্কস্নায়ুর মধ্য দিয়েই মানসসত্তা কাজ করে।

এর ফলে নতুন এক তত্ত্ব আসে যার নাম Holographic Theory. এতে বলা হয়, 'স্মৃতি' মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে সঞ্চিত থাকে না—সারা মস্তিষ্কস্নায়ু জুড়েই থাকে। তবে এত সত্ত্বেও এটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্যই রয়ে গেছে যে, মস্তিষ্কের মধ্যেই স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। এবিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। আর যা-ই হোক মস্তিষ্ক হলোগ্রাম নয়। হলোগ্রাম যে পদ্ধতিতে কাজ করে মস্তিষ্কস্নায়ু সেভাবে কাজ করেনা।

স্মৃতির আধার সম্পর্কে এই দিশেহারা ভাব অন্ততঃপক্ষে একটি কাজ করেছে, তা এই যে, মন সম্পর্কিত একটা যে যান্ত্রিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল তা রীতিমত বাধা পেয়েছে। নতুন চিন্তা এসেছে এই যে, মস্তিষ্কস্নায়ু মানসক্রিয়া আহরণ করে বাইরে থেকে, বিশ্বমানসের সুরে সুর মিলিয়ে। এই বিশ্বমানস মূল জৈবসাত্ত্বিক তরঙ্গে পূর্ণ। এর সঙ্গে সমতালে আসা গেলেই অর্থাৎ মস্তিষ্ক যন্ত্র যদি এই মূল জৈবসাত্ত্বিক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হতে পারে তবেই তার মানস ক্রিয়া চলে, মস্তিষ্কের বাইরে স্থিত কোন স্মৃতিসঞ্চয়ভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। জগতের সমস্ত ঘটনাবলী কি ভাবে এই বিশ্বসাত্ত্বিক ফিল্মে অঙ্কিত হয়ে স্মৃতি-ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে একমাত্র যোগিরাই তা জানতে পারেন। সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'আমি আমার বহু পূর্বজন্মের কথা জানি'। স্মৃতিব্যাঙ্কে কর্মফল ভবিষ্যৎ হিসেবেও সঞ্চিত থাকে। কি ভাবে তা থাকে আমার 'দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থে তা আমি বিশ্লেষণ করেই বর্ণনা করেছি। সেই বিশ্লেষণের কথাগুলোই মনে আসতে লাগল। টেলিপ্যাথি বলে যে একটা শব্দ আছে, তার অর্থ হল তাৎক্ষণিক ভাবতরঙ্গের পারস্পারিক যোগাযোগ। দিব্যদর্শন হল বিশ্বমানসের সঙ্গে যোগসাধনের ফল। এই জন্য সম্মোহিত করে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাত্মিক-সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করানো গেলে বহু অতীত স্মৃতি ভেসে উঠে। মস্তিষ্ক-স্নায়ুর নিচের স্তরে জমে থাকা স্মৃতি যে এর ফলে উপরে ভেসে ওঠে তা নয়।

'স্মৃতি' মূল জৈবসাত্ত্বিক তরঙ্গের সঙ্গে যান্ত্রিক মস্তিষ্কতরঙ্গস্নায়ুর যোগ মাত্র, এমন ভাবনাই এজন্য ধীরে ধীরে বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—যাকে বলে morphic resonance. এরই ফলে ব্যক্তিগত স্মৃতিই যে মহাপ্রাচীন ইতিহাসের গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে তা নয়। ভেসে উঠে সমগ্র প্রাণীজগতের প্রাচীন ছবিও। জীনের আদ্যা জৈবসাত্ত্বিক অবস্থা থেকেই এই চিত্রগুলি মানব-মানসে স্মৃতির

চিত্ররূপে ভেসে ওঠে—যাকেই য়ুঙ বলেছেন Collective Unconscious.

সেই যে বহুকাল ধরে চলে আসা বাস্তুবাদী চিন্তা—আমাদের স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি, ভাবাবেগে, চিন্তাপ্রবাহ, সবই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের ফলে ঘটে, তা আজ আর তেমন কল্কে পাচ্ছেনা। এই যান্ত্রিক তত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিল—অর্থহীন এই বিশ্বে প্রাণের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। আকস্মিকতার কোন এক অবসরে প্রাণের ক্ষুদ্রতম যান্ত্রিক অংশ—জিনের পারস্পরিক সমন্বয়েই জীবনের বিকাশ। তার টিকে থাকা হল প্রকৃতির একটা অন্ধশক্তির মধ্যে কিছু কিছু প্রাণের জন্য তার নিজস্ব যান্ত্রিক নির্বাচন। সেই অর্থে মানুষ একটা জটিল যান্ত্রিক সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়—বাঁদরের (প্রকৃতি) এলোপাথাড়ি টাইপ চালনা থেকে অকস্মাৎ ফুটে ওঠা একটা কবিতামাত্র। কিন্তু এমনতর একটা চিন্তাকে যে প্রমাণ করা যাবে তাও নয়। এর ফলে যে বিশ্বাস বেশী প্রাধান্য পেয়েছে তা হল নিরীশ্বরতাবাদ।

আকস্মিকতার কথা প্রমাণ করতে না পারলেও বস্তুবাদীরা আজও এমন একটা বিশ্বাসেই আত্মসমর্পণ করে থাকতে চান যে, জীবন হল একটা জটিল স্থূল বস্তুসাত্ত্বিক দেহ ও রসায়নক্রিয়াজাত যন্ত্র মাত্র। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিয়েছে এখানেই যে, জীবনের অনেক কিছুকেই যান্ত্রিক ধারায় ব্যাখা করা চলে না। যে ভাবে বীজ থেকে বৃক্ষ, ডিম্বনিষেক থেকে ভ্রূণ প্রভৃতির বিকাশ ঘটে সাধারণ যান্ত্রিক রাসায়নিক ব্যাখার মধ্যে তার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ফলে এই ধারণা এসেছে যে, আদি জৈবসাত্ত্বিক সৃষ্টিবীজক্ষেত্র থেকেই সব কিছুর উদ্ভব—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় morphogenetic field এই আদ্যা অবস্থাই জৈবগঠনপ্রণালীর উপর এক মানসসাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা ও পদ্ধতি সংযোজিত করে দেয়। এই ক্ষেত্র (field) তৈরী হয় আদ্যা সূক্ষ্ম তরঙ্গ থেকে—যার মধ্যে বস্তুসাত্ত্বিক কোন ভিত্তিই নেই, যা সৃষ্টির শৃঙ্খলা থেকেই মানসসত্তায় ভেসে আসা সকল স্মৃতিকেই আপন সর্বব্যাপ্ত সত্তায়—জননীর মত লালনপালন করে রাখে। DNA-এর মধ্যে যে জিন জাতীয় স্থূল প্রাণের প্রাথমিক উপাদান থাকে তা-ই এই আদ্যা প্রাণতরঙ্গের সঙ্গে সংযোগসাধন করে দেয়। কিন্তু প্রাণীর দেহাকৃতি, অব্যক্ত অনুভব শক্তি, গঠনপ্রণালী এসব যে জিনের মধ্যে থাকে তা নয়। যেমন T V.-সেটের পর্দায় ফুটে ওঠা ছবি T. V -এর আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে থাকে না।

মানুষের মস্তিষ্কস্নায়ুও T. V-এর আভ্যন্তরীণ জটিল যন্ত্রের সমাবেশের মত, যা নিজে ছবি তৈরি করে না, বহিরাগত যে ছবির তরঙ্গ ধরে তাইই দেখায়। মস্তিষ্কস্নায়ুর স্মরণযোগ্য বিষয়গুলি অন্যত্র থাকে। উপযুক্তভাবে তা উত্তেজিত হলে, বাইরে থাকা স্মৃতির তরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরাল হলে, স্মৃতির খেলা খেলে।

বস্তুবাদীরা তবু যে সহজে পথ ছেড়ে দিতে রাজি তাতো নয়! তাঁরা বলেন, মস্তিষ্কস্নায়ুতে ও দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন এনে মানসিক অবস্থার

যদি পরিবর্তন আনা যায় তাহলে মস্তিষ্কের মধ্যেই যে মনের বাস নয়, তা বলা যাবে কি করে? LSD জাতীয় ট্যাবলেট খেলেই দেখা যাচ্ছে মানসক্ষেত্রে এক বিরাট রকমের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এমন কথা বলা যাবে যে, দৈহিক অবস্থার হেরফেরের উপরই মানসিক অভিজ্ঞতার চরিত্র নির্ভর করে? এমন তো T. V. সেটের অভ্যন্তরস্থ জটিল তারসমূহের মধ্যে কিছু রাসায়নিক তরল পদার্থ ঢেলে দিলেও হবে। তাই বলে কি মনে করতে হবে যে ছবিগুলো T. V. সেটেরই জটিল যন্ত্রবিন্যাসজাত? T. V. সেটের উপর ছবির প্রদর্শনী নির্ভর করলেও স্টুডিওতে যদি এই ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত না হয় তা হলে T V নিখুঁত থাকা সত্ত্বেও ছবি আসবে না। যদি বিদ্যুৎতরঙ্গ ব্যর্থ হয় তাহলেও ছবি আসবে না। আবার T. V.-র গোলমাল হলেও স্টুডিওতে কিন্তু ছবি চলতেই থাকবে। সুতরাং T V. মরে গেলেও ছবি মরে যায় তা সত্য নয়। ফলে দেহ মরে গেলেই মন মরে যাবে এমন নাও হতে পারে। সে হয়তো তার যথার্থ যে স্টুডিও সেখানেই বসে থাকে। সুতরাং দেহের মৃত্যু মানেই মনের মৃত্যু এমন নয়।

ইলেকট্রোএনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্র মানুষের মাথায় লাগিয়ে দেখা গেছে যে, চৈতন্যের নানা পর্যায়ে, যেমন, জাগ্রত, সুসুপ্তি, স্বপ্ন—মস্তিষ্কস্নায়ু বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ তোলে। এই তরঙ্গায়িত রেখা দেখে বলে দেওয়া যায় যে, কেউ নির্ভেজাল নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, জাগ্রত ছিল, না স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু কি স্বপ্ন দেখছিল, কি ভাবছিল তা বলা যাবে না। ভাল করে পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্তই নেওয়া গেছে যে, প্রত্যেকটি চিন্তাভাবনাই মস্তিষ্কের স্নায়ুতে বা স্নায়ুর গঠনশৈলীতে দৈহিক বা রাসায়নিক পরিবর্তন আনে।

সচেতনমানস জাগ্রত অবস্থায় নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার দেহের আভ্যন্তরিণ অবস্থার দ্বারা সে নিজেও প্রভাবিত হতে পারে। তার পরিবেশ, প্রতিবেশীদের মনোভাব, সবই তাকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে স্বপ্নের সময় মন ও দেহের সম্পর্ক ততটা নিকট নাও হতে পারে (যদিও কোন কোন স্বপ্ন দেহের উপর রীতিমত প্রভাব ফেলে)। আবার জাগ্রত অবস্থায়ও মনের সঙ্গে দেহের তেমন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। যেমন দিবাস্বপ্নে কেউ নিবিষ্ট থাকার সময় এমনও হতে পারে যে, মন ও মস্তিষ্কস্নায়ু এক জিনিস না হওয়া সত্ত্বেও উভয়েই নিকট সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে। বস্তুবাদীরা মস্তিষ্কস্নায়ুকে কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। তবে কম্পিউটার-হার্ডওয়্যার নিজে কিছু করতে পারে না। এতে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে তবেই সে কাজ করতে পারে। কম্পিউটারের মধ্যে যে জটিল তারের জাল আছে প্রোগ্রাম কিন্তু তার অংশ নয়। এই প্রোগ্রাম সচেতন মানুষ তৈরি করে। অপর দিকে প্রোগ্রামদাতার কার্যকলাপ কম্পিউটারের কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কম্পিউটারও প্রোগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু এত নিকট

সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কম্পিউটার ও প্রোগ্রামার এক নয়।

দেহ ও মনের সঙ্গে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। তবু তারা যে টাকার এপিঠ ওপিঠের মত তা নয় অর্থাৎ একই জিনিসের দুই দিক। প্লেটোর সময় থেকেই এই ধরনের একটা চিন্তা চলে আসছে। আধুনিক কালের দুই মনীষী Karl Popper (দার্শনিক) ও Sir John Eccles (brain scientist) তাঁদের The Self And Its Brain (1977) গ্রন্থে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। অপরপক্ষে একদল এখনও এই চিন্তাই আকড়ে আছেন যে, মন মস্তিষ্কস্নায়ুর কর্মপদ্ধতির একটি পরিণতি মাত্র। বস্তুবাদীরা সমগ্র বিশ্বকেই বস্তুসত্তার ভিত্তিতে দেখেছেন। ফলে ঈশ্বর নামক কোন অতিসত্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদীদের এধরনের চিন্তার পেছনে কি সত্যই কোন অনড় ভিত্তি আছে? এক্ষেত্রে হাইড্রোফেলাস রোগ কিন্তু বস্তুবাদ-এর বিরুদ্ধে বড় প্রতিবাদ। এই রোগে মস্তিষ্কস্নায়ু ক্ষয়ে যায়। করোটির মধ্যে অধিকাংশই থাকে জল। অথচ সে কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। ফলে মস্তিষ্কস্নায়ুতে প্রতিক্রিয়াস্বরূপই লোকের মানসশক্তির স্ফুরণ ঘটে একথাও বলা যায় না।

শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন লরবার বুদ্ধিবৃত্তির জন্য, স্মৃতির জন্য, মানসক্রিয়ার জন্য, মস্তিষ্কস্নায়ুর একেবারেই প্রয়োজন আছে কিনা ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন। একটি অদ্ভুত ছাত্রই তাকে এই প্রশ্ন তুলতে প্রেরণা দিয়েছিল। মননশক্তির দিক থেকে বিচার করলে তার বুদ্ধিবৃত্তির মাত্রা ছিল ১২৬। অঙ্কে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল। অথচ বিচার করলে তার কোন মস্তিস্কস্নায়ুই ছিল না। তার মাথাটা স্বাভাবিক মাথা থেকে একটু বড় ছিল কিন্তু ভেতরে যে স্নায়ুমণ্ডলী থাকা দরকার তা ছিল অত্যন্ত সামান্য। এই অদ্ভুত ছেলেটি মনের বাস্তববাদী ভিত্তিকে যেন একেবারে নাড়িয়ে দেয়।

দৈহিক মৃত্যুর পরও ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিমানস থেকে যায় বাস্তববাদীরা একথা স্বীকার করতে রাজি নন। তাই তাঁরা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা, জাতিস্মরদের ঘটনা, দেহবিহীন অভিজ্ঞতা, অধিমনোবিজ্ঞানীদের এ সব দাবিকে একেবারেই আমল দিতে চান না। টেলিপ্যাথি, দিব্যদর্শন, পূর্বাহ্নদর্শন (precognition) এগুলোর কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও মৃত্যুর পরে আত্মা স্বতন্ত্র চিৎশক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণই পাওয়া যায়না। সেটা স্বীকার করতে গেলে বস্তুর অতীত কোন এক সচেতন অবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হয়। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা-বৃত্তের মধ্যে এটা পড়েনা বলে বস্তুবাদীরা এ-ধরনের ভাবনাকে একদম আমল দিতে রাজি নন। অপরপক্ষে যারা বস্তুবাদবিরোধী তাদেরও বক্তব্য, মন যে মস্তিষ্কস্নায়ু ও বাহির্বিশ্বের অভিঘাতেই সৃষ্টি এমনতর বাস্তব প্রমাণও কারো হাতে নেই। সুতরাং বস্তুবাদীদের কথাই বা স্বীকার করতে হবে কেন? মন এবং দেহের মধ্যে একটা

পারস্পরিক যোগাযোগ হয় একথাটা স্বীকার করে নিলেও মৃত্যুর পর চিৎশক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনা এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

বস্তুবাদীরা যতই চেঁচামেচি করুন না কেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজও মনে করে যে, মৃত্যুর পর কিছু একটা থেকে যায়। অনেক সমাজে আজও এ ধারণা প্রবলভাবে বিদ্যামান যে, মৃত্যুর পর পরলোকে ছায়া ছায়া জাতীয় আত্মা থেকে যায়। এক ধরনের ব্যক্তি আছেন যাদের শমন বলা যায় বা যোগী। তাঁরা এই মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং সেটা যথার্থই আছে কিনা—তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আধুনিক মানুষ সৃষ্টি করেছে অইজাবোর্ড, প্ল্যানচেট, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি। এবং এতে যে তাঁরা সাড়া না পেয়েছেন তাও নয়। কিন্তু বস্তুবাদীরা এতেও বিশ্বাস করতে রাজি নন যে, দৈহিক মৃত্যুর পর মানসসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে—অর্থাৎ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। তারাও মন, বুদ্ধি বা আত্মাকে মস্তিষ্কস্নায়ুজাত এক ধরনের ছায়া—বা গুণ বলে ভাবেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যারা আত্মার অস্তিত্বে, মনের স্বতন্ত্র স্থানিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের হাতে যেমন জোরালো কোন প্রমাণ নেই তেমনই যাঁরা তা অস্বীকার করেন তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণে যথার্থভাবে বোঝাতে পারেন না যে, তাঁদের বক্তব্যই সত্য।

যাঁরা বিশ্বাসী, অর্থাৎ আত্মা বা মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা কি বলতে পেরেছেন সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বটি কি ধরনের? সাধারণ ভাবে শুধু এইটুকুই বলতে শোনা যায় যে, আত্মা আছে। কিন্তু আত্মা জিনিসটি কি?

আত্মা কি একটা মানসতরঙ্গ মাত্র? তাহলে তার রূপ কি? মনের তো রূপ নেই। আর দেহ ছাড়া তার অস্তিত্বই বা কি ভাবে হতে পারে? বিদেহী অবস্থায় স্বতন্ত্র জীবাত্মিক ভাব নিয়ে বেঁচে থাকার কল্পনা একটা অসম্ভব কল্পনা মাত্র। যদি তা থেকেই থাকে—তবে তা কি? কি ভাবে থাকে?

এর স্বপক্ষে যাঁরা বলতে চান—তাঁরা স্বপ্ন দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। স্বপ্নে আমরা যত্রতত্র আমাদের মানসসত্তাকে বিচরণ করতে দেখি। বাস্তব সত্যের মতই দেখি, শুনি, চলাফেরা করি। অথচ দেহতো সত্যিই তখন চলা ফেরা করে না! সুতরাং স্বপ্নে আমরা যে-দেহ দেখি তা আমাদের স্থূল দেহ নয়। এ দেহ ভিন্ন দেহ, যাকে স্বপ্নদেহ বলা যেতে পারে। স্বপ্নে দেখা দেহ, দৃশ্য, কোনটাই বাস্তব নয়।

স্বপ্ন দেখার পর জেগে ওঠার জন্য বাস্তবদেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ বাস্তব দেহ আর কোন কাজেই লাগে না। ফলে এমন হতে পারে যে, একটা স্বপ্নাবস্থার মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও মানস অবস্থা থেকে যায়—যা থেকে জাগরণ আর সম্ভব নয়। স্বাপ্নিক সত্য-ভাবনার মধ্যেই আমরা থেকে যাই।

স্বচ্ছ স্বপ্নে একটা জিনিস জৈবিক সত্তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা স্বপ্ন দেখছি। এবং এক্ষেত্রে জৈবিক সচেতন মানসিকতা আমাদের যেখানে খুশি

নিয়ে যেতে পারে। অনেকে এমন অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে তাঁরা শয্যার উপর তাদের যথার্থ জৈবসত্তাকে নিদ্রাকাতর অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, স্বপ্ন-দেহ স্থূল জৈবদেহ নয়। এ কিছুটা বিদেহী অভিজ্ঞতার কথা, অধিমনোবিজ্ঞানে যাকে বলা হয়েছে OOBE= Out Of The Body Experience. সুতরাং স্বপ্নে চিৎসত্তার যথার্থ অধিষ্ঠান স্বপ্ন-দেহে। বিদেহী অভিজ্ঞতার নির্ভরস্থলও হয়তো এই স্বপ্ন-দেহেরই মত। এটা থেকেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, স্থূলদেহের মৃত্যুর পর ব্যক্তি-মানুষের মানসসত্তা কি ধরনের দেহে ভর করে থাকে। যারা সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই বলেছেন যে, এই দেহ ভাসমান থাকে। এই দেহ থেকেই তারা নিচে বা উপরে নানা জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। বৈজ্ঞানিকভাবে যখন চিৎসত্তার মূল কেন্দ্র এই জৈব দেহের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় নি তাহলে এই ধরনের সূক্ষ্মদেহে তাদের অধিষ্ঠানের কথা স্বীকার করলেই বা ত্রুটি কোথায়?

যদি ধরা যায় স্বপ্ন-দেহজাতীয় দেহ আছেই, তাহলেও এই জৈবদেহের মৃত্যুর পরের অবস্থানটা কি রকম? অধিমনোবিজ্ঞানীদের ধারণা, সূক্ষ্মদেহের টেলিপ্যাথি দ্বারা প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা বেশি। এই দেহ ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দর্শন করতে পারে। স্বপ্ন যেমন আমাদের জৈবদেহের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনই মৃত্যুর পরের জগৎও আমাদের বাস্তব জগতের চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন ঘটায়। সাময়িক মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে যাঁরা তাঁদের মুহূর্তিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, সেই জন্য দেখা যায় তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ীই পরলোকের চিত্র তাঁরা সূক্ষ্মসত্তায় দেখতে পেয়েছেন।

মৃতের আত্মা ও জৈবদেহে জীবিত তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হতে পারে। প্ল্যানচেটের মাধ্যমে এমন হয়েছে বলে শুনতে পাই। সাময়িক মৃতদের সম্পর্কে বলা যায় যে, স্বতন্ত্র এই সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব পুনরায় স্থূলদেহে প্রবেশ করে তাকে জাগরিত করে। একে বলে আত্মার দেহপ্রাপ্তি। এই আত্মা ভিন্ন দেহেও ঢুকে যেতে পারে এবং তখন এই দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে জৈবদেহী মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতা বিঘ্নিত হতে পারে—একেই সাধারণ বিশ্বাসে বলা হয় ভূতে ধরা। যদি এই সূক্ষ্মদেহ কোন রকমে কোন রমনীর জঠরের ভ্রূণের সঙ্গে মিশে যায় তখন তার ভাবতরঙ্গ নবজাতকে তার প্রাক্তন জীবনের প্রবণতা নিয়ে আবির্ভূত হয়।

তবে প্রাক্তন জীবনের ভাবতরঙ্গ যে অবিকৃত থাকবে তা নাও হতে পারে। কারণ, সূক্ষ্মদেহের অনেক সময়ই ভিন্নজগতের ভাবতরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এই যে অধ্যাত্মতা-উদ্বোধিত ভাব তাকেই খ্রীষ্টানরা বলেন মৃত্যুর পর আত্মার সংস্কার। তবে এ-সবই কিন্তু অনুমান মাত্র। আমরা নিজেরা না মরা পর্যন্ত এর যাথার্থ অনুভব করতে পারব না। কিন্তু তখন পৃথিবীতে

এসে এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলবে কে ?

ভিন্ন ভাবে এ ব্যাপারে আরও কিছু ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমাদের হতে পারে। দেখা গেছে, মনের জোরে মানুষ এমন কিছু কাজ করতে পারে যা তার দৈহিক বলে কুলাবার কথা নয়, যেমন—একগাদা ইঁট ভেঙে ফেলা, হাত দিয়ে না স্পর্শ করেই একটি লোককে মেরে ফেলা। শুধুমাত্র মনের জোরেই রোগ সারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। ধ্যান দ্বারা মনকে নিষ্ক্রিয় করে চুপ করে বসে থাকা প্রভৃতি দ্বারা মানসবৃত্তের বিরাট ব্যাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। এর ফলে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ডাঃ জেমস ব্রাইড নামে এক চক্ষুরোগ অস্ত্রোপচারক রুগীকে সম্মোহিত করে শল্য চিকিৎসা করতে পারতেন। অনেকে এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও কার্যত তিনি তা পরীক্ষা করে দেখান। এই সম্মোহন এমনই এক মানসিক শক্তি—যার দ্বারা মানুষের মধ্যে দৈহিক স্পর্শকাতরতার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এনে দেওয়া যায়। পাশ্চাত্যে এই মানসিক শক্তির সাহায্যে দৈহিকক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে। প্রাচ্যে অবশ্য এটা বহুপ্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত সত্য। ভারতীয় যোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মনের ইচ্ছামাত্র হৃদস্পন্দন, নাড়িস্পন্দন সব নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। অনেক যোগীকে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে এমন বাক্সে বন্দী করে রেখে দেখা গেছে যে, শ্বাসক্রিয়া ছাড়াই তাঁরা দিব্যি বেঁচে আছেন। তিব্বতে অধ্যাত্ম শিক্ষার্থীকে প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করার দিক্ষা দেওয়া হয়। একে বলে 'টুমো'। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ভাবে এই চিন্তা করতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যেন তারা দেহের মধ্যে আগুন জ্বলতে দেখছে। ফলে দেহে তারা সেই আগুনের তাপ অনুভব করে। প্রাচ্যে এক ধরনের সমরকৌশলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মানসিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে এ ব্যাপারে তারা অধ্যাত্ম সাধকেরই মতই সাফল্য দেখাতে পারে। প্রাচীনকালে যোদ্ধারা যে মন্ত্রপূত বাণ নিক্ষেপ করতেন মূলত তাতে তাঁদের মানসশক্তি প্রয়োগ করে গাইডেড মিছাইলের মত বাণের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন—যাতে তা নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানতে পারে। এটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রের মত। এই জন্য প্রাচীন ভারতীয় ধনুর্বিদেরা যোগশিক্ষা করতেন। পুরাণকাহিনীতে যে অলৌকিক শক্তিধর ধনুর্বিদদের কথা শোনা যায় তা আসলে এই মানসশক্তি-নিয়ন্ত্রণ-লব্ধ ক্ষমতা। এখনও এই মানসশক্তি ভারতীয় তুকতাক্ বিদ্যাতে বাণমারা নামক মারণবিদ্যারূপে কাজ করে। আমি নিজেও এই শক্তি প্রয়োগ করে দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ করা বা ঝড়ের গতি পরিবর্তন করায় বেশ সাফল্য পেয়েছি। জাপানীরা মনের এই অসাধারণ ক্ষমতাকে বলে 'কি' (Ki)। এই অতিসাধারণ শক্তি অর্জন করার জন্য পাঁচটি বিশেষ পথ অনুসরণ করে লোকে, যেমন, নিষ্ক্রিয়ভাবে স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে বিশ্রাম দেওয়া (শবাসনের মত), মনঃসংযোগ, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, মনকে

চিন্তাশূন্য করা, ছন্দময় কাজ করা প্রভৃতি। কারো কারো মতে এই অতি-সাধারণ ক্ষমতা অর্জনের তিনটি স্তর আছে—(ক) প্রথম পর্যায়ে শক্তির কেন্দ্রীকরণ ঘটে, (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত শক্তি নিজের দেহের সীমান্ত ছাড়িয়ে অপরকে স্পর্শ করতে পারে এবং (গ) তৃতীয়ত, ব্যক্তি প্রাণশক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ব্রুসলি এই অতিস্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। Moreshei Uyeshiba—দশজন শ্রমিক মিলে যে প্রস্তর খণ্ড নাড়াতে পারেনি মনের জোরেই তাকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি এটা করতেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে যে, মানুষের দেহের মধ্যে আত্মারূপী এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বাস করে। ক্যারাটে শিক্ষার্থীরা এই মানসিক শক্তিদ্বারা শুধু মাত্র হাতের আঘাতে একত্রে বসানো কয়েকটি ইঁটকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। মনের জোর এত বেশি যে, কাউকে স্পর্শ না করেই এই শক্তি প্রয়োগ করে কারো শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়া যায়। ডাইনীবিদ্যা যে সফল হয় তার কারণ তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, যে বাক্য তারা উচ্চারণ করছে তা সফল হবেই। না হলে মন্ত্রের নামে তারা যে বাক্য উচ্চারণ করে তা অতি সাধারণ। এই মানসশক্তিবলে যদি ক্ষতি করা যায় তাহলে কি ভালও করা যায়না? এইজন্য ফরাসী সাইকোথেরাপিস্ট Emile Coue বিশ্বাস করতেন যে, মানস শক্তি প্রয়োগ করে মানুষ নিজের ভাল করতে পারে। রুগীদের এই জন্য তিনি প্রতি প্রাতঃকালে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করার উপদেশ দিতেন—'প্রতিদিন প্রতিভাবে আমি নিরাময় হচ্ছি, নিরাময় হচ্ছি।' আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্যানসার নিরাময় করার জন্য Carl এবং Stephanie Simonton এমন এক নিরাময় কেন্দ্র খুলেছেন যেখানে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চলে। যে পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা চলে তা হল স্নায়ুতন্ত্রীকে শিথিল করে দেওয়া এবং মানসচিত্রে নিরাময়দৃশ্য তুলে ধরা। অনেক ক্যানসার রুগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ সাফল্য অর্জন করেছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি কতটা সফল হয়েছেন জানি না তবে এটা দেখা গেছে যে, ক্যানসারাক্রান্ত রুগীকে যদি জানানো হয় যে তার ক্যান্সার হয়নি তাহলে অনেকদিন সে ভালই থাকতে পারে। তবে যে মুহূর্তে তাকে তা জানানো হয় সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু তরান্বিত হয়ে আসে। বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, ধ্যানকালে দেহের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এটা হয় এই কারণে যে, আমাদের সচেতন মানসের অন্তরালে যে প্রচণ্ড শক্তি থাকে ধ্যানকালে সেই শক্তিকেন্দ্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। যাঁরা ধ্যান নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয়, তা বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে নানাপ্রকারে দৈহিকভাবে আমাদের হাল্কা করে। ফলে নানাবিধ রোগ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমি যেমন মনে করি ধ্যান মনকে টেনশনমুক্ত হতে সাহায্য করে পশ্চিমের অনেক

চিকিৎসাবিদও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন, যেমন, Harvard Medical School-এর Dr, Herbert Benson. নিশ্চুপ বসে থাকা গেলে দেহের ধমনীস্পন্দন শান্ত হয়। রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং আরও নানা ধরনের স্বাস্থ্যশান্তিকর ঘটনা ঘটে। এইজন্য এক ধরনের চিকিৎসা বেরিয়েছে যেখানে শারীরসংস্থা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শরীরের কোন অংশে কোন রোগ দেখা দিলে মানসশক্তির দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই মনঃসংযোগ ধ্যানেরই মত। এর ফলে যা-হয় তা হল দৈহিক ঘাটতিপূরণ—যাকে বলে Biofeedback. জাপানীদের জেন নামক ধ্যানে এই biofeedback-এর পর্যাপ্ত মসল্লা রয়ে গেছে। সম্মোহন প্রয়োগ করে নিরাময় করা অপেক্ষা bio-feedback-এ দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া যায়। মনের এই শক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে প্রাক্তন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের এমন একটি শাখার উদ্বোধন করেছিলেন—যার লক্ষ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ বা P. S. R (Psychic Self Regulation)। এর মধ্যে সম্মোহনী যোগ ও সামরিক মন:সংযোগ বিদ্যার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এতে দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ঠিক একই কারণে প্রাক্তন পূর্ব জার্মানীর খেলোয়াড়েরা ধ্যান, সম্মোহন এবং অনুরূপ কতকগুলি মানসিক নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা নিত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপভাবে না এগুলেও—কতকগুলি ক্ষেত্রে বেশ জোর দিয়েছে - যেমন, biofeedback, মননিয়ন্ত্রণ শিক্ষা, অতিক্রান্তিক ধ্যান (transcendental meditation) প্রভৃতি। দৈহিক পারদর্শিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। এখন হয়তো লোকে বুঝতে পারছেনা মানসিক এই নিয়মানুবর্তিতা কি ভাবে দৈহিক দক্ষতা ও রোগনিরাময়ে কাজ করছে। তবে এ ক্ষেত্রে মানসশিক্ষার ব্যাপারটা একটু পরীক্ষা করে নিলেই লোকে বুঝতে পারবে যে, এর অপরিসীম মূল্য কোথায়। আমাদের পরিপূর্ণতার অভাবের কারণ আমরা অধিকাংশ লোকই আমাদের যে দৈহিক ও মানসিক মৌলশক্তি আছে সাধারণত তার নিচেই থাকি। একে উপরে তোলার কোন চেষ্টাই করি না। এই চেষ্টার একটা পথ ও পদ্ধতি আছে—ভারতীয় যোগীরা যা জানেন। তাঁরা একে বলেন কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ। এই কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের যথার্থ অর্থ হল দেহের যে মৌলশক্তি তার মাত্রা বৃদ্ধি করা—যে মাত্রাবৃদ্ধির ফলে মানুষ নিজের মধ্যে অসীমের স্বাদ পায়, বাহ্যদেহের সাহায্য ছাড়াই মানুষ দেখতে পায়, শুনতে পায়, ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারে ; চোখ, কান, নাক সব বন্ধ করে ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেই আমি ভূধরের বাবাকে খাড়ির জলে ভাসমান ভট্‌ভটি থেকে দেখতে পাচ্ছি—কারো কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। পেটে রক্তের রেখা। অর্থাৎ আলসার জাতীয় ভয়াবহ রক্তক্ষরণজনিত রোগে

তাঁর প্রাণশক্তি স্থূল দেহের বাইরে এসে ভাসছে। সেই কলাকৌশলের সূত্রটুকুই তো আমি আমার 'দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্থে লিপিবন্ধ করেছি—এখন বিজ্ঞানের মধ্যে যার স্বপক্ষে প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

চার

এবার রোদে ধূসর আবরণ পড়েছে। খাড়ির আর একটা বাক্। ওপারে অতন্দ্র প্রহরায় সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ আরণ্যক সৈনিক—ঘন দঙ্গল সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্র হয়তো আর খুব দূরে নয়। সরাসরি সমুদ্র ভেজা হাওয়া এসে অগণিত সুন্দরীবৃক্ষের মাথায় মাথায় আছড়ে পড়ছে। এবার আরণ্যক সৈনিকদের দু'দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। অকস্মাৎ সমুদ্র যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ঝড় পাঠিয়ে দেয় সেই দিকে ; অপর পক্ষে খাড়ির অসংখ্য ভাসমান জলযান থেকে কেউ যদি এসে তার বুক লক্ষ্য করে হানা দেয় সেই দিকেও।

খাড়ির জল আরো নিচে নেমে গেছে। কিন্তু তার হাভেভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সমুদ্রের গন্ধ তার নাকে এসে ঠেকেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ অরণ্য-মাছিকে যেমন মাতাল করে তোলে তেমনই সমুদ্রের গন্ধমাখানো হাওয়া গায়ে লাগতেই খাড়িও কেমন হেলতে দুলতে আরম্ভ করেছে, ঠিক যেন মাতালের মত। সূর্য সারাদিন ভরে অজস্র তীক্ষ্ম বাণ বর্ষণ করে গেছে। কিন্তু ভেদ করতে পারেনি কাউকেই—কারণ, সে যে কর্ণের মত মানুষের হাতে কবচকুণ্ডলও দিয়ে দিয়েছে —ছাতা। শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে দুঃছাই বলে ধূসর ছাইয়ের মত আলো ছুড়ে দিয়ে – অস্ত্রগুলো তূণে ভরে নিয়ে রণে ভঙ্গ দেবার চেষ্টা করছে। ক্লান্তি বলে তো একটা কথা আছে! সে এখন ক্লান্ত। সূর্যের চোখে যে ঘুমের আমেজ তার দিকে তাকালে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সে তার নৈশ দায়িত্ব সমুদ্রের হাওয়ার কাছে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফেরার জন্য গোছগাছ করছে— ঠিক যেন ট্রাফিক পুলিশ বদলের মত। এবার জলযাত্রীদের দেখার দায়িত্ব তার। কয়েকবার ঝাপটা হাওয়া দাপট দেখিয়ে যাত্রীদের সামান্য একটু চমকে দিয়ে বুঝেছে—এ যাত্রীরা নিয়ম ভাঙার কোন কালো-জগতের লোক নয়। তাই ঘুষ খাওয়া ট্রাফিক পুলিশ যেমন লরির ড্রাইভারের হাত থেকে খৈনি নিয়ে ভাব করে, তেমনই আলতো ভাবে আমাদের চুলগুলি নিয়ে খেলা করে চলে যাচ্ছে। কুকুরের মত তীক্ষ্ণঘ্রাণ পুলিশের মত বুঝতে পেরেছে, এরা সব ফোক্‌তাই বাবু, পকেট গড়ের মাঠ। ফলে নিশানা পরিবর্তন করে অন্য কোন জলের বাঁকে বোধহয় হাওয়ার দাপট তুলে নতুন কাউকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রজালের মত তটে তটে মৎস্যজাল বন্ধ করে নদীর বুক থেকে মাছতোলা মানুষগুলো ঘরে

ফিরতে আরম্ভ করেছে।

ভূধর বলেছিল—ক্যানিং থেকে ছ'ঘণ্টা সাতজিলিয়া দ্বীপটি। সাতঘণ্টা ইতি মধ্যেই পার হয়ে গেছে। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে—সূর্যাস্তের জগতে ইউলিসিসের মত এ হয় তো অনিঃশেষ যাত্রা। কে জানে সাতজিলিয়া দ্বীপ নামে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব আছে—কি নেই। এক মাঝির চোখের ক্লান্তি আর এক সারেঙ মাঝির হাতে। ভট্ভটিটা তবু এগিয়ে চলেছে।

ভট্ভটিটা এগিয়ে চলেছে। ছায়া ছায়া শেষ আলোয় আমি আবার ভাবছি। ভূধরের বাবার উপর ঐ যে ধূসর একটা আবরণ দেখতে পাচ্ছি—আমি জানি তাই জীবাত্মা—রুশরা যাকে বলবে বায়োপ্লাজমা। আমি জানি, দেহ নিথর হয়ে গেলেও ঐ বায়োপ্লাজমার মধ্যে মননশক্তি থেকে যায়। মননশক্তির কল্পনা প্রবণতা ঐ ধূম্রাকৃতি সত্তাকে প্রবৃত্তি অনুযায়ী রূপ ধারণ করায়। ঐ বায়ো-প্লাজমিক সত্তার উপর আরও বায়োপ্লাজমিক সত্তা আছে। ঐ সত্তাটাও এক সময় স্থূল দেহেরই মত নিথর হয়ে আরও হাল্কা ধরনের বায়োপ্লাজমা ছেড়ে দিতে পারে। এই ভাবে অন্ততঃ পাঁচবার সে দেহের খোলস ছাড়তে পারে। আর যতবারই খোলস ছাড়ে ততবারই হাল্কা হয়ে দেশের (space)—আরও উপরের স্তরে উঠে যায়। শেষপর্যন্ত এ-সব কিছুই না থেকে থাকে শুধু একটা বৃত্তি-প্রবাহ যা নাকি আমাদের এই বিশ্বকে ভেদ করে অপর কোন বিশ্বে গিয়ে অদ্ভুত রকমের জগৎ দর্শন করতে পারে। সেই জগতের অভিকর্ষের টানে আবার সেই বৃত্তিপ্রবাহ ঘনীভূত হয়ে ধুঁয়াকৃতি হতে পারে। এবং নতুন জগতের কোন প্রাণী-গর্ভে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে প্রাণরূপ গ্রহণ করতে করতে এক সময় বড় হয়ে সেই গ্রহের অধিবাসী রূপেই জন্ম নিতে পারে। ভূধরের বাবার এই আত্মা পার্থিব মণ্ডলেই থাকবে না উপরে উঠবে—তা বোঝা যাবে তার স্থূল দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর। যতক্ষণ দেহ থাকে স্থূলদেহের প্রতি অদ্ভুত এক মায়া থাকে সূক্ষ্মদেহের। এতদিনের সঙ্গীকে সহজে সে ছেড়ে দিতে চায় না। এই যে বায়োপ্লাজমিক সত্তার শেষপ্রান্তিক একটি বৃত্তিপ্রবাহ, তার মধ্যে শক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। মন যদি সেখানেও থাকতে পারে তবে মনকে অবশ্যম্ভাবি বস্তুনির্ভর বলা যায় কি করে? কিন্তু বিজ্ঞান তো আমার এই মরমিয়া অনুভবের কথা শুনবে না। এ সম্পর্কে সে আর ভিন্ন কি চিন্তা করেছে?

বিজ্ঞান এই পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছে যে, আদি কোন মৌল ক্ষেত্রে জ্ঞানের অর্থাৎ মনের একটি ভাণ্ডার ছিল। নদীর স্রোতের মত সেই জ্ঞান শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। একে এঁরা বলেছেন 'pooled memory'—জগতের সমগ্র প্রাণসত্তার সম্মিলিত একক—'collective knowledge of our entire species.' উত্তরাধিকারের মাধ্যমে যা নদীরই স্রোতের মত প্রবহমান। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান যিনি চালিয়েছেন তাঁর নাম Rupert Sheldrake.

যখন খরগোসের বাচ্চা হয়— তারা জন্ম দেয় অনেক খরগোসের। গোল্ডফিস জন্ম দেয় গোল্ডফিসের। ফলের বীজ জন্ম দেয় ফলের। যে যেমন তার উত্তরাধিকারীও তেমনই। একই রূপেরেখায় জন্মের পর জন্ম তারা রূপরেখা রেখে যায়। কিন্তু পদ্ধতিটা যদি জটিল হয়, যে জটিল পদ্ধতির মধ্যে গর্ভাশয়ে বেড়ে ওঠে ; তবে দেখা যায় উত্তরাধিকার ও আকৃতির মধ্যে কৌতূহল উদ্রেককর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ভাবাবেগ বা অনুভূতিপ্রবণতার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছেই। বাচ্চা মাকড়শা বাহ্যিক কোন শিক্ষা না নিয়েই স্বভাববশত জাল বুনে যায়। কোকিলের ছানাকে দেখা যায় কাকের বাসায় রেখে বড় করা হচ্ছে। কিন্তু বড় হলেই কোকিলের ছানা ফিরে যাচ্ছে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে। এবং এক সময় এরা দল বেঁধে তাদের বৃদ্ধ পিতামাতারা যেখানে গিয়ে আছে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে মিলিত হচ্ছে। কি করে, কেমন করে যে এরা তাদের খোঁজ পায় আশ্চর্য ব্যাপার! যেন বহুদূরের একটা স্বজাতীয় গন্ধ এদের নাকে ভেসে আসে।

এই যে স্বভাবজ উত্তরাধিকার, এর ব্যাখ্যাই কি? সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের পূর্বপুরুষদের কোষ থেকে বেড়ে ওঠে। এই কোষগুলোর মধ্যে রয়েছে জটিল গঠনশৈলী। আর এই কোষসমূহের কেন্দ্রে রয়েছে—সুতো জাতীয় এক ধরনের ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের রসায়ণ যাকে বলে DNA—(Deoxyribonucleic Acid)। উত্তরাধিকারীয় পার্থক্যের গোপন সূত্র রয়েছে এই ক্রোমোজমগুলির মধ্যে—যাকে বলে জিন। বিভিন্ন জিনের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের গঠনশৈলী। DNA-গুলো রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় একে অপরকে জড়িয়ে প্যাঁচানো দড়ির ভঙ্গীতে। এই প্রত্যেকটি প্যাঁচানো দড়িতে রয়েছে চার ধরনের রসায়ণ adenine, guanine, thymine এবং cytosine. এদের নানাভাবে মিশিয়ে বহু ধরনের রসায়নসত্তা পাওয়া যেতে পারে—যাদের মিশিয়ে অনেকটা সহজতর রসায়ণ মিলতে পারে, যার নাম amino acids—যারা পরস্পর জুড়ে থেকে তৈরি করে এক ধরনের প্রোটিন মলিকুল। প্রোটিন বেশ জটিল রসায়ন, যা থেকেই মূলত তৈরি হয় প্রোটোপ্লাজম এবং এই প্রোটোপ্লাজম এনজাইম রূপে নিজে আবিকৃত থেকে তৈরি করে স্নায়ু-কোষের মধ্যে নানা ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। বর্তমানে যারা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে জীববিজ্ঞান পড়ে তাদের কাছে এ-সব ভালভাবেই জানা। সুতরাং বড় প্রশ্ন যেটা সেটা এই যে, এই রসায়নসত্তাগুলি কি নিজেরাই উত্তরাধিকারসূত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারে? ফুলের আকৃতি আর পতঙ্গের সহজাত অনুভূতি এ-সব কিছুকে কি একমাত্র এই সব রসায়ন দিয়েই ব্যাখ্যা করা চলে? জীব-বিজ্ঞানীরা এর নিশ্চিত কোন জবাব দিতে পারেন নি। না পারার কারণ, প্রাণময় জৈবসত্তাগুলি এতই জটিল যে, তাদের রাসায়নিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান আহরণ করা আজও সম্ভব হয় নি। শুধু রসায়ণ দিয়ে যে এদের ব্যাখ্যা করা

যাবে তেমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। জীবনের পেছনে রয়েছে আরও বিচিত্র রহস্য - যারই মধ্যে রয়েছে রূপশৈলী ও অনুভূতিপ্রবণতার গোপন চাবিকাঠি।

. যারা নাকি একেবারে গোঁড়া জীববিজ্ঞানী তাঁরাও আজ বলতে আরম্ভ করেছেন যে, উত্তরাধিকারের পেছনে রয়েছে রহস্যময় একটা অরাসায়নিক কোনকিছুর খেলাও। স্পষ্ট ভাবে বলতে না পারলেও এরা এর নাম দিয়েছেন 'জেনেটিক প্রোগ্রাম'। সুতরাং ডেফোডিলের আকৃতি আর ড্রাগনফ্লাইয়ের সহজাত অনুভূতি-প্রবণতা এই জৈনিক পদ্ধতি দ্বারাই নির্ধারিত—genetically programmed. কিন্তু এই যে জেনেটিক প্রোগ্রাম সেটাই বা কি?

জেনেটিক প্রোগ্রামকে যদি আমরা কম্পিউটার-প্রোগ্রামের মত মনে ভাবি তাহলে কিন্তু ভুল হবে। কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দিই বাইরে থেকে আমরা—, কিন্তু এই জেনেটিক-প্রোগ্রামের প্রোগ্রামার কে? কট্টর জীবতত্ত্ববিদেরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবেন না যে, জৈবজগতের পেছনে সচেতন কোন সুশৃংখল মানস ক্রিয়াশীল।

জেনেটিক প্রোগ্রাম কি DNA-এর রাসায়নিক গঠনশৈলীর অনরূপ? সেটাও যে জোর দিয়ে বলা যাবে তাও নয়। কারণ, দেহের সব কোষের মধ্যে একই ধরনের DNA রয়েছে—অথচ এক এক ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ'ড়ে উঠে। যদি আমরা নিজেদের হাত আর পা-ই বিচার করি - তা হলে দেখব—উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে একই ধরনের DNA—অথচ কোথাও তা গড়ে উঠেছে হাতরূপে কোথাও পা-রূপে। সুতরাং গর্ভাশয়ের ভ্রূণের মধ্যেই কোথাও রয়ে গেছে একটা রহস্য—যার কিনারা করতে বৈজ্ঞানিকরা আজও অপারগ।

তবু সাধারণ ঐতিহ্যবাহী একটা ব্যাখ্যা তাদের কাছে যা আছে তা এই যে, ভ্রূণের আকৃতি হয় একটা জটিল রাসায়নিক ও জৈব সাংমিশ্রনিক প্রতিক্রিয়ার ফলে। তবে কি ভাবে যে এটা ঘটে তা অজ্ঞাত। তখন যদি এ ধরনের জবাব দেওয়া যায় যে—, এমনতর ঘটে জেনেটিক-প্রোগ্রামের ফলে, তাতেও সমস্যার সমাধান ঘটে না। তখনই প্রশ্ন এসে যায় এই প্রোগ্রামই বা হয় কি করে? এ বিষয়ে বাস্তব ভিত্তিতেই যাঁরা বিচার করেছেন অর্থাৎ বিশেষ প্রকার ভ্রূণতত্ত্ব বিশারদেরা —তাঁরা বলেছেন, এ জন্য দায়ী মরফোজেনেটিক ফিল্ড। এর দ্বারাও যে সব কিছু পরিষ্কার হয় তাতো নয়! এই মরফোজেনেটিক ফিল্ড কি? শব্দটি এসেছে গ্রীক থেকে। Morphe+genesis—Morphe অর্থ—আকৃতি, genesis অর্থ অস্তিত্ব লাভ করা। ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে বড়জোর আমরা একে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ম্যাগনেটিক ফিল্ড অদৃশ্য হলেও এর একটা আকৃতি আছে। এই ফিল্ডের স্বরূপ বোঝা যাবে তখনই যখন এর চতুর্দিকে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। তখন এই লৌহচূর্ণ-গুলি যে রূপ নেবে তা থেকেই ধারণা করা যাবে যে, ফিল্ডের চরিত্র কি ধরনের। এই যে রূপক্ষেত্র (রূপ প্রস্তুতকারক ক্ষেত্র) এই ক্ষেত্র জৈবকোষ ও স্নায়ু-

গুলিকে ঠিকঠাক করে একটা রূপ দেয়। ভ্রূণের হাত হয় বাহুতৈরিকারক মরফোজেনেটিক ফিল্ডের জন্য। পা হয় পা-তৈরিকারক ফিল্ডের প্রভাবে। দেশে (space) কোন ধরনের শক্তির অবস্থা তৈরি হলেই সেখানে একটা আলোড়নের ভাব তৈরি হয়, পাশাপাশি অনুরূপ একটা ভাব তৈরি হলেই দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম অবস্থার আকর্ষী বৃত্তের মধ্যে পড়ে যায়। এর মধ্যেই থাকে শক্তিবিকিরণ করণের একটা মৌল অবস্থা। একেই বলা হয় ফিল্ড বা ক্ষেত্র। খুব হিসেব করলে দেখা যায়, আসলে কিছুই থাকেনা। 'কিছু-না' থেকেই 'কিছু' হয়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় ধরতে গেলে আসলে কিছুই নেই। 'কিছু-নেই' থেকেই হয় 'কিছু'। অর্থাৎ 'না' থেকে 'হা' হয়। এ যেন আগুন ও তার গুণ। আগুণ-কে যদি তার গুণ ছাড়া দেখা যায়—তা হলে তাকে একটা অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু ভাবা যাবে না। আবার গুণকে যদি ধরা যায়—তাহলে অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে। ব্যাপারটা হল 'হা' হলেই 'না' হবে, 'না' হলেই 'হা' হবে। এটাই স্বতসিদ্ধ ব্যাপার। এই ফিল্ডের পূর্বাবস্থা 'না'। 'না'-এর গুণ 'হা'। আবার 'হা'-এর যথার্থ ভিত্তি 'না'। যেমন অন্ধকার ছাড়া আলো হবেনা, আবার আলো ছাড়া অন্ধকারকে কল্পনার মধ্যেই আনা যাবে না। ফলে রেজাল্ট দাঁড়ায় যা 'অন্ধকার' তাইই 'আলো'। একে অপরের শর্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং সৃষ্টি হলেই লয় আছে, লয় হলেই সৃষ্টি আছে। মৃত্যু (নিস্তব্ধতা) হলেই জীবন আছে আবার জীবন হলেই মৃত্যু আছে। সৃষ্টির আদ্যাবস্থা মৃত্যু। মৃত্যুর আদ্যাবস্থা সৃষ্টি। ঈশ্বরের আদ্যাবস্থা শান্তি—শান্তির আদ্যাবস্থা স্পন্দন। সময় হল স্পন্দন। সময়ের মধ্যে একটি মাত্র স্থায়ী মুহূর্ত হল ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত যাকে আর ভাগই করা যাবে না। সময়ের ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত হল প্রায়-নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতার ক্ষুদ্রতম মাত্রা সময়। এই জন্য চণ্ডীতে সময়কে বলা হয়েছে কাষ্ঠি সময়—অর্থাৎ আমাদের ঘড়ির কাঁটার এক সেকেণ্ডকে এগার লক্ষ ভাগে ভাগ করলে যে সময়টুকু দাঁড়ায়—তাই ক্ষুদ্রতম সময়। তারই মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ইত্যাদি ঘটে। সুতরাং ক্ষেত্রের মূলে রয়েছে 'না-ক্ষেত্র', 'না-ক্ষেত্রের' মূলে ক্ষেত্র !

এই গভীরতর তত্ত্ব বাদ দিলে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তা এই রকম :—তাঁদের প্রশ্ন, এই ফিল্ড বা ক্ষেত্র কি ? কোথা থেকেই বা তার উদয় হয় ? গত পঞ্চাশ বছর এর উপর নিবিড় ভাবে চিন্তা করেও বৈজ্ঞানিকরা যে এর যথার্থ কোন হদিশ পেয়েছেন, তা নয়। তাঁরা শুধু এইমাত্র বুঝতে পেরেছেন যে, চৌম্বক ও মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মত একটি ক্ষেত্র আছে। তবে এই ক্ষেত্র একটু অভিনব ক্ষেত্র। এর উপাদানগুলিও বিশেষ ধরনের। পদার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রের মত দেশের বুকে তারা সমান ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এই সংযোগের জন্য আপাতদৃষ্টিতে কোন সূত্রের প্রয়োজন নেই। এই দেশজ সংযোগ ছাড়া তারা সময়ের বুক ধরেও যোগাযোগ স্থাপন করে। যোগাযোগের সঙ্গে যদি সময়ের মাত্রা যুক্ত হয় তাহলে প্রাক্তন একটা অবস্থা দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রাণ,

মন জ্ঞান সবই একটা পূর্বপ্রাণ, মন ও জ্ঞান থেকে আসে। সেই জন্যই বৈজ্ঞানিকরা ধরে নিয়েছেন যে—, যে মরফোজেনেটিক ফিল্ড থেকে প্রাণী-জগতের আকৃতি নির্ধারিত হয়—তা আসে পূর্বতন অনুরূপ প্রাণ থেকে। যে পদ্ধতিতে এই কাজ হয় একে বলে 'মরফিক রিজোনেন্স' অর্থাৎ মৌল আকৃতি-উদ্ভূত তরঙ্গ। এই ক্ষেত্র পশুর ক্ষেত্রে পাশবিকক্ষেত্র মানুষের ক্ষেত্রে মানবিকক্ষেত্র, বৃক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভিদক্ষেত্র। আদ্যা যে একটা স্মৃতিসঞ্চয়কেন্দ্র অর্থাৎ memory bank বা সঞ্চিত স্মৃতিক্ষেত্র অর্থাৎ pooled memory আছে—বিশেষ বিশেষ প্রাণের উদ্ভব সেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র থেকেই হয়। বিজ্ঞান যখন এর বেশি আর এগুতে পারেনি মরমিয়ারা তখন আরো বেশি এগিয়েছেন। তারা বৈচিত্র্যহীন এক মৌল ক্ষেত্রের সন্ধান জেনেছেন যার নাম মহাশূন্যতা। ধ্যানযোগে যখন সেই মহাশূন্যতাতে তারা চিৎশক্তিকে লুপ্ত করে দিতে পারেন তখন ফিরে এসে দেখেন—কিছুই আর তার কাছে অজ্ঞাত নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁরা বুঝতে পারেন—মহাশূন্যতাই পূর্ণতা। পূর্ণতাই মহাশূন্যতা। যখন এই ভ্রান্তি অর্থাৎ ঘোর দূর হয়—তখনই ভারতীয় সাধক অঘোরপন্থী হন। এই অঘোরপন্থাকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা—অঘরোরান্যোপরমন্ত্র—অঘোর মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নেই। আর এই মন্ত্রের মূল সূত্র হল কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ—অর্থাৎ দেহের শক্তিমাত্রার বৃদ্ধি।

কিন্তু মরমিয়াদের দর্শন নিয়ে যতই ভাবা যাক না কেন, সাধারণকে তা বোঝানো যাবে না। বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেই হবে। সৃষ্টির মৌল ক্ষেত্র যা-ই হোক না কেন--একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, স্থূলপ্রাণী হিসেবে যখন তার আবির্ভাব হয়েছে—তখন তার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বর্ণ সবই প্রভাবিত হয়েছে জিন নামে জৈব ক্ষুদ্রতম মৌলসত্তা থেকে। আর এই জিনগুলি আহরিত অভিজ্ঞতার প্রভাবে নিজেরাও প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের মধ্যে এসে বর্তায়। ক্রমশঃ অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি উত্তরপুরুষদের মধ্যে দ্রুত ভাবে প্রকটিত হতে থাকে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন একটা ক্রমবিকাশের পথ ধরেই আসে। এই ক্রমবিকাশের নীতি গ্রহণ করেই ডারউইন তাঁর জীব জগতের বিচিত্র অভিব্যক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। যার ফলে জগতের বিচিত্র প্রাণী ক্রমবিকাশের পথে প্রয়োজনের চাপে পড়ে বিচিত্রতর রূপ ধারণ করেছে—সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক একটি আকৃতি নিয়ে এক একটি প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে বাইবেলের এই তথ্য অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের তত্ত্বই কি নির্ভেজাল সত্য?

ডারউইন যে ক্রমবিকাশের তত্ত্ব দিয়েছেন তা জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রাচীন ধারণার ঠিক বিপরীত চিন্তা। প্রাণীজগৎ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ছিল অ্যারিস্টটলিয় ধারণার অনুরূপ অর্থাৎ জগতের যত বিভিন্ন প্রাণী দেখা যায় তারা চিরকালই বিভিন্নরূপে সৃষ্ট। কোন মূল প্রাণপ্রবাহ থেকে ধীরে ধীরে

...াণের বেঁচে থাকার তাগিদে রূপ পরিবর্তন করে এমন বিচিত্রতর হয় নি। কিন্তু ডারউইনের এই তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছে। আজও যারা বাইবেল-বিশ্বাসে মৌলবাদী তারা ডারউইনের ক্রমঅভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা একে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তবে যাঁরা ডারউইনের তত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নি তাঁরা প্রশ্ন করেন, কেন প্রাণীর রূপান্তর হয়েছে, এবং কি ভাবেই বা তা হয়েছে? এ-ব্যাপারে ডারউইন যে গ্রন্থ রচনা করে এ সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন সেই গ্রন্থের নাম —On The Origin Of Species By Means Of Natural Selection Or The Preservation Of Favoured Races In The Struggle for Life.

আদি প্রাণী কি ভাবে পরিবর্তিত হতে হতে পরিবর্তনের সূত্র ধরে মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভূস্তর থেকে নানা ধরনের ফসিল বিচার করে ডারউইন তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই ফসিলগুলি বিচার করলে সত্যি সত্যি বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অবাক হতে হয়। পাখির ডানা আর মানুষের বাহুর মধ্যেই যদি এ ব্যাপারে একটা তুলনামূলক ছবি তুলে ধরা যায় তাই যথেষ্ট অবাক করে দেবার মত।

এই ফসিলগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ পরবর্তী প্রাণীদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যেমন, ধরা যাক ডাইনোসর জাতীয় বিরাটকায় প্রাণী। কিন্তু যারা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পেরেছে তারাই বেঁচে আছে। 'অনেকেই আবার বাঁচার তাগিদে রূপই পরিবর্তন করে নিয়েছে' ফরাসী দার্শনিক ল্যামার্ক এই তত্ত্বই প্রবল করে তুলে ধরেছেন। প্রাণীজগতের রূপ পরিবর্তন ধীরে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য হয়েছে।

দ্বিতীয়ত cross-breeding-এর ফলেও বহু নতুনতর রূপের প্রকাশ ঘটেছে। ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যের পক্ষে এও একটি বড় ঘটনা। তৃতীয়ত ক্রমবিকাশের মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় বিশেষ কোন জাতের প্রাণীর মধ্যে যে রূপান্তর ঘটে, সে জন্য ভৌগোলিক পরিবেশও অনেকাংশে দায়ী। আবহাওয়া ও খাদ্যের ধারা পাল্টালেই বিশেষ কোন শ্রেণীর প্রাণীর দৈহিক রূপান্তর ঘটে যেতে পারে।

সর্বশেষে পশু-জগৎ অরণ্য-জগৎ সর্বত্রই নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রত্যেকেই কোন একটি মূল ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। মানুষের গঠনপ্রণালী বিচার করলে বাঁদর জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এদের সূত্র আবার অন্য কোন স্তন্য-পায়ী পশুর মধ্যে পাওয়া যাবে। একটা মূল ক্ষেত্র থেকে যে বিচিত্র ধারায় নানা বৈচিত্র্য নিয়ে প্রাণীজগৎ ফুটে উঠেছে—প্রাণীজগতের গঠনপ্রণালী

বিশ্লেষণ করতে করতে এগুতে থাকলে সে কথাই মনে হবে।

ডারউইনের এই ক্রমবিকাশ তত্ত্ব যদি নেওয়া না যায় তাহলে ভাবতে হবে যে, প্রাণহীন কোন জড় পদার্থ থেকে ধাপে ধাপে কেউ নানা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। কখনও কখনও এই সৃষ্টিযজ্ঞে এক প্রাণীর সঙ্গে অপর প্রাণীর একটা সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। তবে যারা ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট, প্রাণ সৃষ্ট একথা মনে করেন, তাঁরা এমনতর ভাবনাতেও অবিশ্বাস প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। তবে একটু হিসেব নিলেই দেখা যাবে যে, ক্রমবিকাশবাদ ও এই ধরনের সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে খুব একটা বিবাদের অবসরও নেই।

পদার্থবিদেরা ভাবেন যে, দেশের কেন্দ্রস্থলে ঘনীভূত হয়ে থাকা বস্তুপুঞ্জের মধ্যে তীব্র বিস্ফোরণের ফলেই বিশ্বপ্রকৃতির উদয় হয়েছিল। ধীরে ধীরে বিশ্ব শীতল হয়ে উঠলে তাপদীপ্ত প্লাজমা এবং গ্যাসীয় মেঘ থেকে অণু-পরমাণু ও ছায়াপথ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্রতর পদার্থিক সত্তাগুলি নক্ষত্র-সমূহের মাধ্যাকর্ষী অভিকর্ষে পড়ে গ্রহাদির আকারে এদের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। তেমনই একটি গ্রহ হল আমাদের পৃথিবী। এই গ্রহও এক সময় ছিল গ্যাসীয়। ঠাণ্ডা হবার পর জলীয় বাষ্প সমুদ্র সৃষ্টি করে। প্রাণের সূত্রপাত হয় এই জলেই। প্রথম প্রকাশ পায় উদ্ভিদজাতীয় প্রাণ যারা সূর্যের আলো থেকে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। পশুপ্রাণের উদ্ভবও জলেই হয় প্রথম, পরে ডাঙ্গায় উঠে আসে। এরাই গড়ে তোলে মৃত্তিকার প্রাণী—পশু পাখি পতঙ্গের জগৎ। ধীরে ধীরে উদ্ভব হয় মানুষের।

বাইবেলের সৃষ্টি-পর্বও যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে ঃ—প্রথম ছিল অন্ধকার, অন্ধকার থেকে আসে আলো। এই আলো এসেছে বস্তুর সূক্ষ্মতম সত্তা থেকে। এরপর আকাশ থেকে (গ্যাসীয় অবস্থা থেকে) পৃথিবীর উদয় হয়। পরে হয় জল এবং স্থলের আবির্ভাব। তার পর উদ্ভিদ, তারপর জলে প্রাণের অভ্যুদয়। জলের পর স্থলে প্রাণের বিকাশ। সবশেষে মানুষের আত্মপ্রকাশ। পার্থক্যটা শুধু সময়ের হিসেবে। বিজ্ঞানের মতে এই ক্রমবিকাশে সময় নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর। বাইবেলের মতে স্তরে স্তরে বিভিন্ন দিনে। তবে 'দিন' অর্থ এখানে ২৪ ঘণ্টার দিন নয়। 'দিন' এখানে একটি যুগ। এদিক থেকে দেখতে গেলে বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বের ধারার মধ্যে ফারাক খুব কমই। 'দিন' শব্দটি নিয়ে যে ধাঁধা সেটা মিটে যাবে এইটুকু ভাবলেই, সূর্যের উদয় অস্ত দিয়ে আমরা যে দিনের বিচার করি, সে দিন নয়—কারণ তখন সূর্যেরও তো জন্ম হয়নি। বাইবেলের মতে সূর্য ও চন্দ্রের উদয় হয়েছিল চতুর্থ দিনে—অর্থাৎ চতুর্থ পর্যায়ে। এই এক একটি পর্যায়ের বয়েস কত এমনতর অনুমান করা দায়। তাছাড়া বাইবেল স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের হিসাব করা দিন আর এ দিন এক নয়। মানুষের একদিন ঈশ্বরের হাজার বৎসর। এমন তর চিন্তা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তেও আছে।

আর আমাদের পুরাণগ্রন্থে ব্রহ্মার একদিন এবং আমাদের এক দিনের মধ্যে বাইবেলের অনুরূপ পার্থক্যই তো দেখানো হয়েছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ যে ক্রমবিকাশতত্ত্ব অস্বীকার করেছে তাতো নয়! ভারতীয়েরা তো ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর মানবজাতির প্রকাশ এই কথাই বলেছে।)

তবে বিরোধ দেখা দিয়েছে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব নিয়ে। নতুন প্রজাতির উদ্ভব কি ক্রমবিকাশের পথে হয়েছে না হঠাৎ হঠাৎই এক একটি প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে? একদল মনে করেন বিচিত্র প্রাণের উদ্ভব ধীরে ধীরে - যার নাম দিয়েছেন তাঁরা gradualism. আর একদলের অভিমত বিচিত্র প্রাণীজগতের উদ্ভব হয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে যার নাম punctuationalism.

ডারউইন gradualism-এর প্রবক্তা, নবডারউইনপন্থীরাও ঐ একই তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বে বিশ্বাসস্থাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে দার্শনিক মনস্কতাই বেশি কাজ করেছে। ডারউইনের এই তত্ত্ব বাইবেলবাদীরাও যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তা নয়। তারা মনে করেন, জড় পদার্থ থেকে যেমন ঈশ্বর প্রাণী তৈরি করেছেন আবার প্রাণীজগতের মধ্যেও অনেক রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এদের মতে ঈশ্বর জীবজগতকে ক্রমবিকাশের পথে প্রতিনিয়তই পরিচালিত করছেন, নতুন নতুন আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন। এদের তত্ত্বের স্বপক্ষে একটি কথাই বলা হয়—অন্ধ প্রাণশক্তি যদি প্রয়োজনের তাগিদে পূর্ববর্তী কোন প্রাণী থেকে পরবর্তী প্রাণীরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে তবে পূর্বতন প্রাণীও কেন স্বরূপেই বেঁচে থাকবে—যেমন, বাঁদর থেকেই যদি মানুষের উদ্ভব হয় তাহলে বাঁদর আর টিকে আছে কেন? তাহলে তো বাঁদরের এতদিন থাকারই কথা নয়। তবে বিজ্ঞানবাদীদের বক্তব্য এই যে, কোথাও কোথাও প্রয়োজনের তাগিদে বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব হলেও সর্বত্রই সে প্রয়োজন দেখা দেয়নি বলে বাঁদর বাঁদরই থেকে গেছে। যেমন, লামার্কের মতে ঘোড়াজাতীয় প্রাণী ঊর্ধ্বে বৃক্ষপত্র সেবনের প্রয়োজনে প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে তার গ্রীবা দীর্ঘতর করে উট হয়েছে। আবার যেখানে সে প্রয়োজন বোধ করেনি সেখানে ঘোড়া হিসেবেই থেকে গেছে। তবে এটাও ভাবার বিষয় যে, যে মরুভূমিতে উটের বিকাশ সেই মরুভূমিতে এখনও ঘোড়াও রয়েছে। সেইজন্য মনে হয় অকস্মাৎ কোথাও পরিবর্তন ঘটে গেছে।)

ফলে একটা জিনিস বলা যায় যে, যারা মনে করেন, ঈশ্বর হঠাৎ হঠাৎ এক একটি প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের পক্ষেও ক্রমঅভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করতে খুব একটা অসুবিধা নেই। অপরপক্ষে যারা ক্রমঅভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী তারাও কোথাও কোথাও আকস্মিক নতুন প্রজাতির উদ্ভবে বিশ্বাস করলেও তা তেমন দোষাবহ হবে না। একটু যদি সহ্যশক্তি দেখানো যায়—তাহলে দুয়ের মধ্যে একটা মিলন-ক্ষেত্রও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এরকম যাঁরা ভাবেন, তাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ব

সৃষ্টি করার পর বিশ্ব পরিচালনা করার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়মকানুন তৈরি করেন। সেই নিয়মের মধ্যে থেকে জিনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নয়। ফলে এতে ক্রমবিকাশবাদ একপ্রকার স্বীকৃতিই পেয়ে যায়। অপর পক্ষে বাস্তববাদীরাও ক্রমবিকাশকে বহুক্ষেত্রেই নতুন নতুন প্রজাতির ক্ষেত্রে আকস্মিক আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দুয়ের মধ্যে খুব যে একটা পার্থক্য আছে তা নয়। পার্থক্য শুধু এই ক্ষেত্রে যে, যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা মনে করেন, এ সব তাঁরই সৃষ্টি—আর যাঁরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন —এসব নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা, এর পেছনে কোন বৃহৎ মানসের সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেই।

ক্রমবিকাশবাদের পক্ষে ডারউইনপন্থীদের বিরাট একটা প্রমাণ—নানা ধরনের জন্তুজানোয়ার নিয়ে যে ক্রশব্রীডিং সেই ক্রশব্রীডিং। এর ফলে উন্নতমানের প্রাণী সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়েছে। এইভাবেই পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে এমন নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা হয়েছে প্রকৃতির নিজস্ব নির্বাচনের মাধ্যমে।

কিন্তু বিতর্ক যা নিয়ে—সেটা ক্রশব্রীডিং-এর ফলে নতুন প্রাণীর জন্ম নিয়ে নয়—প্রাণের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছে তাই নিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডারউইন তাঁর Origin Of Species গ্রন্থে এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, একই পদ্ধতিতে চলতে চলতে কালক্রমে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একটা রূপান্তর ঘটেই যায়। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের বক্তব্য, এরকম ঘটনা সবক্ষেত্রেই যে ঘটে—তাতো নয়! অনেকক্ষেত্রে রূপান্তরের ঘটনাটি অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত গতিতে ঘটে যায়। মানুষের সচেষ্ট প্রয়াসের সাহায্যে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় পোষা জন্তু-জানোয়ারের রূপান্তর ঘটাতে বেশ সময় লাগছে—, আবার কোথাও অকস্মাৎ অদ্ভুত রকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। বৃক্ষাদির মধ্যেও সচেতন প্রয়াসে যেখানে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে অকস্মাৎ হয়তো কোন ফলগাছে নতুন ধরনের একটা কাণ্ড বেরিয়ে পড়ল। আর এই নতুন ধরন থেকেই নতুন এক প্রজাতির জন্ম হল। তখনই শুধুমাত্র একটা যান্ত্রিক ধারায় এই বিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এমন ভাবতে কেমন দ্বিধা বোধ হয়। এই যে প্রজাতির রূপ পরিবর্তন, এর মধ্যে ক্রোমোজমের এক বিচিত্র ধরনের আকস্মিকতার লীলা চলেছে —যা নাকি প্রজাতির মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সদম্ভ দাবিকে কৌতুকাবহ উপেক্ষায় অবজ্ঞা করে চলেছে। এখন জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে যে বিতর্ক চলেছে, তাতে—একদলের দাবি—প্রজাতির রূপপরিবর্তনে আকস্মিকতার ভূমিকা তেমন একটা কিছু নয়। আরেক দলের মতে, কিছু নয়, কিছু নয় বলা হলেও—এই আকস্মিকতার ভূমিকাই প্রাণপ্রবাহের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বড় কথা—অন্ততঃ এখন পর্যন্ত যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুত দ্বিতীয় অভিমতের দিকেই সাক্ষ্যের পাল্লা ভারি দেখা যাচ্ছে একথা অন্ততঃ আজ পর্যন্ত

স্বীকার করতেই হবে। আর এই ধরনের সাক্ষ্য বস্তুবাদীদের অনেকটা অসুবিধার মধ্যে যে ফেলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

নবডারউইনপন্থীরা মনে করেন যে, ক্রমবিকাশ সৃজনশীলতার অন্ধ একটা আকস্মিকতার ফলেই হয়। হয়তো এখানে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা প্রচেষ্টাও থাকে। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে যে প্রাণপ্রবাহ এমন করে এগুচ্ছে তা নয়, কোন একটা বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে যে জীবন-প্রবাহের এই গতি চলেছে তাও নয়। সবটাই বেঁচে থাকার জন্য এবং স্বাভাবিক নবসৃষ্টির প্রয়োজনে।

তবে চারটি বিশেষ কারণে এ ধরনের বিশ্বাসকে যে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যাচ্ছে—তাও নয়, যেমন, প্রথমত, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, নতুন ধরনের প্রজাতি ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ধারা বেয়ে রূপান্তরের মধ্যে এসেছে। এর মধ্যে আকস্মিক একটা উল্লম্ফনকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অন্ততঃ এ পর্যন্ত যত সব ফসিল পাওয়া গেছে তাতে অপ্রতিহত ধারাবাহিকতার নমুনা আমাদের হাতে আসেনি।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যই যদি পরিবর্তন হত, তাহলে কোন বিশেষ পরিবেশে একই ধরনের উদ্ভিজ্জ চরিত্র বা পশুচরিত্র দেখা যেত। কিন্তু সেরকম তো লক্ষ্য করা যায় না! পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেও অনেক উদ্ভিদ বা পশু-প্রাণকে দেখা যাচ্ছে দিব্যি টিকে আছে। সুতরাং সবটাই যে প্রাণের বাঁচার তাগিদে প্রাকৃতিক নির্বাচন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে কোথায়?

তৃতীয়ত, জিনের জন্য যে উত্তরাধিকারীয় প্রবৃত্তি বা আকৃতি দেখা দেয় এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। মহাপ্রাচীন অতীতের চরিত্রও বংশের ধারার মধ্যে এসে যেতে পারে। এবং তার উৎস রয়েছে সূক্ষ্ম একটি জৈনিক ক্ষেত্রে যেখানে সার্বিক একটা প্রজাতিচেতনা দেশের বুকে বক্র কোন স্থানে একটা থলের মত পাত্রে জমে আছে—যার নাম দিয়েছেন এঁরা morphogenetic field যদি এই আদি সঞ্চয়ক্ষেত্র থেকে চারিত্রিক বা আকৃতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায় তাহলে ধারাবাহিকতার প্রশ্নটা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়—এজন্য জিনের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ DNA-এর ভূমিকা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, নবডারউইনপন্থীরা প্রাণবৈচিত্র্যের সবটাই একটা যান্ত্রিক ধারা বলে মনে করেন। রসায়ণ ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকানুন দ্বারাই প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং—টেলিপ্যাথি, পূর্বাভাষ, আত্মাশক্তি, এই সব অধি-স্বাভাবিক ঘটনাকে তাঁরা স্বীকৃতি দিতে চান না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এটা যে মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে এমন কোন অস্ত্র হাতে সংগ্রহ না করেই তাঁরা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কখনও কখনও অতীন্দ্রিয়শক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবার

জন্যও তাঁরা এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাহলে তো বাস্তব চিকিৎসা-বিজ্ঞানকেও অস্বীকার করতে হয়! কারণ একই রোগের ক্ষেত্রে একই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করেও তো সব রুগীকে বাঁচানো যায় না! তাহলে বাস্তব চিকিৎসাশাস্ত্রেরই বা কী সত্যতা রয়েছে? যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না—তাই-ই যদি সত্য না হয় তাহলে জড়বস্তু থেকে প্রাণের অভ্যুদয় কি ভাবে হয়েছে একথা কি কেউ বলতে পেরেছে? বলতে পারে নি বলে প্রাণের অভ্যুদয় কি মিথ্যা? শংকরাচার্যের অভিমতটি'ই মেনে নিতে হবে—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা?)

একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অদ্যাবধি আমরা বস্তু ও শক্তির মৌল ব্যাপারটা কি, বস্তুবিজ্ঞানের তরফ থেকে সবটাই তার জানতে পারিনি। এই যে এখন মরফোজেনেটিক একটা ফিল্ডের কথা আসছে সেটা যদি সত্যি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে দেশ (space) ও সময়ের বুকে বস্তুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নবচিন্তার উন্মোচন করতে হবেই। তাতে বস্তুতান্ত্রিক যান্ত্রিকতার তত্ত্ব নাও দাঁড়াতে পারে।

যন্ত্রের সঙ্গে কোষাশ্রয়ী জীবের অনেক ক্ষেত্রে মিল দেখে বস্তুবাদিরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জীবনও একটা যান্ত্রিকপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন জীবের চোখকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং মস্তিষ্ক-স্নায়ুকে তুলনা করা যেতে পারে কম্পিউটারের সঙ্গে। এরকম একটা মিল থাকা সত্ত্বেও একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, জীবও মেশিন মাত্র।

যন্ত্র ও কোষাশ্রয়ী জীব উভয়েরই একটি লক্ষ্যমাত্রা আছে। যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয় মানুষ। কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে কে তার লক্ষ্য-মাত্রা ঠিক করে? বাস্তুবাদীরা মনে করেন, জীবের লক্ষ্যমাত্রা কেউ ঠিক করে দেয় না। আকস্মিক যোগাযোগ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই এ-সব ঠিক হয়।)

বাস্তববাদীদের বক্তব্য হল এই যে, জীবকোষগুলিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার সূত্রই সেখানে কাজ করছে। কিন্তু তাদের যান্ত্রিকতা-তত্ত্ব প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্নে এসেই ঠোক্কর খেয়েছে।

আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবনের অভ্যুদয় হয় আদি এক ধরনের তরল সূপ জাতীয় রসায়নের মধ্যে। এই রসায়নের মধ্যে ছিল অ্যামিনো-অ্যাসিডজাতীয় জিনিষ। চতুর্দিকে আবহাওয়ার মধ্যে যে বাষ্পীয় পরিমণ্ডল ছিল তার উপর বজ্রপাতের ফলেই উপরোক্ত তারলিক রসায়নের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু এই বাষ্পীয় অবস্থার পূর্বে কি ছিল—সে সম্পর্কে আমাদের তেমন কোন জ্ঞান নেই। হয় তো বিশ্বজগতের অন্যকোথাও এই প্রাণের স্ফুরণ ঘটেছিল—যেথান থেকেই পৃথিবীর বুকে প্রাণের বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। এই নিক্ষেপণও কি আকস্মিক ব্যাপার? না কোন সুপরিকল্পিত মননের

ফল। সে কথা বলার কোন উপায় নেই, অন্ততঃ বস্তুবিজ্ঞানের বিশ্লেষী বিচারে।

ধরা যাক—প্রথম জীবকোষের উৎপত্তি হয়েছিল প্রাণহীন কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান থেকে। জৈবকোষে এমন কিছু নেই যে-উপাদান জড়বস্তুতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানের পারস্পরিক যোগেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, ঠিক যেমন লেবু ও সোডার সংমিশ্রণে বুদ্বুদ ওঠে। কিন্তু এত সত্ত্বেও রাসায়নিক উপাদান দিয়ে যে প্রাণের পূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে তা নয়। যন্ত্রাংশ দিয়ে রোবট তৈরি করা হলেও রোবট ও মানুষ ঠিক এক নয়। রোবট মানুষের তৈরি করা পরিকল্পনার বাইরে কাজ করতে পারবে কি?

তর্কবিতর্কের বাইরেও যান্ত্রিকতার তত্ত্ব—জীববিজ্ঞানের মূলকেন্দ্রের যে সমস্যা, তা ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রচুর বিশ্লেষণের পরে আজও জানা যায়নি কেমন করে বিভিন্ন ধরনের পশুপ্রজাতি ও উদ্ভিদ বিভিন্ন আকার নিয়ে ফুটে ওঠে। গাছের জিনের প্যাটার্ণ মানুষের জৈনিক প্যাটার্নের সঙ্গে এক হলেও গাছের বীজ থেকে কেন মানুষ জন্ম নেয় না। এক ধরনের চ্যাপ্টা জাতীয় পোকা আছে যাদের গাঁটে গাঁটে টুকরো টুকরো করে কাটলেও সেই অংশগুলি থেকে আবার পূর্ণ পোকা রূপ নেয়। টিকটিকির লেজ খসে গেলেও সেখানে আবার নতুন লেজ গজায় কি করে? অথচ মানুষ বা পশুর কোন প্রত্যঙ্গ খোয়া গেলে সেখানে তো আপনা আপনিই নতুন প্রত্যঙ্গ গজায় না?

যন্ত্রতত্ত্ববিদদের জবাব হল এই যে, বর্তমানে রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার সাহায্যে এটা ব্যাখ্যা করা যায়না বটে, তবে ভবিষ্যতেও যে যাবে না এমন নয়। রাসায়ন ও পদার্থবিদ্যাকে তার নিবিড় জটিলতা থেকে একদিন মুক্ত করা যাবেই এবং এ থেকেই প্রাণের উৎপত্তির বস্তুভিত্তিক জবাব পাওয়া যাবে। এখানে কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য অপেক্ষা অনুমান বা বিশ্বাসই নির্ভর। তাহলে যারা বলেন, ঈশ্বরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের অনুমান বা বিশ্বাসকেই বা কি ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? তবু বস্তুবাদীদের এই ত্রুটি সত্ত্বেও ক্রমবিকাশ-বাদকে যে উড়িয়ে দেওয়া যাবে বা উড়িয়ে দেওয়া উচিত তা কিন্তু নয়। একটা ব্যাখ্যাতীত শক্তির ক্রমবিকাশ যে সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল তা স্বীকার করতেই হবে। এবং এও স্বীকার করতে হবে যে, এই শক্তিও রাতারাতিই বর্তমান জীবনের স্তরে লাফিয়ে উঠে আসেনি। আর এই অভিব্যক্তি যে আকস্মিক কোন যোগাযোগের ফলে গড়ে উঠেছে—তাও নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়।

সমুদ্রের নিচে প্রবাল একই পরিবেশে গড়ে উঠলেও এটাতো একটা ভাববার বিষয় যে, তাদের সবারই রঙ এক নয়! প্রথম সূর্যমুখী ফুলের জন্মই বা হয়েছিল কি ভাবে? মাকরশা তার বুননের অভ্যাসই বা আরম্ভ করে কি ভাবে? আর পাখির উড়তে শেখার পেছনের রহস্যই বা কি? এ ধরনের অজস্র প্রশ্ন করা যায়—বিজ্ঞানে যার কোন জবাব নেই। লক্ষ লক্ষ নানা ধরনের উদ্ভিদও আছে, কীটপতঙ্গও আছে। প্রাণের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের যথার্থ সূত্রপাত কেন—একথা কি

কেউ জোর দিয়ে বলতে পেরেছে ? প্রথম প্রাণী সৃষ্টি হবার পর—না হয় তার বিবর্তনের ইতিহাস দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রজাপতির উৎপত্তির জবাব কোথায় ?

(প্রাণবৈচিত্র্যের ইতিহাস খুঁজতে গেলে এটা হয়তো দেখা যাবে যে, বহু পুনরাবৃত্তি তার মধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু প্রথম প্রাণের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল তা আজও বলা সম্ভব নয়। প্রথম প্রজাতি, প্রথম দেহগঠনশৈলীর উদ্ভব, অনুভব-প্রবণতা এর কোন জবাব কোনদিনই পাওয়া যাবে কিনা তা বলা সত্যিই দুরূহ। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করতে পারে, কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু সৃষ্টিরহস্যের মূল চাবিকাঠি কোথায় তারা তা ধরতে পারেনি। মানুষের সৃজনশীল মানসিকতার উৎসও রহস্যাবৃত। আজ পৃথিবীতে কত ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ছড়াছড়ি। একদিন কিন্তু এ-সব কিছুই ছিল না। মানুষ এ-সবের কথা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু কোন নতুন আবিষ্কার দেখা দিলে তার অনুকরণ মোটেই দুঃসাধ্য থাকেনি। অজস্র অনুরূপ যন্ত্র দেখা দিয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির মূল উৎসকে এই পুনরাবৃত্তির ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। একে ধরতে গেলে বিজ্ঞান ছেড়ে দর্শন নিয়ে পড়তে হবে।)

মানুষের এই যে দার্শনিকতা তা চারটি স্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই এসেছে বস্তুবাদী দার্শনিকতা। বস্তুবাদী দর্শনে মনে করা হয় যে, বস্তু চিরন্তন সত্তা; এবং সবকিছুকেই বস্তু ও গতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। নবডারউইনপন্থীদের ক্রমবিকাশবাদতত্ত্বের পেছনে এই তত্ত্বই কাজ করে। মলিকুলার বায়োলজিস্ট Jacques Monod তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Chance And Necessity'-তে অনুরূপ বক্তব্য খুব জোরের সঙ্গেই রাখবার চেষ্টা করেছেন।

উনবিংশ শতকে এই বস্তুবাদীব্যাখ্যা নির্দ্বিধায় অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছিল, কারণ, তখন বস্তুকে ঘনীভূত বাস্তব অণু দিয়ে গঠিত বলে মনে করা হত। অণু সম্পর্কে ধারণা ছিল, এগুলো বিলিয়ার্ড বলের মত বস্তু-সত্তা-ময়। পদার্থবিদ্যার নিয়মকানুন অনুযায়ীই তা চলে। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যা এত সহজ ধারণাকে ন্যস্যাৎ করে দিয়েছে। অণু এখন পরমাণু ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে কোন বস্তুসাত্ত্বিক একক বলে আর ধরা হয় না। বরং অক্লান্ত স্পন্দনে স্পন্দিত শক্তি বলে ভাবা হয় ($E=Mc^2$)। পদার্থবিদ্যার জগৎ এখন যে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন তা নয়। সর্বত্রই একটা অনিশ্চয়তা ধরা পড়েছে। সুতরাং বস্তুবাদের ভিত্তিভূমিই দুর্বল হয়ে গেছে। বস্তু যে আসলে কি? কেমন করে চলে? তা স্পষ্ট করে বলাই কঠিন। তবু যারা কট্টর বস্তুবাদী তাঁরা আজও মনে করেন, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, অধ্যাত্মশক্তি বলে কিছু নেই। বস্তু ও

গতিই সব। মানুষের মননশক্তির উদ্ভবও মস্তিষ্কস্নায়ুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। মানুষের ব্যবহারের উপর মনের কোন প্রভাব নেই, বরং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে মানুষের মস্তিস্কস্নায়ুতে যে প্রবাহ সৃষ্টি হয় তারই ফলে মন নামক একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনের কোন পদার্থিক ও রাসায়নিক ব্যাখ্যা চলেনা বলে এর অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না।

যেহেতু বস্তুবাদীরা অবাস্তবিক কোন অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই হোক বা মানুষেই হোক কোন ধরনের সৃজনশীলতাকে অতি-বাস্তবিক স্বীকৃতি দিতে রাজি নন। সৃষ্টি তাদের মতে আকস্মিক একটি ঘটনা, বাঁদরের বিশৃঙ্খল সেই টাইপ রাইটার চালানো থেকে অর্থবহ একটা কবিতার মত ফুটে ওঠা। জগতে প্রাণের উদ্ভব দিশেহারা অন্ধের গতির মত —কতকগুলি অর্থহীন আকস্মিকতার ফল মাত্র। কিন্তু এই আকস্মিকতাই বা কি করে দেখা দিয়েছিল –সে কথাও তাঁরা বলতে পারেন নি। পদার্থবিদ্যার মূল সূত্রগুলির উৎস কোথায় তা বলতেও তাঁরা অপারগ। ফলে তাদের বক্তব্যের পেছনে না আছে চূড়ান্ত বিজ্ঞান না অনস্বীকার্য বিচারের ধারা, যাকে বলে লজিক।

দ্বিতীয় দার্শনিক ধারায় বস্তুবাদীরা মনের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে, তবু একথাও অস্বীকার করেন না যে, মন ও দেহের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটে। এই ধরনের কথা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। এখানে দ্বৈত একটা অবস্থানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়; স্বীকার করে নেওয়া হয় মন এবং দেহ ও তাদের পারস্পরিক আদান প্রদান। এই তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হলেন স্যার কার্ল পপার (Sir Karl Popper)। সম্পর্কটা অনেকটা গাড়ি ও ড্রাইভারের মত। পথে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে ড্রাইভার। আবার গাড়ি ভুলপথে পরিক্রমা করলে যন্ত্র সেটা ধরিয়ে দেয় ড্রাইভারকে। গাড়ি যদি দেহ, এখানে ড্রাইভার তবে মন। ঠিক এমনই মন দেহকে পরিচালিত করে, আবার দেহও মনকে প্রভাবিত করে। তথাপি ব্যতিক্রমও আছে। মনে কোন চিন্তা হলেই যে মস্তিষ্কস্নায়ু তক্ষুনি অনুরূপ সাড়া দেবে তা নয়, যেমন, ড্রাইভার মনে করলেই গাড়ি সব সময় তেমন ভাবে চলবে না। হয় তো গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখেই ড্রাইভার গতি বন্ধ করে গন্তব্যস্থলের মানচিত্র দেখতে লাগল। গাড়ির ইঞ্জিন চললেও এক্ষেত্রে ড্রাইভারের উপর তার কোন প্রভাব পড়ল না। এমনটা মানুষের ক্ষেত্রেও হয়। কোন বিষয়ে সে মনঃসংযোগ করলেও তার দেহবিশেষে ভিন্ন ধরনের সাড়া পড়লেও, সে বিষয়ে সে মনে করতে পারেনা। সুতরাং ড্রাইভারের মতই মন দেহনির্ভর নয়। আবার দেহও সবটাই মননির্ভর নয়। গাড়ি বিকল হলে ড্রাইভারের কথা শুনবে না, আবার দেহ রোগাক্রান্ত হলে সেও মনের নির্দেশমাত্রই নিরোগ হয়ে যাবে না। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেও কখনও কখনও সম্পর্ক থাকেও

না। গাড়ি বিকল হলেই যেমন ড্রাইভারের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়না তেমনই দেহ বিকল হলেই মন মরে যাবে এ-কথাও বলা যায় না। কোন কোন সময় গাড়ি এবং ড্রাইভার দুইই অ্যাকসিডেন্টের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেহ ও মন দুইই এক সঙ্গে নষ্ট হয় না। দেহ পদার্থবিদ্যার নিয়মাধীন বলে মৃত্যুর মুখে পড়ে। মন সেই স্থূল বাস্তবিক উপাদান দিয়ে গঠিত নয় বলে দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয় এমন নয়। তবে একথা ঠিক, মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও তার বাস্তবপ্রকাশ মস্তিষ্কস্নায়ু ছাড়া হতে পারে না, যেমন বিদ্যুৎ বাল্ব ছাড়া আলো দিতে পারে না। ফলে মনের একটি সৃজনশীল ক্ষমতা থাকলেও তা বস্তুনির্ভর। নির্ভেজাল মানস-অবস্থা থেকে সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে বস্তুবাদীরা তা বলতে রাজি নন। সেই জন্য তারা আকস্মিকতার উপরই বেশি জোর দিয়েছেন।)

দার্শনিক ধারায় তৃতীয় ধরনের যে চিন্তার উদ্ভব হয়েছে, এখানে বস্তুর অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। এই তত্ত্বমতে সামগ্রিক ভাবে প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটা সৃজনশীল ভাব আছে। পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব দিয়ে এই সৃজনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই স্বাভাবিক সৃজনশীলতাই উদ্ভিদ ও নিম্নতর প্রাণীর মধ্যে রূপান্তর ঘটায় এবং নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে। নতুন অনুভবের উৎস হিসেবেও এই সৃজনীক্ষমতা কাজ করে। উচ্চতর পশু জগতে, যেমন মানুষ, এই সৃজনশীলতা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ঘটায় এবং নতুন নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করে।

এ বিষয়ে বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফরাসী দার্শনিক হেন্‌রি বের্গসঁ। তিনি তাঁর Creative Evolution গ্রন্থে এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটা মৌল শক্তির ফুলে ওঠার ভাব আছে। এই প্রাণশক্তির নাম দিয়েছেন তিনি এলান ভাইটাল—যা নাকি ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। তবে এমন ভাবার কারণ নেই যে, এই সৃজনশীলতা অনবরতই রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। অধিকাংশ সময় পরবর্তী প্রাণী পূর্ববর্তী প্রাণীর রূপের উত্তরাধিকার লাভ করে। এবং ব্যবহারের দিক থেকেও প্রাক্তন প্রাণীর ন্যায় ব্যবহার করে। তবে অনেক সময়েই এই ধারার মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ প্রাণী তখন এমন এক পরিবেশের মধ্যে পড়ে যেখানে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন, জিনের বেহিসেবী সম্পর্কের জন্য কোথাও কোথাও তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এরকম হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। কিংবা নতুন ধরনের ব্যবহার দেখাতে শুরু করে, যেমন অতিরিক্ত পরিমাণে শ্রুতিশক্তি দেখাতে থাকে যেটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। অন্ধকারে এরা অনেক ভালভাবে চলতে পারে। এই ধরনের নতুন ব্যবহার ও প্রকৃতির বদান্যতা লাভ করে প্রাণী নতুন রূপান্তর ঘটাতে পারে।

যদিও প্রাণীর জীবকোষর DNA-তে এই ধরনের অনবরত একটা পরিবর্তন ঘটার প্রত্যুত্তর হিসেবেই এই ধরনের ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করে, তবু শুধুমাত্র DNA-এর রূপান্তর দ্বারাই এর পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায় মানুষকে উদাহরণ স্বরূপ স্থাপন করে। ধরা যাক অ্যাকসিডেন্টে কোন মানুষ তার পা দুটি ক্ষতিগ্রস্ত করল। জীবিকার জন্য তার স্বাভাবিক কাজকর্ম এতে ব্যহত হল। ফলে দেখা গেল নতুন এক দিকে সে তার মানস-বৃত্তিকে প্রবাহিত করেছে। দেখা গেল সে বেশ মনোজ্ঞ এক শিল্পী হয়ে উঠেছে। চিত্রাঙ্কনে সে সিদ্ধহস্ত। অ্যাকসিডেন্ট না হলে কখনই এমন ঘটত না। অথচ তার এই সৃজনশীলতাকে যে দৈহিক ক্ষতির সরাসরি প্রত্যুত্তর হিসেবে ধরা যাবে তাও নয়। অনুরূপ ভাবে DNA-এতে রূপান্তর ঘটার ফলেই যে পশুজগৎ ও উদ্ভিদ জগতে রূপান্তর ঘটে তা নয়। জৈবকোষিক রূপান্তর ও পরিবেশগত পরিবর্তন প্রাণপ্রবাহের দিকে যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় প্রাণীজগৎ যে সবসময়ই সৃজনশীলতা দিয়ে তার জবাব দেবে তা নাও হতে পারে। নতুন উদ্ভাবন প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে ওঠে। তবে সব ক্ষেত্রেই যে অভিনব উদ্ভাবনসমূহ কার্যকর হয় তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় না —এবং এ ধরনের প্রাণীকুলকে প্রকৃতি আগাছার মত উপড়ে ফেলে দেয়।

প্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৃজনশীলতা আছে, এ ধরনের চিন্তার অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতির সামনে নিশ্চিত কোন একটা লক্ষ্য আছে। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও যে এই সৃজনশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তা নয়। এর মধ্যেও এক ধরনের বহুদেববাদের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রকৃতি যেন এখানে ঈশ্বরের দেহ হিসেবে কাজ করে—যে দেহ ক্রমশই বেড়ে উঠছে, তবে কোন্ দিকে যে সে চলেছে, কোন্ লক্ষ্য সামনে রেখেছে, সেটা তার কাছেও জ্ঞাত নয়। এ যেন লক্ষ্যহীন এক ক্রমবিকাশ মাত্র।

চতুর্থ দার্শনিক তত্ত্বে আগের তিনটি দার্শনিক তত্ত্বই রয়েছে। বাস্তববাদীরা যেমন বস্তুতান্ত্রিকতাকে শ্রদ্ধা জানায়—এ ধরনের দর্শনচিন্তায় তারও স্থান আছে। দ্বৈতবাদীরা যেমন দেহ মনের সম্পর্কের কথা বলেন এ দর্শনে তাকেও অস্বীকার করা হয় নি। আবার প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিক একটা সৃজনশীলতা রয়েছে এই দর্শনে বিশ্বাসীরা সে কথাও স্বীকার করেন। তবে এ-সব ছাড়িয়েও এই তত্ত্ব এগিয়ে যায় এই বিশ্বাসে যে, মহাবিশ্বজগৎ অতিক্রম করেও একটি সৃজনশীল মানসিকতা রয়েছে। এই মহামানসই তার ধারণ-ক্ষেত্র, সৃষ্টির পেছনে তার সক্রিয় নিয়ন্ত্রক। এই ঐশ্বরিক মানসিকতার সামনে নিশ্চয়ই কোন এক উদ্দেশ্য রয়েছে—যাকে লক্ষ্য করে ক্রমবিকশিত চিৎশক্তিরূপে সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে। খ্রীষ্টীয় ক্রমবিকাশ তত্ত্বে এই লক্ষ্যকে বলা হয়েছে Omega Point. হিন্দুদর্শনে লীলায় আনন্দে উৎসে ফিরে যাওয়া। এই যে ঐশ্বরিক সৃজনশীলতা তা সৃষ্টির মধ্যে এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও পূর্ববর্তী তিনটি

তত্ত্বের মতই গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব! বিজ্ঞান যেমন উপরোক্ত তিনটি তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি অপর একটি অপেক্ষা বেশী গ্রাহ্য তা বলে দিতে পারে না—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব বিচারের উপর তার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়—, তেমনই চতুর্থ তত্ত্বও একটি বিশ্বাস হিসেবেই কাজ করে।)

বিজ্ঞান কি এগিয়ে যেতে যেতে সেই পুরানো বিশ্বাসেই আবার তার নোঙর ফেলতে চলেছে? কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের অবদান যেমন বিজ্ঞান ও মরমিয়াবাদকে এক করে ফেলেছে—তেমনই কি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছে বা নিচ্ছে? শতাব্দীর পর শতাব্দী ঈশ্বর নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে। তর্কবিতর্ক চলেছে ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে। এখন বিজ্ঞানের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার সঙ্গে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্গতিপূর্ণ না অসঙ্গতিপূর্ণ? নিরীশ্বর-বাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাই বলে যে তাদের কোন বিশ্বাস নেই তা নয়। তারা একটা অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস করেন। এই সত্য রয়েছে দৃশ্য-প্রকৃতি ও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাইরে। তবে এই যে সত্য, শক্তি—তা অন্ধশক্তি। এর সামনে কোন লক্ষ্য নেই। এর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নেই, সচেতনতাও নেই। অথচ এই শক্তি অপরিচ্ছিন্ন শাশ্বতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই শক্তির বাইরে কিছু নেই। তাছাড়া বস্তুজগৎকে সে নিয়ন্ত্রণ করলেও সে নিজে কোন বস্তু নয়। কোন টেস্টটিউবে ধরে এই শক্তিকে ঘনীভূত করা যাবে না। আঙ্কিক হিসেবের মধ্যে আঁকিবুকি করে তাকে বোঝা যাবে না। মহাবিশ্ব-প্রকৃতির এই যে আইন, একে না যাবে ছোঁয়া, না ধরা, না স্বাদ নেওয়া বা গন্ধ নেওয় বা কানে শোনা। পরোক্ষভাবে তার প্রভাবের মধ্য দিয়ে তাকে অনুমান করা যাবে। প্রকৃতির যথার্থ মৌল তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যাও করা যাবে না। শুধু তা আছে, এই বিশ্বাস নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং নিরীশ্বর-বাদীরাও বলতে বাধ্য যে, এই বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সব কিছু—একটি শাশ্বত, সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিময় অদৃশ্য নিয়মের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ ধারণা ঈশ্বরবিশ্বাসীদের অনুরূপ ধারণার সঙ্গে কতটা সঙ্গতি পূর্ণ—, যখন ঈশ্বরবিশ্বাসীরা বলেন যে, বিশ্বপ্রকৃতি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, ঈশ্বর চিরন্তন, সর্বব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান এবং অদৃশ্য?)

(দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য দেখা গেলেও বড় রকমের একটা পার্থক্যও রয়ে গেছে। নিরীশ্বরবাদীরা ভাবেন, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মসমূহ অন্ধ, অচেতন এবং অসৃজনশীল অর্থাৎ সচেতন ভাবে কিছু সৃষ্টি করে না। মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীলতা তারও তারা যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ক্রমবিকাশের পেছনে যে কি কাজ করছে তাও তারা বলতে পারেন না। সমস্ত সৃজনশীলতার মূলে তারা শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনকেই লক্ষ্য করতে পারেন। মূলত বিশ্বপ্রকৃতি জড়। এর কোন আত্মা নেই। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন, প্রকৃতসত্তা সচেতন, সৃজনশীল এবং প্রাণময়। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে রয়েছে

ঐশ্বরিক কিছু গুণ। কারণ প্রাণময়, সচেতন চিরন্তন ঈশ্বরই হলেন এর উৎস।

নিরীশ্বরবাদীরা মনে করেন, তাঁদের তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ, বিজ্ঞানভিত্তিক। ঈশ্বরচিন্তা একটা অপ্রয়োজনীয় অনুমান মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে নিরীশ্বরবাদীদের তত্ত্ব বেশ গ্রহণযোগ্যই মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবতে গেলেই দেখা যায় যে, সমস্যার সমাধান করাতো দূরস্থান আরও বেশী সমস্যার মধ্যে এই নিরীশ্বরতাবাদ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে! প্রথমত বস্তু যদি জড় হয়, প্রাকৃতিক অন্ধ-আইন ও আকস্মিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়, তা হলে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে কোথাও চেতনার স্পর্শ এতটুকুও লক্ষ্য করা যাবে না। নিরীশ্বরবাদীদের চিন্তাভাবনাকেও মস্তিষ্কস্নায়ুর এক ধরনের বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া বলেই মনে হবে। এই ধরনের বস্তুভিত্তিক রাসায়নিক ও পদার্থিক সচেতনতা—তো তো চিৎশক্তিরূপ একটা ছায়ামাত্র—তার নিজস্ব ক্রিয়া বলতে কিছু নেই, সবই একটা আকস্মিকতা। কোন কিছুর উপরই তার একটা ছন্দময় নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে না। আমাদের স্বাধীন চিন্তাধারার সে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি অবস্থা। দ্বিতীয়ত—, নিরীশ্বরবাদীরা মনে করেন যে, ক্রম-বিকাশপদ্ধতি ও বিশ্বপ্রকৃতি সামগ্রিক ভাবে একটা অর্থহীন ব্যাপার মাত্র। এমন যে কট্টরপন্থী বস্তুবাদী তাঁর পক্ষেও এ ধরনের তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনাও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত—এ ধরনের বিশ্বাসে আটকে থাকলে প্রাকৃতিক নিয়মের চরিত্র নিয়েও ধাঁধা দেখা দেবে—যে নিয়মের উপর নির্ভর করে নিরীশ্বরবাদীরা চলতে চান। তাহলে প্রাকৃতিক এই নিয়মগুলি কি? বিচার করতে গেলে দেখা যাবে তারা সার্বিক, অপরিবর্তনীয়, সর্বব্যাপ্ত এবং অতিবাস্তব। প্রকৃত পক্ষে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করতে গেলেই মনে হবে, এই আইনগুলি বাস্তবাতীত মহা-বৈশ্বিক একটা মানস মাত্র। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাধ্যমে, অঙ্কের হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই তাদের জানা যাবে। আর এই আইনের সাহায্যেই মানবমানসিকতার মূল্যায়ন করতে হবে। এ যে অত্যন্ত কঠিন কাজ তাতে সন্দেহ নেই। দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তকে মেলানোর মতই এটি একটি দুরূহ কাজ।

এই যে সব সমস্যা, নিরীশ্বরতাবাদে বিশ্বাসী হলে এ ধরনের সমস্যার মধ্যে আমাদের পড়তেই হবে। প্রাকৃতিক আইন এ ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান ভূমিকা নিলেও তাকে যথার্থরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক বলা যাবে না। এইসব আইনকে হাতে ধরে কোন দিন দেখিয়ে দেওয়া যাবেনা। ফলে এ আইন মানতে গেলেও যার উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে তার নাম বিশ্বাস—ঈশ্বরবাদীদেরও যা একটি সর্বাপেক্ষা বড় নির্ভরকেন্দ্র।

এ-সব কোন সমস্যার মুখেই আমাদের পড়তে হবেনা যদি আমরা ধরে নিই যে, সৃজনশীল মানসিকতার পেছনে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

সচেতন উৎস যদি ঈশ্বর হন, তিনি যদি বিশ্ববিধাতা হন, তা হলে প্রাকৃতিক-নিয়মগুলিকে তাঁরই সচেতন মানসজাত বলে ধরে নিয়ে অর্থবহ করে তুলতে কোন অসুবিধাই হয় না। ক্রমবিকাশের পথে সচেতন মানসের উদ্ভব কি ভাবে হয় সেটা ভাবতেও তখন কোন কষ্ট হয়না।

যদি ঈশ্বরবিশ্বাসে নোঙর ফেলা যায় তাহলে মানবচৈতন্যের উৎস সম্পর্কেও আমাদের আর কোন ধাঁধা থাকে না। মানবচৈতন্য যে ঈশ্বরচৈতন্যেরই অংশ মাত্র এটা সহজেই অনুমান করা যায়। সকল ধর্মেই মরমিয়ারা এমন তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করেছেন। অবশ্য সন্দেহবাদীরা তাঁদের এই অবস্থাকে ভ্রান্তি বলে বর্ণনা করতেও পারেন, কারণ, বাস্তববিচারে তাদের এই অনুভূতিকে হাতেনাতে ধরার নয়। রঙ আছে একথা সত্য হলেও রঙের স্বরূপ জন্মগত ভাবেই অন্ধ এমন ব্যক্তিকে কোনভাবেই বোঝানো যাবে না। মরমিয়া সত্য মরমিয়াদের পথ ধরে যারা অনুভব করবেন—শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষাও বড়। মানুষের গভীর হৃদয়ানুভূতি দিয়ে যুগের পর যুগ বহু মানবমানবী এর অভিজ্ঞতা লাভ করলেও প্রমাণসাক্ষেপ করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলতে পারেন নি।

ঈশ্বরের চেতনা থেকে যদি জগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে, মানবচৈতন্য এসে থাকে, তাহলে জাগতিক নিয়ম ও মানবচিত্তবৃত্তি দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না, কারণ, ঈশ্বরমানস মানবমানস অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং নানা ধরনের উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। ইহুদীধর্মে ঈশ্বরকে বড় এক কারিগর হিসেবে দেখানো হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বর্ণনায় ঈশ্বরকে এক স্বর্গীয় কারিগর রূপে আঁকা হয়েছিল। এই বিশ্বের পরিকল্পনা, নির্মাণ, সব তাঁরই। এর রক্ষণাবেক্ষণও তিনিই করেন। আধুনিক চিন্তায় এমন ধারণার কথাও প্রতিফলিত হয়েছে যে, ঈশ্বর যেন এক মহাবৈশ্বিক কম্পিউটার প্রোগ্রামার। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পদার্থিক সত্তা থেকে ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক। দুইয়ের পার্থক্য মানব ইঞ্জিনিয়ার ও ধাতবদ্রব্যের মত। এই জড়জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলছে। ভারতীয়রা আবার এই বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের স্বপ্ন বলে দেখেছেন। ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্নের মধ্যে আমরা সৃষ্টি রূপে প্রতিফলিত। সুতরাং আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন দেখি। অর্থাৎ আমরা নিজেরা স্বপ্নের বিষয় হয়ে স্বপ্ন দেখি। সুতরাং ঈশ্বরমানস থেকে বস্তুজগতের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুসত্তা জড় নয়। ঐশ্বরিক মানসপ্রসূত এক ধরনের রূপ মাত্র। ঈশ্বরের স্বপ্ন শেষ হওয়া মাত্রই এই বস্তুবিশ্বও উবে যাবে। এ ধরনের চিন্তার মূল কথা এই যে, ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কিছু নেই, ঈশ্বর সর্বত্রই রয়েছেন। ইহুদীদের ধারণা থেকে এ ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। তবে এ ধরনের চিন্তার ত্রুটি এইখানে যে, এতে বিশ্বজগতের যথার্থ কোন সত্তা থাকে না—সবই মায়া মাত্র, স্বাপ্নিক মায়া রূপে প্রতিভাত হয়।

বিশ্বরহস্যের পেছনে আর একদল সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বাক্যের—পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় জগতেই এ ধরনের চিন্তা আছে। তাঁদের ধারণা, মানসচিন্তা বাক্যে স্ফুরিত হলে তবে যেমন কর্মের মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয় তেমনই ঈশ্বরের বাক্য থেকেই এই জগৎ এসেছে। যেমন, রাজার মুখের বাক্য যদি নির্দেশ রূপে আসে তবে যুদ্ধ হয়, শান্তি হয়, বড় বড় ইমারৎ গড়ে ওঠে, তেমনই ঈশ্বরের নির্দেশাত্মক বাক্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রীষ্টীয় জগতে এমন বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছিলঃ—আদিতে ছিল বাক্য, বাক্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, বাক্যই ঈশ্বর। ভারতীয়েরাও বলেছেন শব্দই সব—শব্দ ব্রহ্মন। এই শব্দ বা বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ আধুনিক পদার্থবিদ্যা ধরতে পারলেও সাধারণ মানুষ পারে নি। যেমন হিন্দুদের 'ওঁ' শব্দের তাৎপর্য কেউ যথার্থই জানে বলে মনে হয় না। কেন যে 'ওঁ' শব্দ একথা বুঝিয়ে বলার সাধ্য প্রায় কারোই নেই। সব কিছুর উপরই যদি ধর্মের পোশাক পরিয়ে দেওয়া যায় তবে ঐ সব বোঝা যাবে না। বিজ্ঞানের সাহায্যও একটু নিতে হবে। বিজ্ঞানও ঈশ্বরের স্বপ্নের মত মায়া নয়, বুঝতে হবে। বাক্য বলতে 'ঈশ্বরের নির্দেশ' এমন ভাবলে ভুলই হবে। তখন খ্রীস্টানদের মত মনে হবে—' 'ঈশ্বর বললেন, আলো, হোক, আলো হল।' এই ঈশ্বরের শব্দ দিয়ে ইচ্ছা ব্যক্ত করার যে চিত্রকল্প করা হয়েছে—তাকে পদার্থ বিজ্ঞানের BigBang-চিন্তার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। শব্দতরঙ্গবাহী Superstring-তত্ত্বের কথা একটু বুঝতে হবে। আর তা না হলে মনে হবে ঈশ্বর ব্যক্তিদেহধারী বিশেষ কোন সত্তা যিনি সুপ্রিম কোর্টের চীপজাস্টিস ও স্বৈরচারী রাজার মতই আইনস্রষ্টা। তাঁর মুখের কথাতেই বিশ্ব জগতের যত নিয়মকানুন। এবং এই আইনকানুনের কথা বিশ্ববাসীকে তিনি তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা জানিয়েছিলেন—যেমন, মোজেস, খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রমুখ প্রফেট বা পয়গম্বরের দল। যিশুখ্রীষ্ট স্বয়ং জানিয়েছেন – বাক্য থেকেই স্থূল বিশ্বের উৎপত্তি—'word made flesh'. কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এর significance ভিন্ন। এটা বোঝাবার জন্যই তো এতগুলো বই লিখেছি—দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা, সাধুসন্তের দেশে, দেবদেবীর উৎস সন্ধানে। কিন্তু তবু কি সবাই বোঝে। ঈশ্বর বলতে হাত-পা-ওয়ালা জীবের বাইরে কেউ যেতেই চায় না। বলে, দর্শন চাই। যেই প্রতীকী মূর্তি হারিয়ে গিয়ে যোগশিক্ষার্থীদের অন্তরক্ষেত্রে আলো দেখা দিল অমনিই আক্ষেপ —হায়! সব হারিয়ে ফেললুম! অথচ জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আনন্দ অংশে এসে পৌঁচেছে সে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে জগৎ সৃষ্টি, এরকম চিন্তা এধরনেরই একটা চিত্রকল্প অঙ্কন করেছে—যা দেখে মনে হয়, ঈশ্বর কোন এক মহাশক্তিধর সম্রাট যিনি দূরে কোথাও সিংহাসনে বসে আছেন, নির্দেশ পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর সেই হুকুম তামিল হচ্ছে। তবে বাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যার অভাব থেকে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হলেও ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব

অপসারণ করতেও এই বাক্য সহায়ক হয়েছে। এই ধরনের ধারণা হয়েছে যে, ঈশ্বর যদি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তবে মানুষও ঈশ্বরের সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলতে পারে। সেই জন্যই ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে জগতের সকল ধর্মেই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

খ্রীষ্টানরা এক স্বৈরচারী শাসকরূপে ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে না রেখে তাঁকে পিতারূপে কল্পনা করেছেন। পিতা যেমন সন্তানকে ভালবাসেন তিনিও তেমনই তাঁর সৃষ্টজীবকে প্রেম বিতরণ করেন। মানুষের যতটুকু দুঃখ বা কষ্ট তা পুত্রকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য পিতার স্নেহশাসন মাত্র। ঈশ্বর ইঞ্জিনিয়ারের মত স্রষ্টা হলেও মানুষকে শুধু যন্ত্ররূপেই গড়েন নি—তাকে বিশেষ একটি মানসসত্তা দিয়েছেন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার দিয়েছেন। তবে এ ধরনের চিন্তা ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর শাসকহিসাবেও প্রতিভাত করতে পারে যখন মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁদের আকুল আবেদনে তিনি সাড়া দেন না।

(ভারতীয়েরা অনেক বেশি কাব্যিকভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। এই জন্য জগৎকে তাঁরা দেখেছেন লীলা রূপে, যে লীলার অর্থ আমার বিভিন্ন গ্রন্থে আমি বলেছি, বিশেষ করে গোপীশব্দ ব্যাখ্যা করে। গো= বিশ্বপ্রকৃতি, আপ্যায়তি ইতি পী=যে বিশ্বপ্রকৃতি ছন্দময় নৃত্যে পুরুষকে আপ্যায়িত করে সে-ই গোপী। ঈশ্বরের আর একটি প্রতীক মূর্তিতে হিন্দুরা নটরাজের মূর্তি কল্পনা করেছেন, যাঁর বিশ্বনৃত্য সৃষ্টিশৈলীতে ফুটে উঠছে, সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য আনছে। পদার্থবিদ্যাচর্চাতেও দেখা গেছে যে, মহাকাশে বস্তুর মৌলউপাদন হিসেবে অণুপরমাণুগুলি ছন্দময় তরঙ্গে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। এই পারমাণবিক নৃত্যের যে চিত্র যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া গেছে শিবের নৃত্যের সঙ্গে তার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। ফোর্ড তার বিখ্যাত গ্রন্থ The World Of Elementary Particls-এ এই আণবিক নৃত্যের যে অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন তা দক্ষিণ ভারতের নটরাজের মূর্তির সঙ্গে অপূর্ব ভাবে মিলে যায়ঃ ১০২, ১০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতি যে ঈশ্বরের নানা ধরনের রূপ কল্পনা করেছেন তাতে সর্বত্রই একটি বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এই যে, একটা চৈতন্যপ্রবাহ ছন্দে ছন্দে বয়ে চলেছে। তবে জ্ঞান হলেও কেউ ভাষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সর্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে পারেন নি। ইহুদীরা ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্তি গড়া নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ, এতে ঈশ্বরকে ছোট করা হয়। মানুষের চিন্তায় ঈশ্বরের পূর্ণাঙ্গরূপ ধরা কখনও সম্ভব নয়। এই ধারণা ইসলামেও রয়েছে—এই জন্য ঈশ্বরের নামে কোন মূর্তিগড়া সেখানে নিষিদ্ধ। মূল হিন্দুচিন্তাতেও বলা হয়েছে, ঈশ্বর অজ্ঞেয়। তিনি ইহাও নন, তাহাও নন। চৈনিক তাওবাদে বলা হয়েছে যে, যে তাও বা সত্যকে বর্ণনা করা যায় তা চিরন্তন নয়। যে নাম-

উচ্চারণ করা যায় সে নাম স্থায়ী নাম নয়। এই জন্য ভারতীয় উপনিষদে কেউ ঈশ্বরস্বরূপ জিজ্ঞাসা করা হলে নীরব থাকতেন। তাদের মতে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) অনুচ্ছিষ্ট। বাক্য দ্বারা তাঁকে উচ্ছিষ্ট করা যায় না। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে গৌতম বুদ্ধও এইজন্য নির্বাক থাকতেন। নির্বাণের যে অর্থাৎ যথার্থ অবস্থার

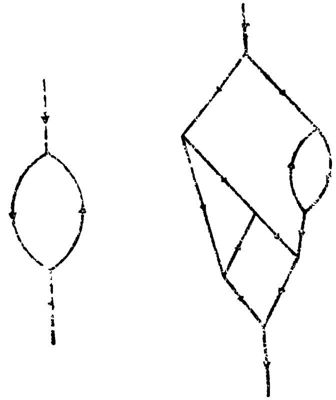


নটরাজ

তিনি কল্পনা করেছিলেন তা 'না' নয়, 'হাঁ'-ও নয়। বা 'না+হাঁ'-ও নয়। এ এক অনিবর্চনীয় অবস্থা। খ্রীষ্টানরাও ঈশ্বরকল্পনায় তাঁকে রহস্যময় অজ্ঞেয় সত্তা বলে বর্ণনা করেছেন। ইহুদীরা ঈশ্বরকে যেহবা নাম দিলেও এই নাম সচরাচর উচ্চারণ করতেন না। বরং Adonai নামে ডাকতেন। এর অর্থ, 'আমার প্রভু'।

ঈশ্বরবিশ্বাসে এই জন্য বিশেষ কোন মূর্তি রাখা দায়। বরং রূপকল্পনা অপেক্ষা এখানে এই ধরনের ভাবনার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, তিনি সর্বোচ্চ

চৈতন্য এবং সৃজনশীল প্রাণসত্তা। তবে বাস্তুবাদীরা বিশ্বজগতের মূলসত্তাকে, অদৃশ্য এই সৃজনীসত্তাকে মূলত অচেতন, অন্ধ ও উদ্দেশ্যহীন বলে মনে করেন। এই ধরনের দুই মেরুপ্রান্তিক বিশ্বাসের কোনটাকেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করা যাবে না। তর্কবিতর্কের বেষ্টনীতেও তাকে ধরা সম্ভব হবে না। এই সত্যকে বুঝতে হলে সত্যদ্রষ্টাঋষি এবং বৈজ্ঞানিক উভয়কেই হৃদয়



আণবিক নৃত্য

পেতে দিয়ে অনুভবের মধ্য দিয়ে তা বুঝতে হবে। নিরীশ্বরবাদীরা মনে করতেন, ঈশ্বর আছেন এমন আপ্তবাক্যকে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু তিনি আছেন একথা প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ ও সৃষ্টির অতল এক গহ্বরের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতা Jan Christian Smuts—একবার বলেছিলেন, সার্বিকতা খণ্ডবিচ্ছিন্ন অংশগুলির একত্রিত সমাবেশ অপেক্ষাও বড়। এই তত্ত্বের নাম Holism—অর্থাৎ সার্বিকতা তত্ত্ব। ফলে খণ্ডবিচ্ছিন্নের পক্ষে কোনদিনই পূর্ণের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি পূর্ণ আছে—এবং তিনিই ঈশ্বর।

পাঁচ

খাড়িতো নয়, যেন গোলক ধাঁধা! কত যে ঘুরপাক খাচ্ছে কে জানে! এ যেন দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ। বেরুবার পথে বেরুতে পারব, না আটকে যাব কে বলবে! মনের মধ্যে ডুবে থাকার সময় কখন সূর্যটা যে সাগরের ওপারে ডুবে গেছে কে জানে। অন্ধকারের প্রথম স্তরের ছায়া নেমেছে আবহাওয়ার গা জড়িয়ে জড়িয়ে।

হাওয়াটা যেন ভিজে উঠেছে। গায়ে তার স্পষ্ট জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ডাইনে একটা দ্বীপের ধূসর প্রান্তরেখা দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে সুন্দরবন যেন আরো ঘন হয়ে উঠেছে, অন্ধকারের ছায়া টেনে নিয়ে আরও ঘনসংবদ্ধ হয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোন ফোঁকর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—যেখান দিয়ে দৃষ্টি ভেতরে ঢুকতে পারে। আশ্চর্য! পাখিদের কোন কলকণ্ঠ নেই আকাশে, উড্ডীয়মান কোন পাখার তরঙ্গায়িত সঞ্চালন নেই। সমগ্র পরিমণ্ডলটাই কেমন যেন রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে। পৃথিবীর সভ্যতা যেন কয়েক লক্ষ বছর পিছিয়ে গেছে। আদিম মানুষের মনের চতুর্দিকে যেমন রহস্যময়তা জড়িয়ে ধরে বিপুল বিশ্ব সম্পর্কে তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, সেই ধরনের একটা ভাবনা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত অন্তর-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে জমে উঠছে। জোয়ার নিশ্চয়ই নেই। ভাটার টান আরো বেড়েছে। তবুও খাড়ির বিস্তার অনেক, অনেক বড় হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ছায়া পড়ে জলের রঙ কালো হয়ে উঠেছে। নদীর কিনারে কিনারে যারা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত ছিল কখন তারা নিঃশব্দে সংগ্রাম পরিত্যাগ করে চলে গেছে। শুধু কিছু কিছু জেলে-ডিঙি কালো কালিতে আঁকা স্কেচের মত সামান্য তরঙ্গক্ষুব্ধ খাড়ির জলে নৃত্যপরা মহিলার মত নাচছে। ছইয়ের ভেতরে বোধহয় কেরোসিনতেলের হ্যারিকেন ধরিয়েছে মাঝিরা। ঘোমটার আড়াল থেকে গাঁয়ের বধূর মত হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোগুলি কৌতুকপরায়ণ চোখের মত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাওয়া যেন দাপট দিয়ে বইছে। হয় তো অবাঞ্ছিত অথিতি হয়ে ভেতরে ঢুকছি বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জল পরিবৃত দ্বীপের আন্তর রহস্য আমরা ভেদ করি তা তারা চায় না। মাঝে মাঝে এমন ধাক্কা দিচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে বলছে, উঠে যাও। চলে যাও। আমাদের এই সার্বভৌম রাজত্বে তোমরা অবাঞ্ছিত, বিদেশী, ঢুকোনা।

ঘনায়মান অন্ধকারের চাপে চাপে মন আবার ডুবে যাচ্ছে দেহের মধ্যে যে দেশ (space, inner space) আছে সেই দিকে। আদিম মানবের প্রশ্ন ঠেলে ঠেলে উঠছে সেখান থেকে। প্রথম তাকিয়ে বিশ্বপৃথিবী সম্পর্কে তাদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল যেন সেইসব প্রশ্ন জেগে উঠছে। উপরে আকাশ, নিচে পৃথিবী, কি ভাবে জগতের উদ্ভব হল কে জানে!

আদিম মানব, প্রাচীন মানস এ সম্পর্কে কী ভেবেছিল—সেই প্রশ্নগুলি চাড়া দিয়ে উঠছে মনের মধ্যে :—তখন মানুষের হাতে এত ভাষা ছিল না, এত আঙ্কিক হিসেব ছিল না, গণিতের প্রতীক ছিল না। তবুও ভাবনা এসেছিল—কখনও গল্পের মধ্য দিয়ে, কখনও ভাষার আঁচল ধরে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের কথা মনে পড়ছে। দু ধরনের ভিন্নতর চিন্তা এসেছিল তাদের মধ্যে। প্রথমেই এসেছিল জলের চিন্তা। পারশ্য উপসাগরের কূলহীন বিস্তার লক্ষ্য করেই বোধহয় তাদের মনে হয়েছিল—আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না অনন্তদেশ জুড়ে। সেই শান্তজলে জেগে উঠল একটা

দৃষ্টশক্তি—যার নাম টিয়ামত। ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করল জলের মধ্যে। সেই অশান্ত ঘূর্ণন থেকে আদিম জলরাশিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মারডুক নামে এক দেবতা। টিয়ামতকে হত্যা করে—আদিম জলরাশির অভ্যন্তর থেকে বের করে আনলেন সৃষ্টিকে। এ গল্প কি সত্যি সত্যি গল্প? না নির্ভেজাল আদিম মানস বর্তমানের সংস্কৃত ধারালো বৈজ্ঞানিক-মানসেরই মত ভেদ করতে পেরেছিল সৃষ্টিরহস্যের গোপন কথা? এই আদিম জলরাশি কি অদ্বৈত এক supervoid—যার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা শক্তি যে-ভাবেই হোক পড়ে গেল ঘূর্ণাবর্তে! তৈরি করে ফেলল কটাহের মত একটি ক্ষেত্র? চারপাশের শক্তিকে টানতে টানতে এমন ঘন করে ফেলল সেই কটাহের মধ্যে যে, সেই রাক্ষুসে বেষ্টনীর চাপে পড়ে ঘনীভূত শক্তি ভরে উঠল বিশৃঙ্খলায় —আধুনিক ব্ল্যাকহোলের ভেতর আভ্যন্তরিণ বিশৃঙ্খলার মত? সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে তা থেকে বেরিয়ে আসার মত বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে? যে ভয়ানক শক্তি তাকে ছড়িয়ে দিল প্রান্তভাগের দিকে তারই নাম kinetic energy—আমাদের ভাষায় যাকে বলে শিবের রুদ্রমূর্তি টিয়ামত হয় তো আমাদের সেই রুদ্র।

এই যে, কারণ-সমুদ্র (cosmic ocean) বহু প্রাচীন-চিন্তাতেই এই কারণ-সমুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর উল্লেখ রয়েছে হিন্দু বিশ্বসৃষ্টির কল্পনায়, মিশরীয়দের জগৎসৃষ্টির চিন্তার মধ্যেও। আবার প্রাকৃত পরিবেশ দেখে এর মধ্য থেকে তারা জগৎও সৃষ্টি করেছে যেমন, Khnum—নীলনদের তলদেশ থেকে কাদা তুলে একটি মহাদৈশিক (cosmic) ডিম তৈরি করেছিলেন। আর সেই ডিম ভেঙেই তৈরি হয়েছিল বিশ্বপ্রকৃতি। তখন অঙ্কের অত হিসেব ছিল না, নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার ছক্ ছিল না। তবুও গল্পের মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীনেরা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তা-ই বলবার চেষ্টা করেছেন। তাদের সেই ভোঁতা গল্পের সঙ্গে যে আধুনিক বিশ্বসৃষ্টিকল্পনার খুব ভেদ আছে, তা নয়। নীল-নদের কাদা দিয়ে গড়া ডিমকে যদি 'নিউট্রন ফিল্ড' রূপে ধরি তাতে ভুল হয় না। ফলে অনুভূতিজাত গল্প ও আঙ্কিক হিসাবের বিজ্ঞান-চিন্তা মূলক্ষেত্রে এসে মিলেমিশে একাকারই হয়ে যায়।

দর্শনের বিজ্ঞানভিত্তি যা-ই থাক—সেই প্রাচীন মানসচিন্তার কথাই বলা যাক। এই মিশরেরই মেম্ফিস অঞ্চলে টা (Ptah) নামে এক দেবতার কল্পনা করেছিলেন মিশরীয়েরা। তাদের ধারণা ছিল, এই পৃথিবীকে একজন ভাস্করের মত হাতুড়ি বাটালি দিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানমানস ও নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা থাকা সত্ত্বেও তারাও যে গল্পকথার বেড়াজাল টপ্‌কে যেতে পেরেছিলেন তা নয়। বিশ্বসৃষ্টির কল্পনায় তাদের মধ্যেও এমনতর গল্পের অবতারণা ঘটেছিল। কারো মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৌল উপাদান ছিল সমুদ্রে (space)। হোমারের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা ছিল।

আবার হেসিয়ডে দেখা যায় মৃত্তিকাকেই সৃষ্টির মৌল উপাদান হিসেবে ধরা হয়েছে। এম্পেনাইডপন্থীরা আকাশকেই ভাবতেন সৃষ্টির মূল উৎস। এই আকাশকে বলা যায় ইথার—বর্তমানে যার স্থান নিয়েছে vacuum in quantum field—অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে শূন্য মনে হলেও যার মধ্যে রয়েছে তেজ। হিন্দুরা যাকে বলেন ব্রহ্মন।

গ্রীকদের বিশ্বসৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত ধারণাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—যেমন, (১) ঈশ্বর হিসেবে স্রষ্টা জিউস, (২) নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাবিদদের মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলা—সময় ও রাত্রি (আদিম দেশীয় অন্ধকার, supervoid) এবং (৩) বস্তুবাদীদের ধারণা—জল, মাটী ও আকাশ।

ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯তম সূক্তে বিশ্বসৃষ্টির কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক এক অবস্থাকে যার আন্ত-মন্থনে ইচ্ছা বা কামের জন্ম হয়ে জগৎ ফুটে উঠছে। ঠিক অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়েছে সৃষ্টির মূলে গ্রীকদের Eros (কাম, ইচ্ছার)-এর মধ্য দিয়ে। তবে অন্যান্য বৈদিক সূক্তে অস্পষ্টভাবে বিশ্বসৃষ্টির কারণ হিসবে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তে বলা হয়েছে—বিরাট এক দৈত্যস্বরূপ দেহের নানা অংশ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয় হয়েছে। আবার হিন্দুচিন্তার কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির আদিকারণ ব্রহ্মা (অর্থাৎ প্রাণ হং ও অপাণ স-এর সাম্যবস্থা, যাকে বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় নিউট্রন ফিল্ড। এবং এইজন্যই ব্রহ্মাকে হংসবাহন বলা হয়েছে)। ব্রাহ্মণশাস্ত্রে দেখা যায়, বিশ্বের উৎপত্তির প্রথমে একটি ডিম্বের কল্পনা করা হয়েছে, যাকে বর্তমান astrophysics-এর ভাষায় বলা যেতে পারে ব্ল্যাকহোল। এই ডিম্বের কল্পনা গ্রীসেও ছিল। পালিনেশীয়দের মত নিতান্তই আদিম মানুষের মধ্যেও ছিল: গ্রীসের রহস্যময় অরফীয় তত্ত্বেও এই ডিম্বের কল্পনা লক্ষ্য করা যায়। আবার বিশ্বসৃষ্টির মূলে আদিপুরুষ ও রমণীর যৌন সম্পর্কের চিন্তাও রয়েছে রয়েছে হিন্দু, মাওরি, চৈনিক সবার মধ্যেই।

বিশ্বসৃষ্টির মূল কল্পনায় হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে যথেষ্টই মিল রয়েছে। কিন্তু ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্ব ঠিক যেন এর বিপরীত মেরুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। ইরানীয়দের বিশ্বসৃষ্টিকল্পনার মধ্যেও এই বিপরীত সুরের আভাস পাওয়া যায়। আবার ইরানীয় চিন্তা—ভারতীয়, গ্রীক ও ব্যাবিলনীয় বিপরীত চিন্তার মধ্যে সংযোগসূত্র হিসেবেও কাজ করেছে। ইরানীয় জরথুস্ত্রবাদীয় চিন্তায় সৃষ্টির মূলে একদিকে রয়েছে শুভশক্তির প্রতীক হিসেবে অহুর মজদ অপর দিকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে অহ্রমান। ঠিক অনুরূপ একটি গল্প পাওয়া যায় নিওজিল্যাণ্ডবাসীদের পাপা ও রঙ্গির সন্তানদের বিবাদবিসম্বাদের মধ্যেও।

মানুষের মনে দার্শনিকতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির উৎস সম্পর্কিত কল্পনা ভিন্নরূপ নেয়। তখন সীমাহীন এক সময়ের কল্পনা আসে—যা থেকে

অহুর মজদর মত শুভদেবতা এবং অহ্রমানের মত অশুভশক্তির উদয় হয়। এদের একজনকে দেখা হয় আলোরূপে আর একজনকে অন্ধকার রূপে। এখানে আধুনিক astrophysics-এর পার্টিকুলও অ্যান্টিপার্টিকুলের স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। অনুভব ও বিশ্লেষণ দুইই বোধ হয় উৎসে একই। পৌরাণিক কাহিনী এবং বিজ্ঞানে কোন ভেদ নেই। নিজেদের হৃদয়কে একটু বিস্তৃত করে দিতে পারলেই দেখা যায় -বৈজ্ঞানিক সত্য ও আন্তরিক অনুভূতি উভয়েই তুল্যমূল্য।

তবে মূলে গিয়ে একই সূত্র পাওয়া গেলেও প্রাচীন সৃষ্টিকল্পনা এক এক জাতির কাছে এক এক ভাবে এসেছিল। মিশরীয় কল্পনাতে দেখা যায় আদি নৈর্ব্যক্তিক মহামানস ও বস্তু চিরকালই পাশাপাশি ছিল—ভারতীয় সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মত। এই আদি মহামানসের ইচ্ছা কামরূপে নড়ে উঠে সৃষ্টিতরঙ্গ সৃষ্টি করে—ঋগ্বেদের সেই ইচ্ছার উত্তাপের (কামের) মত, গ্রীকদের Eros-এর মত, যারও অর্থ কাম বা সৃষ্টির ইচ্ছা। মিশরেও এই ইচ্ছাকে বলা হয়েছে কম অটেফ বা কাম। কাম থেকেই সূক্ষ্ম বস্তুসত্তায় গতির আবেগ ফুটে উঠে, আর গতির তাড়নাতেই অদৃশ্য বস্তুসত্তা দৃশ্য বস্তুসত্তা হয়ে দেখা দেয়। আইনস্টাইনের $E=Mc^2$ তত্ত্বের সঙ্গে এর তেমন ভেদ নেই। বস্তুর আদ্যা অবস্থা প্রাচীনকালেও শক্তিই ছিল, যা-ই নাকি ঘনীভূত হয়ে দৃশ্যমান বস্তুসত্তা তৈরি করেছিল। মিশরে চিন্তা করা হয়েছিল যে, এই দ্বিবিধ সত্তার এ দুটির সাহায্যে দেশের (space) বুকে ডিম্বের উদয় হয়েছিল (Blackhole-এর)। আবার এই ডিম্ব ভেঙেই (অতিরিক্ত চাপে ব্ল্যাকহোলের বিস্ফোরণের মত) বেরিয়ে এসেছিল 'রা' অর্থাৎ আলো। সেই আলো থেকেই এই বস্তুসাত্ত্বিক বিশ্বের উদয়। ইরানীয় কল্পনাতে দেখা যায়—স্তরে স্তরে যেভাবে সৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা এই রকম—আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, ভূমি, সাগর, নদী, উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ। 'বুন্দাহিশন' গ্রন্থে সৃষ্টিবিকাশের অনুরূপ কল্পনাই ব্যক্ত হয়েছে।

জার্মানদের চিন্তাতেও অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টির মূলে হল সময় (সময় হল গতির পরিণতি—যা থেকে ফুটে উঠেছে দেশ ও কাল—সৃষ্টির প্রথম উপাদান) ও বস্তুর মৌলসত্তা। এই স্থানের নাম হল 'গিন্নুনগগপ' (বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সৃষ্টির মূলউৎসে গতির চঞ্চলতা)। সময় ও আদ্যা বস্তুর যুগ্মাবস্থা থেকে বলপ্রয়োগ করে চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বস্তুসত্তাকে বের করে নিয়ে আসেন দেবতা ওডিন, হোয়েনির এবং লোধুর। এর পরই সৃষ্টি হয় 'মিধগারধ' অর্থাৎ মানুষের বাসস্থান। দক্ষিণায়নিক সূর্যের উত্তাপে গজিয়ে উঠে উদ্ভিদরাজি। উদয় হয় ঋতুর। যখন খর্বকায় জীব ও মানুষ তৈরি করে সৃষ্টিকার্য শেষ হয় তখন তৈরি হয় দেবতাদের বাসস্থান। ত্রিবিধ ভাগ্যের উদয় হয় (ত্রিকাল ?)।

ধীরে ধীরে মহাদৈশিক ডিম্বের পরিবর্তে কল্পনা আসে বৃক্ষের (গীতার উল্টো

বৃক্ষের মত যা গোলাকার বিশ্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রযোজ্য), কমলের (পদ্মের) অন্তত হিন্দুপুরাণে বার বার যার ছবি পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে একেই বলা হয়েছে নিউটন ফিল্ড। যার প্যাচগুলোকে কল্পনা করা হয়েছে পদ্মের দলরূপে—যা থেকে অকারণ কারণে প্রোটন ও ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে সৃষ্টি করছে জগতের মৌল উপাদান।

চৈনিক মানসে বিশেষ এক সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্ব দেখা যায় যেখানে তাওবাদে ইয়াং ও ইনরূপী প্রকৃতির মিলন থকে বেরিয়ে আসে চারটি ঋতু। চারটি ঋতু থেকে সৃষ্টি হয় আটটি 'কোয়া'র অর্থাৎ (অষ্টপ্রহর ?) অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর।

উত্তর আমেরিকায় যে আদি রেডইণ্ডিয়ানরা ছিল, তাদের সৃষ্টিকল্পনা আরও চমকপ্রদ। বিপরীতের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই যে সৃষ্টি তাদের চিন্তার মধ্য দিয়ে এই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যায় Cosmic Chaos। মানুষের এই পৃথিবীর আগে আর একটি জগৎ ছিল। এখানে বাস করতেন দেবতারা। এক সময় এদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এই সংঘর্ষে অধিকাংশ দেবতাই রূপান্তরিত হয়ে কেউ হয় জড়বস্তু, কেউ প্রাণময়। তাঁদের থেকে কেউ হয় পশু, কেউ পাখি, কেউ সরীসৃপ, কেউ গাছ, কেউ পাহাড় ইত্যাদি। [এ ঠিক যেন দেশের (space) বুকে অণু-পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগেবিয়োগের খেলা]। যাঁরা এই সংঘর্ষে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেন তারা ভিন্ন কোন অঞ্চলে চলে যান। বর্তমান পৃথিবী আসে রেডইণ্ডিয়ানদের দখলে। আধুনিক বিশ্বসৃষ্টির জন্য astrophysics যদি কেউ পড়েন তাহলে মহাকাশে পার্টিকুল অ্যাণ্টিপার্টিকুল, ব্ল্যাকহোল—হোয়াইটহোল নানা কিছুর ইঙ্গিত এতে পেতে পারেন। ভারতীয় ভাস্কর্য যেমন রূপের মধ্যে অরূপের কথা বলে বহু পুরাণ ও প্রাচীন গল্পের মধ্যে এমন করেই লুকিয়ে রয়েছে আশ্চর্য সব বৈজ্ঞানিক সত্য।

বহু প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নৈতিকতার তেমন গন্ধ না পাওয়া গেলেও প্রাচীন ইরানীয় গল্পে কিন্তু এর একটা স্বাদ রয়েই গেছে। ইরানীয়রা মনে করত, ভগবান অহুর মজদ আপন মহাত্ম্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। তবে শয়তানও সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল—যার নাম অহ্রমান। তবে এই শয়তানের উপর অহুর মজদ জয়লাভ করবেনই ইরানীদের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

মহাশূন্যতা থেকে জগতের উদ্ভব হয়েছে প্রাচীনকালে কোন দেশেই প্রায় এ ধরনের চিন্তা ছিল না—না ব্যাবিলনে, না মিশরে, না গ্রীসে। তবে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তায় যে এধরনের একটা চিন্তা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছিল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭২·২ নম্বর সূক্তটি পড়লে তা বোঝা যাবে—যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—দেবদেবীদের আবির্ভাব পর্যায়ে তাঁরা শূন্যতা থেকেই জন্ম লাভ করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানও সেই মহাশূন্যতার চিন্তা তেমনভাবে করতে পারেনি।

প্রাচীন উত্তর আমেরিকার রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে অথপচ্কন নামে একটি পরিবার বা গোষ্ঠী ছিল। এরা হাডসন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। উত্তর পশ্চিম আমেরিকাতে জগৎসৃষ্টি নিয়ে এদের মধ্যে অদ্ভুত একটা গল্প প্রচলিত ছিল। তারা সৃষ্টির সকল দায়িত্ব দিয়েছিল একটি দাঁড়কাকের উপর। এই ঘনকালো দাঁড়কাকের চোখে ছিল অগ্নিগোলক, দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমক। পাখার ঝাঁপটে ছিল বজ্রের গর্জন। সমুদ্রে সে যখন অবগাহন করে তখনই ফুটে উঠে পৃথিবী। ফুটে উঠেই ভাসতে থাকে জলের উপর। ধীরে ধীরে তা থেকেই উদ্ভব হয় অথপচ্কন গোষ্ঠীর। ঘটনাটা গল্পের মত মনে হলেও যদি একে আধুনিক Big Bang তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায় —তাহলে সামঞ্জস্য খুঁজে পাবার অভাব হবে না। ঘনকালো কাক হল দেশের (space) বুকে কৃষ্ণগহ্বর অর্থাৎ ব্ল্যাকহোল। চোখের আগুন হল ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত চাপসৃষ্টিজাত বিশৃঙ্খলা—যাকেই বলা হয়েছে আগুন। চোখের বিদ্যুৎচমক হল বিস্ফোরণজনিত তীব্র জ্যোতি। আর ডানার বজ্রগর্জন হল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ—যে শব্দই হিন্দুদের কাছে ওঁ রূপে প্রতিফলিত। পৃথিবী এখানে স্থূলজগৎ—যা মহাশূন্য (সলিল)-এর উপর ভাসমান। আবার তাদেরই মধ্যে আর একটি গোষ্ঠী জগতের উৎস হিসেবে কল্পনা করেছে কুকুরের। আর এই কুকুর তাদের অভিজ্ঞান। প্রাচীনকালে বহু মানবগোষ্ঠীই মনে করত, মানুষের উদ্ভব হয়েছে পশু থেকে। হয়তো ক্রমবিকাশতত্ত্বে তাদের একধরনের বিশ্বাস থেকেই ধারণা হয়েছিল যে, কেউ এসেছে পশু থেকে, কেউ পাখি থেকে ইত্যাদি।

এই আমেরিকানদের মধ্যে ইরোকোইয়ান গোষ্ঠী মনে করত যে, তাদের জন্মদাত্রী প্রথম মহিলা ছিট্‌কে এসে পড়েছিল আকাশ থেকে। এই মহিলাকে যদি তেজরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে এই উপকথা একটি বৈজ্ঞানিক ধারার উপরও দাঁড়াতে পারে। এই মহিলাটি আমাদের আদ্যাশক্তি ঁকালীর মতনও হতে পারেন। কিন্তু নিচে পড়ে দাঁড়াবার মত তার কোন স্থান ছিল না। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে আকাশ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে আসা শক্তির কোন বস্তুসত্তা ছিল না। শেষপর্যন্ত তার পায়ের নিচে বুদ্বুদের মত বস্তুসত্তায় উদয় হয় —(সম্ভবত নেবুলা বা নীহারিকাপুঞ্জ কিংবা ছায়াপথ, নক্ষত্রগ্রহাদির সৃষ্টি হয়)। এবার সেই সূক্ষ্মশক্তি দাঁড়াবার মত স্থান পান। অর্থাৎ স্থূলজগতে এসে কুল (শক্তি) যেমন কুণ্ডলিনী হন, অর্থাৎ গুটিয়ে গিয়ে ঘনীভূত হন—হয়তো তেমন চিন্তার ভিত্তিতেই গল্পটি তৈরি হয়েছিল। এ-সব মরমিয়া অনুভবের প্রতীকী ভাষা—স্থূলবুদ্ধিতে বোঝার ব্যাপার নয়। যেমন আজও আমাদের মহা মহা তান্ত্রিকেরা পর্যন্ত কুলকুণ্ডলিনীর যথার্থ অর্থাৎ বোঝে না, সত্যি সত্যি সাপ বলে ভাবে। হারিয়ে যাওয়া সেই আদিম মানসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা না গেলে এ-সব বোঝাও যাবে না। কেউ কেউ অবশ্য এই শক্তিকে ধরার জন্য উভচর

জাতীয় প্রাণীর একটা ভূমিকারও উল্লেখ করেছে। এই মহাশক্তিকে দাঁড়াবার স্থান করে দেবার জন্য নাকি—ওটার, বীভার দাঁতওয়ালা ইঁদুর এরা সব জলে ডুব দিয়ে মাটি তুলে সেই আদি-জননীকে দাঁড়াবার স্থান করে দেয়। এর মধ্যেও কোন প্রতীকার্থ থেকে থাকতে পারে আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবী ও দুর্গার সিংহবাহনের মত। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ভারতীয় দশাবতারের মত এইসব প্রাণীর মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশতত্ত্বের দিকেই একটা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ক্রমবিকাশ বোঝাবার জন্য আমাদের পুরাণকাহিনীতে রয়েছে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি পশু জাতীয় জীবের কল্পনা—অর্থাৎ স্থলজল থেকে ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভবের কথা।

এই রেডইনডিয়ানদেরই আরেকটি গোষ্ঠী বাস করত নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে উত্তরে চার্চিলরিভার এবং দক্ষিণে পামলিকোসাউন্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এদের নাম এলগোঙ্কুইয়ান। এরাও খরগোসজাতীয় প্রাণীকে সৃষ্টিতত্ত্বে বিরাট ভূমিকা দিয়েছিল। এর সঙ্গে ছিল আলো। কিন্তু এই আলো হল প্রকৃতপক্ষে সূর্য এবং খরগোসরূপী সৃজনশীল শক্তি। এই আলো ও খরগোসের সম্মিলিত রূপকে তারা নাম দিয়েছিল মনিবোশোবা মিকাবো। মিকাবোকে তারা দেখতো শিকারীরূপে—যার কুকুর হিসেবে কাজ করতো নেকড়ে বাঘেরা। একদিন শিকারের সময় তাঁর নেকড়েগুলি হ্রদের জলে হারিয়ে যায়। নেকড়েগুলোকে উদ্ধারের জন্য মিকাবো হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর ফলে হ্রদের জল কূল ছাপিয়ে স্থলভাগ ভাসিয়ে দেয়। মহাপ্লাবনে জগৎই ধ্বংস হয়ে যায়। মিকাবো তখন মাটির (স্থূল জগৎ) খোঁজে একটি দাঁড়কাককে পাঠিয়ে দেন—কিন্তু দাঁড়কাক ফিরে এসে জানিয়ে দেয় যে, কোথাও মাটি নেই। ফলে তিনি ওটারকে নির্দেশ দেন জলের নিচ থেকে যদি মাটি তোলা যায়। ওটারও ফিরে এসে বলে মাটি নেই। এর পরে দাঁতওয়ালা ইঁদুরকে পাঠান জলের নিচে, যদি ছিটেফোঁটাও কোথাও পাওয়া যায়। শেষে ইঁদুর সামান্য একটু মাটি নিয়ে ফিরে আসে। মিকাবো সেই মাটি দিয়েই নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তারপর জীবজগৎ। বর্তমান Astrophysics-এর আলোতে যদি বিচার করা যায় তাহলে ঘটনাটিকে তুলনা করা যেতে পারে Big Crunch-এর সঙ্গে—যাতে মহাপ্রলয় হয়েছিল। মহাজগতে সমগ্র জীবজগৎই তলিয়ে গিয়েছিল আকাশে। সেখানে নতুন করে তৈরি হয়েছিল কৃষ্ণগহ্বর। বস্তুজগৎ তখন কৃষ্ণগহ্বরের মাধ্যাকর্ষীয় টানে এত ছোট হয়ে গিয়েছিল যে, সমগ্র জগৎই তখন হয়তো সামান্য কিছু বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর মাধ্যাকর্ষীয় চাপে সেই ঘনীভূত বস্তুপিণ্ড আবার বিদীর্ণ হয়ে সৃষ্টি করেছিল নতুন জগৎ। এই তো পুরাণ কাহিনী, অবিশ্বাস্য, Mythology—যার অন্তরালে রয়েছে প্রচণ্ড ধরনের বিজ্ঞান ও দর্শন। না বুঝলে বর্বর মস্তিষ্কের ভৌতাকল্পনা মাত্র।

উত্তর আমেরিকায় আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মুস্খোগিয়ান গোষ্ঠী নামে

আর একটি গোষ্ঠী ছিল —যারা আবার বিভক্ত ছিল ক্রীক্‌স, চোকটও, চিকশ, সেমিনোল প্রভৃতি নানা উপগোষ্ঠীতে। মুস্খোগীরা বিশ্বাস করত যে, সৃষ্টির পূর্বে শুধু ছিল—হিন্দুদের কারণসলিলের মত, যার অর্থ শূন্যতা। এই ভয়াবহ শূন্যতার উপর দিয়ে দুটো ঘুঘু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সম্ভবত চৈনিক ইয়াং ও ইনের মত, ভারতে যার নাম প্রাণ ও অপাণ বায়ু। এই উড়ে বেড়ানোকে cosmic chaos-এর মতও মনে করা যেতে পারে। এর ফলে সেই শূন্যতা থেকে ফুটে উঠে একটুকরো ঘাসের ডগা—ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী বস্তুর তন্মাত্র—আদ্য শক্তি—primordial energy. এ থেকেই তৈরি হল শুষ্কভূমি অর্থাৎ বস্তুরূপে ঘনীভূত শক্তি এবং প্রাণীজগৎ। এই সৃষ্টির কেন্দ্রে ছিল একটি পর্বত 'নুন্নেচহ' হিন্দুদের মন্দারপর্বতের মত। এখানেই বাস করতেন প্রাণ-শক্তির অধীশ্বর এমিস্সি। এই পর্বত সম্ভবত সৃষ্টি করেছিল স্তব্ধ শূন্যতার মধ্যে শক্তির আবেগ cosmic chaos—যা থেকে syrmmetry breaking-এর ফলে ফুটে উঠে বিশ্বজগৎ। এরই প্রান্তভাগে সৃষ্টি হয় মানুষের অর্থাৎ সকল জীবের। এই প্রান্তভাগ বিশ্ব-জগতের ঘনীভূত প্রান্তিক অবস্থা। যা লক্ষ্য করেই ভারতীয় বৈষ্ণবেরা প্রাণীকে 'তটস্থা' প্রাণীরূপে কল্পনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তখনও ছিল জল। মূলতঃ আমাদের পৃথিবীতে প্রথম ছিল জলই। সুতরাং জলের উপর স্থলভাগ তৈরি করা হল যাতে মানুষ অর্থাৎ জীবজগৎ দাঁড়াবার ঠাঁই পায়। এইভাবে পৃথিবীতে স্থলের উদয় হল। শুধু হিন্দু সৃষ্টিকল্পনা নয়, আধুনিক বিজ্ঞান নয়, খ্রীষ্টানদের জগৎসৃষ্টিকল্পনার সঙ্গেও মুস্খোগিদের সৃষ্টিকল্পনায় অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া পাওয়া যায়। অবৈজ্ঞানিক মন কি ভাবে যে সৃষ্টির এই গোপনসূত্রের সন্ধান পেয়েছিল কে জানে! জগতে বিজ্ঞানেরও উর্ধ্বে নির্ভেজাল আন্তরসত্তার জন্য—যাকে লালন ফকীর বলেছেন—"আর্শীনগর', মরমিয়া সাধু-সন্তেরা অনেক বেশি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যে সত্যের স্বীকৃতি বর্তমান কোয়াণ্টাম ফিজিক্স প্রতিপদে দিতে বাধ্য হচ্ছে। (মনের জটিলতা না থাকলে সত্য জানার ক্ষেত্রেও কোন জটিলতা নেই।)

রেডইন্ডিয়ানদের আর একটি গোষ্ঠী মিসিসিপির দক্ষিণতীরে অর্থাৎ মিসিসিপি উপত্যকাতে বাস করত। এদের নাম ছিল সিওউয়ান গোষ্ঠী। এদের মধ্যেও ছিল নানা উপগোষ্ঠী—ডাকোটা, উইন্নেব্যাগো, মণ্ডন প্রভৃতি। মণ্ডনদের সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল আরও সুন্দর। তারা মনে করত যে, তাদের বাস-স্থানের নিচে ছিল একটি আন্তসলিল হ্রদ—ফল্গুনদীর মত (বস্তুতঃ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যতই উৎসের দিকে যাওয়া যাবে ততই তার স্থূলতা কমে গিয়ে একটা গ্যাসীয় ও তারলিক অবস্থা দেখা দেবে)। সেখানেই তারা বাস করত। হ্রদের জল ভেদ করে তাদের সেই বাসস্থানে আঙ্গুরলতার শেকড়গুলি ঢুকে যায়—অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরে মহাশূন্যস্থিত চতুপার্শ্বস্থ শক্তি ঘূর্ণায়মান ভঙ্গীতে ঢুকে পরে।

কিন্তু সেই শক্তি সেখানেই স্থিত থেকেছে তাই তো নয়! সেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সৃষ্টির আলোরূপে প্রকাশিত হয়ে—ভারতীয় ভাষায় যাকে বলে বিন্দু। সেই ঘূর্ণায়মানশক্তির সূত্র ধরে সৃষ্টির বীজ বেরিয়ে এসেছে জগৎ রূপে—ভগবদ্গীতার উল্টোবৃক্ষের মত। সিওউয়ানরা একেই কল্পনা করেছে দ্রাক্ষালতার শেকড়রূপে। যাকে ধরে ধরে কিছু মানুষ (সৃষ্টির বীজ) বেরিয়ে আসতে পেরেছিল সেই গহ্বর (Blackhole) থেকে। বেরিয়ে এসেই অবাক হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যময় জগৎকে দেখে। বস্তুতঃ কৃষ্ণগর্ভস্থ শক্তির বহিরাগমন থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য আজকে বিজ্ঞানের যন্ত্রেও ধরা পড়েছে। এই দুঃসাহসী ব্যক্তিরা আবার ফিরে আসে আন্তজগতে অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরে অর্থাৎ Big Crunch-এর ফলে পুনরায় ঢুকে যায় কৃষ্ণগহ্বরে মধ্যে। এ খবর পেয়ে বাকী যারা ছিল তারাও অন্ধকার জগৎ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ পুনরায় Big Bang-এর ফলে Blackhole থেকে নতুন জগতের সৃষ্টি হয়। রসাতলীয় জগতের অর্ধেক মানুষই যখন উঠে এসেছে লতার ডগা বেয়ে বেয়ে, হঠাৎ একটি পাপিষ্ঠা স্থূলকায়া মহিলার ভারে সেই মুহূর্তে ডগাটি ছিঁড়ে যায়। ফলে আরও উর্ধ্বে ওঠার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ যেন চৈনিক তাওবাদে ইয়াং ইনের মত যা কেন্দ্র থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে—তার পরই আবার কেন্দ্রস্থ অভিকর্ষের টানে তাকে ফিরে আসতে হবেই। যাকে বিজ্ঞানীরা বলবেন কৃষ্ণগহ্বরের অভিকর্ষে আবার ফিরে যাওয়া—যাকে বলে Big Crunch. মহাবিশ্বের ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাই এই ধরনের। অনন্ত স্বাধীনতায় জগৎকে সে ভেসে চলতে দেবে না।

এদেরই সঙ্গে গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য আছে এমন এক গোষ্ঠী মিন্নেতারিরা মনে করে যে, আদিপুরুষের উত্থান হয়েছিল হ্রদ থেকে অর্থাৎ Cosmic Water থেকে। তিনি হাতে নিয়ে উঠেছিলেন বাজরার দানা—যেমন সাগরমন্থন থেকে সুধাভাণ্ড হাতে আমাদের ক্ষেত্রে উঠেছিলেন লক্ষ্মী। উঠেছিলেন পদ্মে স্থিতা হয়ে অর্থাৎ নিউট্রন ফিল্ডের প্যাঁচানো দল থেকে Proton ও Electron-এর মত অপেনাআপনিই।

অদ্যাবধি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে আদি আমেরিকাবাসীদের কম করেও একুশটি গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতে যখন এখানে তাদের ছিল অবাধ সাম্রাজ্য তখন তাদের নিজস্ব এক সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল। যে দু'জনকে এরা তাদের আদি উৎস বলে ভাবত তাঁদের নাম দিয়েছিল কোডোয়নপে এবং কয়োটে। এই বিশ্ব তাঁরাই আবিষ্কার করেন এবং এর জন্য উপযুক্ত অধিবাসী তৈরি করার প্রয়াস চালান। এরা কাঠ থেকে একটি মডেলও তৈরি করেন। কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যে ভয়ানক কলহ শুরু হওয়াতে উভয়েই রূপান্তরিত হয়ে যান পশুতে। কোডোয়নপে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন কয়োটেকে। কয়োটের মাথায় ছিল দুষ্টবুদ্ধি। কোডোয়নপের শুভবুদ্ধি। কয়োটে পূর্ব-

পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। কোডোয়নপেকে সাহায্য করেন এক বিজয়ী যোদ্ধা। বহু দৈত্য ও দুষ্টশক্তিকে তিনি দমন করেন। না হলে হয় তো মনুষ্যপ্রজাতি ধরণীর আলোই দেখতে পেত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ শেষপর্যন্ত কোডোয়নপে কয়োটের কাছে পরাজিত হন। এবং পূর্ব দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু প্রথম মানবাকৃতি পুতুলটিকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে তখন আমেরিকান ভারতীয়েরা বেরিয়ে আসে। শুধু নতুন করে গড়া নয়, প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্বকে তৈরি করার কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যে জন্য এদের নিয়ে এমন ধরনের গল্পও আছে, যে— আদিসলিলে একটি নৌকোয় করে ভাসছিলেন কোডোয়নপে ও কোয়োটে। তবে এরা এসেছিলেন কোথা থেকে সে কথা কেউ জানে না। সে কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানও আজ পর্যন্ত জানে না সৃষ্টির মূল উৎস কি। দর্শনও জানে না। এক জায়গায় সবাই এসে শুধু বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে।

বিশ্বসৃষ্টির এই যে কল্পনা ক্যালিফোর্নিয়ার ময়ডুরা করেছিল সেই চিন্তাকেই আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের প্রতিবেশী অচোমওয়িরা। তারা মনে করত, আদিতে ছিল কূলকিনারাহীন সমুদ্র মাত্র। আর ছিল মাথার উপর নির্মল আকাশ। এর উপর হঠাৎ ভেসে উঠল একখণ্ড মেঘ। সেই মেঘ ঘন হতে হতে গড়ে উঠল একটি খেঁকশিয়াল। সেই খেঁকশেয়ালই ভূমিকা নিল স্রষ্টার। তারপর জমে উঠল ঘন কুয়াশা। তা থেকে জন্ম নিল কোয়োটে। ক্যালিফোর্নিয়ার অশোচিমিরা আবার এক্ষেত্রে আরও একটু অভিনবত্ব এনে বলেছে যে, এক সময় মহাপ্লাবনে সবই ডুবে গিয়েছিল। তবে জল নেমে গেলে কোয়োটে নেমে এসে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল নানাধরনের পাখির পালক। তা থেকেই নানা গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের মত এখানে সব কিছু মিলেমিশে যেন অদ্ভুত এক চিত্রকল্প অঙ্কন করেছে। এ চিত্রকল্প বুঝতে পারলে এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নানাধরনের চিন্তার বিস্তার। এতে যেমন আছে সৃষ্টির আদিপর্যায়ের বিশৃঙ্খলা—কারণ সলিল—শুভ অশুভ শক্তির সংগ্রাম, তেমনই আদিম বিশ্বাসের পশুরূপ অভিজ্ঞান, সব। বহুসত্য একত্রে জমে গিয়ে যেন হীরের মত ঝকমক্ করছে। যেন একটুকরো আধুনিক কবিতা—compression.

কলম্বিয়া নদীর ধার ধরে চিনুকন নামে রেডইন্ডিয়ানদের আর একটি গোষ্ঠী বাস করত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল ময়ডুদের মত। গোটাট্ বলে একটি জায়গায় সমুদ্রের ফেনা ভাসমান দেখে কয়োটের ভয় হয় যে, তিনিও ভেসে যেতে পারেন। সুতরাং ফেনপুঞ্জের উপর কিছু, বালুকণা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন,—এখানে একটি প্রান্তর গড়ে উঠুক যাতে ভবিষ্যতে প্রাণীকুল এর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। তবে এদের বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বে সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির উদয় সম্পর্কে আরও সুন্দর বর্ণনা আছে।

নেব্রাস্কা ও আরকান্সাস-এ এদের আরও একটি গোষ্ঠী বাস করত—যাদের নাম ছিল ক্যাড্ডোয়ান গোষ্ঠী। এরা উইচিতা, কিচাই, পনিস প্রভৃতি নানা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ক্যাড্ডোয়ানরা মনে করত যে, তারা মূলত রসাতল থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই রসাতলের যথার্থ অর্থ তাদের কাছে কী ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। হয়তো কৃষ্ণগহবরই ছিল এই রসাতল। প্রথম যে ব্যক্তি রসাতল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি এক বৃদ্ধলোক। তাঁর একহাতে ছিল আগুন ও পাইপ অন্য হাতে জয়ঢাকজাতীয় জিনিষ। এই চিত্র সেই Cosmic Chaos ও মহাবিস্ফোরণের শব্দের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার পেছনে এসেছিল তার স্ত্রী অর্থাৎ আদ্যাশক্তি। এই স্ত্রীর হাতে ছিল শস্যদানা ও কুমড়োর বিঁচি। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল আদ্যাশক্তিনির্গত অণুপরমাণু—প্রকৃতির বীজ। বিশ্বস্রষ্টার তারা নাম দিয়েছিল—Atius Tirawa—যাকে স্পর্শ করা যায় না। যিনি সর্বশক্তিমান। যার গৃহ হল আকাশে। আকাশের পাখি তার বার্তাবহ। এই পাখি হয়তো শব্দবাহী ঢেউ অর্থাৎ শব্দব্রহ্মনের ঢেউ। তিনিই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি তৈরি করেছেন। সব গল্পের একটাই অর্থ দাঁড়ায়—out of chaos came cosmos.

আমেরিকায় আরো একটি বিখ্যাত গোষ্ঠী ছিল যার নাম শোশোনিয়ান গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী নানাভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন, হোপি অথবা মোকি, কোমাঞ্চেস প্রভৃতি। এরা ছড়িয়ে ছিল—অরেগণ থেকে টেক্সাস, এবং নেভাদা থেকে কোলোরাডো পর্যন্ত। মহাবৈশ্বিক শক্তি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং পৃথিবী চিরকালই আছে তাদের এই ধরনের ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। পৃথিবীর কোন এক গহ্বর থেকে মনুষ্যজাতির আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের এ রকম বিশ্বাস ছিল। মৃত্যু হলে মানুষ মাটির নিচে তাদের আদি বাসস্থানে চলে যায় এরকম ধারণাও ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছে পিতারূপী আকাশ এবং মাতারূপা পৃথিবী। এ ধরনের গল্প থেকে কিছুটা বৈজ্ঞানিক সত্যতা হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে তবে সবটাই তার সত্য নয়।

নিউ মেক্সিকোর পুয়েবলো ভারতীয়দের মধ্যে জুনিরা বিশ্বাস করত যে, এই বিশ্ব সৃষ্টি করে যিনি ধারণ করে আছেন তাঁর নাম আওনাউইলোনা। তিনি সময় সৃষ্টি হবারও পূর্বে রহস্যময় এক অন্ধকারের মধ্যে ছিলেন। চিন্তাটুকু আধুনিক Big Bang-তত্ত্বের মত—যার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বস্তুসত্তা এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে ছিল যে, সেখানে না ছিল সময় না দেশ। তিনি নিজের মধ্যে ইচ্ছার তাপ অনুভব করেন—অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের দুঃসহ চাপ অনুভব করেন—এবং নিজের চিন্তাকে বাইরে ছুড়ে দেন অর্থাৎ বিস্ফোরিত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েন। এর ফলে মহাকাশে নেবুলাজাতীয় প্লাজমিক ধূম্রপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়ে। এর পূর্বে যে পাঁচলক্ষ বছরব্যাপী এক মহাশক্তির তীব্রগতিবিস্তার ঘটেছিল শুধু তার উল্লেখ নেই। এর পরে যে আলোটুকু দেখা দিয়েছিল—শুধু সেই আলোর

উল্লেখ আছে—যাকে বলে ভারতীয় চিন্তাতে বিন্দু। এই বিন্দুই হল প্লাজমা-জাতীয় উজ্জ্বল ধুম্রপুঞ্জ। এর পর তিনি সূর্যের রূপ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এই প্লাজমাজাতীয় ধুম্রপুঞ্জ থেকে, ঘূর্ণনের বেগ থেকে, নক্ষত্রগ্রহাদির সৃষ্টি হয়। এরপর ধীরে ধীরে জলের সৃষ্টি হয়। বাষ্পাচ্ছন্ন গ্রহগুলো থেকে ধীরে ধীরে পার্থিব সমুদ্র দেখা দেয়। ধীরে ধীরে সেই সমুদ্র থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়—শ্যাওলাজাতীয় প্রাণ। এর মধ্যেই থাকে স্থূলপৃথিবীর চারটি উপাদান অর্থাৎ মাটি, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ। এই আকাশ হল স্থূল জাগতিক আকাশ যা গ্রহনক্ষত্রাদির চতুর্দিকে বেঁকে থাকে। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সও একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, দেশের মধ্যে কোন ঘনবস্তুর উদয় হলে, দেশ (space) তার চারদিকে বেঁকে যায়। এর পর মৃত্তিকা থেকে পার্থিব প্রাণের জন্ম হয় এবং—সংমিশ্রণ বিমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে প্রাণের ক্রমবিকাশ হতে আরম্ভ করে। চারটি গর্ভ থেকে জীবের উদ্ভব হয়—অর্থাৎ জল, এককোষ, উদ্ভীজকোষ ও জীবকোষ থেকে ধীরে ধীরে আদিমানবের উদ্ভব হয়। তারপর অনিত্য এই সংসারে আদিমানব 'পোশাইয়নক্য'-এর উদ্ভব হয়। তিনি এক গুহা থেকে আরএক গুহা ঘুরে এই দ্বীপসদৃশ ভূমিতে আবির্ভূত হন—অর্থাৎ হিন্দুদের ৮৪ লক্ষ যোনির মত যোনি পার হয়ে মানবরূপ লাভ করেন। তিনি সূর্যদেবতার কাছে, পার্থিব জগতে যিনি প্রাণের উৎস—মানুষ ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ার প্রার্থনা করেন। এই ভাবে জীবজগতের সৃষ্টি হয়। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে আদিম আমেরিকানদের মধ্যে কী অপূর্বভাবেই না আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎবিকাশের কল্পনা দেখা দিয়েছিল। মানুষের আন্তরসত্তা জটিলতামুক্ত হলে বোধহয় এইভাবেই তার মধ্যে সত্যচিন্তার উদয় হয়। নইলে বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স কি ভাবে তাদের জটিল তত্ত্বের মধ্যে সেই আদি মানসসত্তাজাত চিন্তার এমন মিল খুঁজে পাচ্ছে! মরমিয়া ভাবনা কী ভাবে পদার্থবিদ্যার চূড়ান্ত জ্ঞানের সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাচ্ছে?)

মন ধীরে ধীরে সভ্যতার দোলনাস্বরূপ পশ্চিম এশিয়ার দিকে ফিরে গেল। প্রাচীন ব্যাবিলনে এরিডু বলে একটি শহর ছিল। এটি ছিল পারশ্য উপসাগরের মুখে। এখানকার অধিবাসিরা লক্ষ্য করে দেখেছিল যে—নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা ভূমিখণ্ডের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে। যেন গভীর সমুদ্র থেকে মৃত্তিকা উৎক্ষীপ্ত হয়ে উঠছে। সেই থেকেই তাদের মনে হয় যে, জলই হল আদি উপাদান যা থেকে বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার অন্তর্দেশে ছিল উর্ধ্বশির পর্বতশীর্ষসমূহ—যার মাথায় হেলান দিয়ে ছিল আকাশ। তাদের ধারণা ছিল, সেখানে দেবতারা বাস করেন, যেমন ভারতবর্ষে আজও বিশ্বাস হিমালয়শৃঙ্গে দেবতাদের বাস। তাদের আরও ধারণা ছিল যে, ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদী যে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছিল সেখানেই কোন দ্বীপে ছিল ব্যাবিলনীয়দের স্বর্গ, যেখানেই প্রাচীনতমকালে নোয়া জাতীয় মানবেরা বাস করতেন।

ব্যবসাবানিজ্যের মাধ্যমে প্রাচীন ব্যাবিলনের নানা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। ফলে ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতি বেশ উন্নত হতে পেরেছিল। ব্যাবিলনের মৃত্তিকা উর্বর হয়েছিল নদীবাহিত পলির জন্য। সভ্যতা উন্নত হয়েছে সমুদ্র-বাহিত ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য। সুতরাং এই জলকে তারা ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির দেবতা 'ইয়া'র বাসস্থান বলে মনে করত। ধারণা ছিল, তার সুউচ্চ প্রাসাদ ছিল কোন দ্বীপে। যে দ্বীপের নাম দিয়েছিল তারা দু-অজ্গ। সম্ভবতঃ পারস্য উপসাগরের পূর্বতীরে কোথাও তারা এই দ্বীপের কল্পনা করেছিল।

কিন্তু এই উপসাগর যে সবসময়ই বন্ধুর মত ব্যবহার করতো তাতো নয়। বজ্রবিদ্যুতে কখনও কখনও সে ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে দিত দেশ। সমুদ্রের এই ভয়াবহতাকে তারা বলত টিয়ামত্ বা টিয়ামৎ। পুরাণকাহিনীতে একে এরা চিন্তা করত ড্রাগনরূপে। ছন্দময় বিশ্বের বিপরীত রূপে একে দেখে তারা ভাবত শয়তান। কিন্তু জগৎ-এর উৎসস্বরূপ গভীর সমুদ্রকে ভাবত 'অপ্শু' রূপে। সংস্কৃত অপ্ অর্থাৎ জল শব্দের সঙ্গে এখানে এর একটা অদ্ভুত শাব্দিক সামঞ্জস্যও খুঁজে পাওয়া যায়। এই অপ্শু ছিল তাদের কাছে ছন্দময় বিশ্বের মত। টিয়ামতের অস্তিত্ব ছিল তাদের মতে অপ্শুরও পূর্বে। সম্ভবত এরা আদিবিশৃঙ্খলা থেকে শেষপর্যন্ত ছন্দময় জগতের চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিল - যাকে গ্রীক ভাষায় বলা যায় Cosmic Chaos On Cosmos—অর্থাৎ out of chaos came cosmos. এই cosmos-ই হল ছন্দময় বিশ্ব—কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিস্ফোরণের বেগে যা বেরিয়ে এসে নৃত্যপরা হয়েছিল। বিস্ফোরণের গতি ফুরিয়ে গেলে আবার তা কৃষ্ণগহ্বরে ফিরে গিয়ে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চপে অস্থির হয়ে বিস্ফোরণপূর্ব চঞ্চলতা অর্থাৎ chaos-এর সৃষ্টি করবে। এই বিশৃঙ্খল টিয়ামতকে অপ্শু আটকে রেখেছিল দেয়াল দিয়ে। ব্যাবিলনীয়রা তাই চিন্তা করত—এই দেয়াল ভেঙে গেলে অর্থাৎ ছন্দময় বিশ্ব উৎসের মহাকর্ষীয় টানে আবার সেই আদিম কৃষ্ণ-গহ্বরে ঢুকে গেলে টিয়ামতেরই রাজত্ব ফিরে আসবে অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের এই চিন্তা পরবর্তীকালে সুমেরিয় ও ব্যাবিলনীয় দ্বৈত ভাষায় সুন্দররূপে ফুটে উঠেছিল। শুধু ইয়ার পরিবর্তিত নাম মেরোডক-এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। আর এই কবিতাটির সঙ্গে ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্তের অপূর্ব এক মিল আছে। স্মৃতির তরঙ্গে তরঙ্গে কবিতাটি যেন ভেসে আসতে লাগল। কোন্ মরফোজেনেটিক ফিল্ড বা আদি স্মৃতিভাণ্ডারের সঙ্গে যে আমরা জড়িয়ে আছি কে জানে! সেখানে মহাপ্রাচীন স্মৃতির ভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় যোগসূত্র রয়েইে গেছে—যাকে মনোবিজ্ঞানী য়ুঙ্ বলেছেন Colleetive Unconscious. মনে পড়তে লাগল লাইন কয়টি :

তখন কোন দিব্যগৃহ ছিল না, কোন দিবাস্থানে দেবতাদের
বাসস্থানও তৈরি হয়নি।

কোন নলখাগড়াও গজায়নি। কোন্ উদ্ভিদও রোপিত হয়নি।
কোন ইঁট তৈরি হয়নি বা ইষ্টক নির্মিত কোন গৃহ।
কোন শহর বা নগরেরও আবির্ভাব ঘটেনি ;
মহাসাগরের জন্ম হয়নি, না এরিডু শহরের
না পবিত্র দেবতাদের লীলাক্ষেত্রের (ব্যাবিলন)।
তখন চতুর্দিকে ছিল শুধু জল, গভীর আদিম জলরাশী।
সেই জলের মধ্যে ছিল স্রোত অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা।

এখানে ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের পুরুষ-প্রকৃতির একটি ছায়াও আছে। পুরুষ হলেন অপশু অর্থাৎ মহাশূন্যতা। প্রকৃতি আদ্যাশক্তি (Tiamat)—কালী। এই দুয়ের মিলনেই সৃষ্টি। ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিসূক্তে অপ্শুকে ঔরসদাতা (begetter) হিসেবে এবং টিয়ামৎকে সকলের জননী বা জগজ্জননী (Mother Of All) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের Big Bang-তত্ত্বের সঙ্গেও এইজন্যে এর মিল আছে। তবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন পুরাণকাহিনীতে যেমন এক নামের নামান্তর ঘটেছে, ব্যাবিলনীয় পুরাণ কাহিনীতেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। যেমন টিয়ামত্ কখনও হয়েছে 'তবথে' কখনও—সুম্মু। টিয়ামত্কে সৃষ্টির পূর্বে মহাদেশের উপর গভীর অন্ধকাররূপেও দেখানো হয়েছে—যে-কারণে-ভারতবর্ষে দেবী কালী কালোবর্ণ ধারণ করেছিলেন। ওল্ড টেস্টামেণ্টেও সৃষ্টির আদিতে এই অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে—darkness upon the face of the deep. (Gn 1[2])।

কারণসলিলে ভাসমান হিন্দুদের নারায়ণের সঙ্গে ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক মিল আছে। নারায়ণ যেমন মধুকৈটভহত্যা করে দেশের বুকে অর্থাৎ আদিসলিলের বুকে স্থূলজগতের উপাদান তৈরি করেছিলেন তেমনই ব্যাবিলনীয় পুরাণকাহিনীর সৃষ্টিতত্ত্বেও দেখা যায় যে, বেল মেরোডক টিয়ামত্কে হত্যা করে সৃষ্টির সূচনা করছেন।

ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বে ভারতীয়দের মত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও কল্পনা আছে। এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাদের কাছে হয়েছে অনু অর্থাৎ পুরুষ (নির্বিকার) যাকে ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এন্‌লিল আবহাওয়া মণ্ডলের অধীশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণু এবং ঈয়া অর্থাৎ এরিডুর দেবতা, মানে আমাদের নটরাজের মত, অর্থাৎ শিব। বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অনু এখানে নিউট্রন ফিল্ড, এনলিল আকাশ এবং ঈয়া হলেন kinetic energy. বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অপরদিকে তাকালে একে মনে হবে তিনটি কালের মত—যেমন, ব্রহ্মা অতীত অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, বিষ্ণু যিনি বর্তমান অর্থাৎ বর্তমান জগৎ এবং মহেশ্বর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ভবিষ্যতে যিনি ধ্বংস করবেন। বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে এরা তিনজন Three Fundamental Particles Of The Universe—নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন।

একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এখানে ভারতীয়দের সমুদ্রমন্থনের গল্পেরও একটা গন্ধ পাওয়া যাবে যখন দেখা যাবে যে, টিয়ামতকে রসাতলের বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী ড্রাগন (সর্প) হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং সাগর থেকে একটি পর্বতের উত্থানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। (সমুদ্রমন্থন যে আদি সত্তায় অর্থাৎ Supervoid-এ অন্তররূপে অবস্থিত তেজের ঘূর্ণন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—যে ঘূর্ণনের প্রমাণ এখন পাওয়া যাবে বিশ্বজগতের ঘূর্ণন থেকে। আর তেজের এই ঘূর্ণন থেকেই জেগে উঠেছে নীহারিকাপুঞ্জ-নক্ষত্রগ্রহাদি স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কলোক। অনেকে মনে করেন, ঘূর্ণায়মান আমাদের ছায়াপথটিকেই প্রাচীনকালে ক্ষীরসমুদ্ররূপে কল্পনা করা হয়েছিল—যার মধ্য থেকেই জেগে উঠেছে নক্ষত্র গ্রহ ইত্যাদি)

প্রাচীন বৌদ্ধরা সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে সৃষ্টির অনন্ততা ও ও অ-অনন্ততা সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি তেমন তর্কবিতর্ক না করে এর পেছনে একটি নৈতিক ও মনোস্তাত্ত্বিক অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির শেষ কোথায় এ কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি মানুষ কি ভাবে সংস্কার অর্থাৎ কামনাবাসনা বা প্রাক্তন অস্তিত্ব থেকে এসেছে সেই কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি এই বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে, বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ কেউ এ বিষয়ে সচেতন। অর্থাৎ মানুষের মানসপ্রেক্ষাপটে এর অস্তিত্ব ছাড়া যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই।

আদিবৌদ্ধেরা ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেছেন এ তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। অপরপক্ষে 'বস্তুর স্বভাবে সৃষ্টি' হয়েছে এ তত্ত্বেও আস্থা স্থাপন করে নি। একটা মানসক্রিয়া থেকেই জগৎকে জগৎরূপে প্রতীয়মান হয় এবং মানসক্রিয়া লয় হলেই জগতেরও লয় ঘটে এরূপ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।

বৌদ্ধরা বিশ্বতত্ত্বকে বলতেন লোকপ্রজ্ঞপ্তি। বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদীরা দু'ধরনের বিশ্বকল্পনা করেছেন -ভাজনলোক অর্থাৎ আধরজগৎ অর্থাৎ যে জগতে জীব বা সত্ত-এর বাস এবং সত্ত্বলোক অর্থাৎ জীবলোক। সুতরাং একটিতে রয়েছে বিশ্বতত্ত্ব, আর একটিতে জীবতত্ত্ব। সত্ত্বলোক তিনভাগে বিভক্ত—(১) অবাস্তবিক প্রাণ অর্থাৎ আরূপ্য (২) বাস্তবিক প্রাণ—রূপিন, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম বস্তুসত্তা দিয়ে গঠিত। বিশ্ব-আধারের উচ্চস্তরে এর অস্তিত্ব। (৩) বাস্তব প্রাণী—কামাবচর কামভুজ বা কামপ্রভাবিত। এরা বিশ্ব-আধারের নিম্নস্তরে থাকে।

আবার অপরপক্ষে জীবকে পাঁচ ভাগেও ভাগ করা হয়েছে—যার মধ্যে দুটি শুভ তিনটি অশুভ। এরা আবার উপভাগে বিভক্ত। তিনটি অশুভ বিভাগের মধ্যে যে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম পড়ে দেবশ্রেণী, এরা হলেন জৈব প্রাণের প্রথম উপাদান। তার পরেই দ্বিতীয় ধাপে এসেছে মানুষ। তৃতীয় ধাপে প্রেত। চতুর্থ ধাপে পশু। পঞ্চম ধাপে অষ্টনরক।

আদি বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে যে বিশ্বতাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায় তা এসেছে বৌদ্ধপূর্ব ধারণা থেকে। আনন্দ যখন গৌতম বুদ্ধকে ভূকম্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন : – এই মহাভূখণ্ড জলের উপর স্থিত। জল বায়ুর উপর স্থিত। বায়ু দেশের ওপর স্থিত। যখন বায়ু শক্তিশালী হয়ে গতি শুরু করে, জলে তরঙ্গ উঠে, তখন তরঙ্গায়িত সমুদ্রে পৃথিবী কেঁপে উঠে। তত্ত্ব হিসেবে ব্যোম (দেশ) থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব পর্যন্ত তত্ত্ব অনেকটাই সত্য হলেও ভূ-কম্পনের কারণ হিসেবে বুদ্ধ যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তা বর্তমান বিজ্ঞান কখনই স্বীকার করে নেবে না। বরাহের দন্তে পৃথিবী ধৃত হয়ে থাকার চিন্তার মত এও এক ভ্রান্তকল্পনা সন্দেহ নেই। তবে যদি গভীর কোন রূপকার্থ থেকে থাকে তা আলাদা। কিন্তু সে রূপকার্থের অর্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

একজন ব্রাহ্মণও অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম কাশ্যপ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পৃথিবী কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? বুদ্ধ বলেছিলেন, বৃত্তায়িত জলের উপর। এই বৃত্তায়িত সলিল বলতে তিনি বঙ্কিম দেশ (Space)-কে বুঝিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে একথা বর্তমানে আমরা জেনেছি যে, দেশের বুকে কোন ভারি পদার্থের উদয় হলে দেশ তার চতুর্দিকে বেঁকে যায়। গৌতম বুদ্ধের বৃত্তায়িত সলিল সেই ক্ষেত্রে একটা ভাবনার উদ্রেক করে বৈকি। বৃত্তায়িত সলিল কার উপর দাঁড়িয়ে আছে? বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলে—বায়ুর উপর। এই বায়ুকে যদি তেজ হিসেবে ধরা যায় তাহলে চিন্তাটিকে সত্য বলেই মনে হয়। সেইক্ষেত্রে বায়ু এখানে দেশের সঙ্গে মিশে বৃত্তায়িত বর্ধনশীল ব্রহ্মনতুল্য। বুদ্ধের মনে যদি এরকম কোন চিন্তা থেকে থাকত তবে তা সত্য। এরপর কাশ্যপ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বায়ু কার উপর নির্ভরশীল? বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন, ব্যোমের উপর। সম্ভবত এই ব্যোমকে তিনি মহাশূন্যতারূপে কল্পনা করেছিলেন। তাই কাশ্যপ যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই ব্যোম কার উপর নির্ভরশীল? বুদ্ধ বলেছিলেন, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ঠিক অনুরূপভাবেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক গার্গীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে এর উপরের উত্তর কারো জানা নেই। না ছিল অতীতের না আছে বর্তমানের। এখানে নির্ভরতার একটিই মাত্র ভিত্তি আছে—বিশ্বাস। বিশ্লেষণ এখানে অচল—দার্শনিকের কাছেও, বৈজ্ঞানিকের কাছেও। তবুও গৌতম বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন, ব্যোম কারো উপর নির্ভরশীল নয়।

একমাত্র প্রাচীন কেল্টজাতির মধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ড্রুইড পুরোহিতেরা বলতেন, আত্মা এবং বিশ্ব দুই-ই অমর। একদিন শুধুমাত্র অগ্নি ও জলই থাকবে। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলের কেল্টরা আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন, আমরা শুধু একটি জিনিসকেই ভয় পাই—কোনদিন না আকাশ মাথার উপরে ভেঙে পড়ে। এ ধরনের চিন্তার মধ্যে দিয়ে বিশ্বসৃষ্টির কোন হদিশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

তবে বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত চৈনিক-চিন্তা সত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তোলার মত। চৈনিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হলে এ ধরনের চিন্তাকে আধুনিক চিন্তা বলেই মনে হবে। কিন্তু চৈনিকরা এই চিন্তার উৎসকে স্মরণাতীত অতীতে ঠেলে দেবার পক্ষপাতি। চৈনিকরা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য কয়েকটি জ্যামিতিক রেখাতে এঁকে আমাদের বোঝাবরে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা অভগ্ন ও ভগ্নরেখার সাহায্যে ত্রিরেখীয় চিত্র এঁকে সৃষ্টিসম্পর্কে তাঁদের তত্ত্ব আমাদের আছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের মতে অভগ্নরেখা হল পুরুষ বা ইয়াং-এর প্রতীক এবং ভগ্নরেখা ইন্ বা স্ত্রীর প্রতীক। সৃষ্টিতত্ত্বের এই জ্যামিতিক তত্ত্বের উদ্ভাবক সি-পেহ্ (Si Peh)। তিনি ত্রিরেখীয় জ্যামিতিক রেখাগুলিকে বিচিত্র আটটি ভাগে ভাগ করেছিলেন।

এই যে ত্রিরেখীয় চিত্রে বিশ্বরহস্যের বক্তব্য তিনি রেখে গিয়েছিন তাকে পরি- 'পরিবর্তনের গ্রন্থ' (Yi-King) নামে বলা হয়। 'আদিতে পুরুষ, পুরুষ থেকে প্রকৃতির উদ্ভব, কিছুদূর পর্যন্ত পুরুষের প্রাধান্য, শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই নৃত্য' এই বক্তব্যই এই রেখাগুলিতে ফুটে উঠেছে। এতে এইটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থিতি, গতি, গতি স্থিতি এই ভাবে অগ্রসর হতে হতে প্রচণ্ড এক গতির মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে চিরপরিবর্তনের খেলা এই-ই হল বিশ্বপ্রকৃতির মৌল রহস্য। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অণুপরমাণুর অক্লান্ত মিশ্রণ ও বিভাজনের চিত্রই এতে ফুটে উটেছে যার সন্ধান অব-অণু জগতে খুঁজে পাচ্ছেন বর্তমান কোয়াণ্টাম ফিজিসিস্টরা। বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষার আগে এই সত্যের সন্ধান শুধুমাত্র অন্তরের অনুভূতি দিয়েই মরমিয়া চৈনিক সাধক সি-পেহ্ বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধচিন্তার সঙ্গেও এই ট্রিগ্রামীয় চিন্তার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। পরবর্তীকালে চৈনিক দার্শনিকেরা এই তিনটি রেখার মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্য ও মানুষের গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন। এ হয়তো ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যচিন্তার সৎ+চিৎ+আনন্দের মত কিংবা আধুনিক কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের জগৎ-উপাদান তিনটি ফানডামেণ্টাল পার্টিকুলের মত।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চৈনিক সন্ন্যাসী চু-সি হয়তো এ থেকেই বিশ্বতত্ত্বে নতুন চৈনিক উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ট্রিগ্রাম থেকে শেষপর্যন্ত হেক্সাগ্রাম বা ষড়রেখীয় চিত্র ফুটে উঠেছে।

চু-সি অবশ্য সৃষ্টির আদি অবস্থা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। তিনি শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, বর্তমান বিশ্ব পূর্ববর্তী বিশ্বেরই প্রতিফলন মাত্র। কোন একটি বিশ্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আবার তার জায়গায় নতুন বিশ্ব গজিয়ে ওঠে। কি ভাবে প্রথম বিশ্বের উদয় হয়েছিল তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন তার নাম প্রাকৃতিক আইন—Lee এবং মৌল শক্তির তন্মাত্র—Chee. এই আইনের আধার কি, বা মৌলশক্তিই বা কোথা থেকে উদ্ভুত হয়েছে তা নিয়েও তিনি তেমন মাথাব্যথা করেন নি। তবে প্রাকৃত

জগতের উৎপত্তির মূলে যে রয়েছে Chee একথা তিনি স্বীকার করেছিলেন। এই মৌলশক্তিকে তিনি কিছুটা বাষ্পীয় বা বায়বীয়রূপে অনুভব করেছিলেন। এর সৃজনশীলতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন Lee-এর মধ্যে। এই Lee বা প্রকৃতি সময় সৃষ্টি হবার আগেই ছিল বলে তার ধারণা—সম্ভবত Blackhole-এর কৃষ্ণ গহ্বরস্থ সুপ্তশক্তির মত। তবে এই প্রকৃতির উদ্ভবের আগে থেকেই এক ধরনের শৃঙ্খলা ছিল। জানিনা এই শৃঙ্খলাকে তিনি কৃষ্ণ গহ্বরস্থ—symmetry বলে ভেবেছিলেন কি না। কখনও কখনও Chee-এর প্রাধান্যের খেলা থেকেই ধনাত্মক ও নঞর্থক Yang ও Yin-এর উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। কখনও একে মনে করা হত আলো এবং ছায়া। কখনও স্বর্গ এবং মর্ত্য। কখনও পুরুষ ও মহিলা প্রভৃতি। এদের বিপর্যয় বা পরিবর্তনশীলতাই 'তাও'—প্রাকৃত পদ্ধতি। এটাই ফুটে উঠেছে চারটি ঋতুতে বৃত্ত সৃষ্টি করে ঘূর্ণায়মানতার আবেগ নিয়ে। দেখা দিয়েছে রাত্রি ও দিন রূপে। এই ইয়াং ও ইনের গর্ভে রয়েছে পাঁচটি উপাদান—ধাতব, কাষ্ঠীয়, জলীয়, আগ্নেয় এবং পার্থিব। এর মধ্যেও অগ্নিই সহজতম উপাদান। প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যেই রয়েছে ইয়াং ও ইনের গুণ। প্রত্যেকেই প্রাকৃত নিয়মাবদ্ধ। এই দুয়ের পারস্পরিক সংযোগে ঘূর্ণায়মান বৃত্তের কেন্দ্রে এক ধরনের সূক্ষ্ম বস্তুসত্তা জমে উঠে। এরই ফলে মৃত্তিকার উদয় হয়। এই বস্তুসত্তার মধ্যে যেগুলি হাল্কা সেগুলি উঠে যায় জগৎবৃত্তের প্রান্তভাগের দিকে এবং সেখানে স্বর্গ রচনা করে। ঘূর্ণায়মান বৃত্তের কেন্দ্রে মৃত্তিকা গতিহীন থাকে। কিন্তু স্বর্গ অক্লান্তভাবে ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রসহ ঘূর্ণায়মান।

ইয়াং ও ইনের অতিসূক্ষ্ম তন্মাত্র দিয়ে অসংখ্য প্রাণসত্তার বীজ তৈরী হয়। প্রথম তৈরি হল উভলিঙ্গসম্পন্ন প্রাণী—যা পরবর্তীকালে বিভক্ত হয়ে পুরুষ ও রমণীর জন্ম দেয়—যা থেকেই এসেছে বর্তমান মানব গোষ্ঠী।

প্রথম দিকে চৈনিকরা সৃষ্টির প্রশ্ন নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি। প্রথম দিকে এই জন্য এসেছিল ত্রিরেখীয়-'Yi'-এর চিন্তা। পরে অনেক বৃত্তাকার তাওয়ের জ্যামিতিক চিত্র।

এই চিত্রে মৌলশক্তির যে তন্মাত্র তার পারস্পরিক ক্রিয়া ও অবিচ্ছিন্ন ঘূর্ণন দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। Chucius দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাকৃত আইনের ক্রিয়াশক্তি মৌলশক্তিকে গতিময় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছে। এর সঙ্গে ভারতীয় বিন্দুতত্ত্বের কিছুটা মিল আছে। অন্ধকার গহ্বর থেকে ফুটে উঠে এই বিন্দু পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে একত্রে যুক্ত থেকে যে ঘূর্ণন সৃষ্টি করে তা থেকেই ফুটে উঠে বিশ্বজগৎ। বৈষ্ণবদের কাছে এই তাও-এর নাম আনন্দ—যেখানে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ত্রিভঙ্গ হয়ে। এই ত্রিভঙ্গ হল তিনগুণ যুক্ত সত্তা—সত্ত্ব, রজ ও তম। যে তিনগুণে ক্ষোভ দেখা দিলে পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই জন্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ত্রিভঙ্গ। চৈনিকদের কাছে

এইই ত্রিভঙ্গরেখাদ্বারা বিভক্ত বৃত্ত—'তাও'—যার একদিকে রয়েছে ইয়াং অপর দিকে ইন্। শৈবরা একেই দেখেছেন শিবলিঙ্গ হিসেবে। ঘূর্ণনযুক্ত পুরুষ ও প্রকৃতি একত্রে যুক্ত—যা-ই বৃত্তের পরিধি ছড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই বৃত্ত বর্ধিত হয় এবং তার পর স্ফীতমান Black-hole-নির্গত জগতের মত, বেগ ফুরিয়ে গেলে—Big Crunch-এর মুখে পড়ে প্রলয় ঘটাবার পর সংস্কারের সংঘাতে পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে।

পঞ্চ তন্মাত্রময় মানুষের মৌলশক্তি এই তাওয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক আইনদ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে। এই জন্য মানুষকেও ক্ষুদ্রবিশ্ব বলা হয়। সেই জন্য চৈনিকরা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দৈবীসত্তা রয়েছে। কোন মানুষের মধ্যে ইয়াং (সত্ত্বগুণ) বেশী প্রবল। কারো মধ্যে বা প্রকৃতি (রজ ও তম গুণ)। ইয়াং প্রভাবপূর্ণ মানুষেরাই ঋষি হয়। তামসগুণ প্রভাবিত মানুষের মধ্যেই ইন্ প্রবল। প্রকৃতির মধ্যে যেমন ঋতুর লীলা আছে - গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত তেমনই মানুষের মধ্যেও রয়েছে ভ্রূণাবস্থা শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। মৌল প্রাণশক্তি যাকে বলা হয়—Chee তা ফুরিয়ে গেলে বিশ্ব এবং মানুষ উভয়েরই মৃত্যু হয়। সুতরাং মানুষের উচিত প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। প্রকৃতির এই নিয়ম অনুসরণ করলে মানুষ যথার্থ সময়ে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় জগতের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাওবাদের মুখ্য প্রবক্তা লাও-জে, বা কনফুসিয়স, কিংবা Chucius কিছুই বলেন নি। সম্ভবত তাঁরা দার্শনিক চিন্তা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে. মৃত্যু মানেই আদ্যাবিশৃঙ্খলার মধ্যে ফিরে যাওয়া। ভাবতে অবাক লাগছে ওঁরা কি Blackhole-এর অভ্যন্তরস্থ বিশৃঙ্খলা বা Chaos-এর কথা জানতেন? উৎপত্তির এই মূল ক্ষেত্রকেই তাঁরাও অন্যান্যদের মতই স্বর্গ বলেও কল্পনা করতেন। উপনিষদে এই মূল ক্ষেত্রকে চিন্তা করা হয়েছে পরম শান্ত অবস্থা হিসেবে। অথচ তারই ভিতর থেকে ইচ্ছার উত্তাপে বা কামের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল—একথাও তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং—প্রশান্তির মধ্যেই যে রয়েছে অশান্তি এ-কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু উচ্চ দার্শনিক আদর্শ কোন দেশেই চিরদিন তার নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ নিয়ে থাকতে পারেনি। সাধারণ মানুষের জন্য—সাধারণ গল্প হয়ে দেখা দিয়েছে। একেই বলা হয় পুরাণকাহিনী—Mythology বা অবিশ্বাস্য গল্প। সুতরাং চীনেও কালক্রমে সাঙ বা সুঙ রাজবংশের সময়ে প্রথম মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে গল্প সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই গল্পের মধ্যেও মহৎ তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে—যারা বুঝতে পারে বোঝে। যারা বুঝতে পারে না তারা গল্পের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। চৈনিক দর্শনলব্ধ সত্য পান-কু-র মধ্যে অদ্ভুত এক গল্পের রূপ লাভ করেছে। এই গল্পে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছিল একটি ডিম্ব—Cosmic Egg. এই ডিম্বের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা—Chaos. এই

বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভাসমান ছিলেন পান-কু—অপরিস্ফুট দৈবী ভ্রূণ। একদিন এই ডিম ফেটে গিয়ে পান-কু বেরিয়ে পড়েন। তিনি বেরিয়ে আসেন বর্তমান মানুষ অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় হয়ে। তাঁর হাতে ছিল হাতুড়ি ও বাটালী। এই দিয়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। গল্পটিকে যদি আধুনিক Big Bang তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এর সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। Big Bang তত্ত্বে—Blackhole-এর অভ্যন্তরে ছিল প্রচণ্ড চাপসৃষ্ট অস্থিরতা বা Chaos. সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটে তা থেকেই Symmetry ভঙ্গ করে বেরিয়ে আসে চারটি শক্তি—যেমন strong nuclear force, weak nuclear force, electro magnetic force এবং gravity. একেই বোধহয় বলা হয়েছে পান-কুর চতুর্গুণ বৃহৎ অবস্থা। তাঁর হাতুড়ি বাটালী হল অণুপরমাণু, যেগুলির পারস্পরিক মিশ্রণে স্থূলজগতের উৎপত্তি।

সৃষ্টি নিয়ে চীনে আরও পৌরাণিক কাহিনী আছে। এই গল্পের সৃষ্টি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ। এতে বলা হয়েছে, স্বর্গ ও মর্ত্য তৈরি হবার আগে সবই ছিল আকৃতিবিহীন। সেই মহাশূন্যতা থেকে বেরিয়ে এল আলো। সৃষ্টি হল স্বর্গ। যে অণুপরমাণু স্থূলসত্তাযুক্ত ছিল তাইই সৃষ্টি করল স্থূল বস্তু। অতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণু—একে অপরের মধ্যে মিশে যেতে পারল। কিন্তু ভারি-ও মলিন বস্তুর পক্ষে ঘনীভূত হওয়া কঠিন হল। ফলে প্রথম তৈরি হল স্বর্গ। পরে মর্ত্য। যখন স্বর্গ ও মর্ত্যের সঙ্গে শূন্যতা যুক্ত হল বা শূন্যতার সঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্য যুক্ত হল—তখন ছিল শুধু আকৃতিবিহীন সরল এক অবস্থা। সেই সরল নির্ভেজাল শূন্যতা থেকে আপনাআপনিই বেরিয়ে এল প্রাণসত্তা। এই প্রাণসত্তা (neutron field) ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। সব কিছু সেই একের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বেরিয়ে এল নানা রূপে।

এই যে রূপক গল্প এও কিন্তু সহজ একটা রূপক গল্প নয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সৃষ্টিরহস্যের সব সত্যই রয়েছে এখানে। নির্ভেজাল দেশ ও কাল থেকেই অণুপরমাণুর উদয়। প্রথম মূলসত্তা হল নিউট্রন ফিল্ড—যাকেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় ব্রহ্ম। নিউট্রন ফিল্ড থেকে আপনাআপনিই ১২ থেকে ১৬ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসে প্রোটন ও ইলেকট্রন। প্রোটন ও ইলেকট্রনের বিভিন্ন সংখ্যায় পরস্পর মিলনের মধ্যে থেকেই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি নানা অণুর সৃষ্টি হয়। সুতরাং গল্পের আকারে বলা হলেও অদ্ভুত এক বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে রয়েছে এর মধ্যে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায় এমন প্রাচীনতম যুগে চীনে ঈশ্বর সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁকে দেখানো হয়েছে 'শাঙ্-তি'-রূপে। তখন তাঁর স্থান ছিল চৈনিক শাসকদের মানসক্ষেত্রে। কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌ রাজবংশের আমলে ঈশ্বরের পরিবর্তে স্বর্গ ও মর্ত্য শব্দের অবতারণা

ঘটে। ঈশ্বর তখন প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। ফলে ঈশ্বর চলে যান দূরে, আরও অনেক দূরে। পরবর্তীকালে যেমন, কনফুসিয়াসের সময়ে এই দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। Chucius-এর আমলে এই দূরত্ব এতটাই বেড়ে যায় যে—ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হয়ে দাঁড়ান। Chucius ঈশ্বরকে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বললেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে অস্বীকার করেন তা নয়। মূলস্রষ্টা হিসেবে তাঁর অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করে নেন। ঈশ্বর মৌলশক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়মে বিভূষিত করেন। এবং তারপরই স্বয়ংক্রিয় সৃষ্টির কথা বলেন। সৃষ্টির পর তিনি এক্ষেত্রে আর নিজে সরাসরি কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। এতে যেন ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বৈতবাদের সুর শোনা যায়—যেখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার পর তাকে পরিচালনা করার জন্য প্রাকৃতিক আইন সৃষ্টি করেন। এই প্রাকৃতিক আইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁরও আর থাকে না। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তখন প্রাকৃত আইনের অধীনেই ন্যস্ত হয়। ঈশ্বর নিরপেক্ষ অসহায় দর্শকের মত বসে থাকেন মাত্র। ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তার সূত্র এরপর ব্যক্তিমানুষের হাতে সমর্পণ করা হয়। যে যেমন চিন্তা করে। তবে সাধারণ মানুষের চিন্তাকে Chucius-ও দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি—যারা চিন্তা করত যে, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। জাতি, মানুষ সবার ক্ষেত্রেই তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর নির্দেশ কার্যকর করার জন্য যুগে যুগে তিনি ধরাধামে তাঁর দূতদের প্রেরণ করেন। সুতরাং সেদিন পর্যন্ত চৈনিক সম্রাটেরা ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকতেন স্বর্গের দিকে। প্রার্থীরা অতীন্দ্রিয় শক্তির কাছে প্রার্থনা জানাতেন তাঁদের বিপদমুক্ত করার জন্য। সুতরাং সেদিন পর্যন্ত চীনে অত্যুচ্চ দার্শনিক চিন্তার পাশে লোকায়ত দর্শনও সমানভাবে প্রচলিত ছিল।

আদিপর্বের খ্রীষ্টানদের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রশ্ন নিয়ে তারাও তেমন মাথা ঘামায়নি। তারা তখনও ইহুদীদের বিশ্বসৃষ্টির বিশ্বাসের উপরই আস্থা স্থাপন করে ছিল।

ইহুদীদের বিশ্বসৃষ্টিসম্পর্কিত বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে জেনেসিসে (Gn.[1])। ইজরায়েলের ঈশ্বর যেহবা তাঁর হাতের তালুতে জলের পরিমাপ করেন। স্বর্গকে গলিয়ে ছড়িয়ে দেন। তুলাদণ্ডে পৃথিবীর ধূলিকণা মেপে দেখেন এবং হাতের তালুতে ওজন করে দেখার চেষ্টা করেন—পাহাড় পর্বতের ভার কতটুকু। বৃত্তাকার পৃথিবীর উপর তিনি বসে থাকেন। পৃথিবীর উপর স্বর্গকে তিনি একটি পর্দার মত টানিয়ে দেন। এই পর্দা মানুষের মাথার উপর শিবিরের মত কাজ করে। সদম্ভে ঘোষণা করেন, আমি যেহোবা,—আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আমিই আলো সৃষ্টি করেছি, করেছি অন্ধকার সৃষ্টি। আমিই দিয়েছি শান্তি, আমিই প্রদান করেছি শয়তান। সবকিছুরই স্রষ্টা আমি।

যেহোবার এই উক্তি অনুসারেই আদিখ্রীষ্টানরা জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে কল্পনা

করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনাতেও এই বিশ্বাসের সুরই ফুটে উঠেছে —'হে ঈশ্বর তুমিই স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করেছ, সাগর সৃষ্টি করেছ—এবং এর মধ্যে যা আছে সবই তোমার সৃষ্টি (A-4°ㄴ)। মথি কথিত সুসমাচারে তাই স্বয়ং খ্রীষ্টের বিশ্বাস এই ভাবে ফুটে উঠেছে : স্বর্গ এবং মর্ত্যের অধিপতি ঈশ্বর—ভাল মন্দ সব কিছুরই উপর তাঁর সূর্য সৃষ্টি করেছেন। পাপী ও পুণ্যবান সবার উপরই তিনি সমভাবে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করেছেন।' খ্রীষ্টের স্বর্গীয় পিতার কৃপাদৃষ্টি আকাশের পাখি থেকে মৃত্তিকার তৃণ পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে প্রসারিত। এই ঈশ্বর প্রেমময়। সেন্ট পল বলেছেন—'তাঁরই মধ্যে আমরা বাস করি। চলাফেরা করি। আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব তাঁরই মধ্যে বিরাজমান।

ধীরে ধীরে খ্রীষ্টীয় চিন্তায় একটা পরিবর্তন আসতে থাকে। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে খ্রীষ্টকে যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গেও তাঁকে যুক্ত করেন। এমন চিন্তার উদয় হয় যে, মানুষের জন্য তিনি পাপমুক্তির বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। সেন্ট পল তাই বলেছেন—'আমাদের কাছে একই ঈশ্বর। তিনি পিতা। তাঁর কাছে আমরা সবাই বিষয় মাত্র। প্রভু যিশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই এই বিষয়ের প্রকাশ। আমরাও এসেছি তাঁরই মধ্য দিয়ে। এই ধরনের উক্তির মধ্যে ভাবাবেগ ছাড়িয়েও বড় একটি দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে—যে তত্ত্বের ভিত্তিতে যিশুখ্রীষ্টকে মহাপ্রকৃতি হিসেবে দেখা যায়। পরমপুরুষ থেকে এই মহাপ্রকৃতির প্রকাশই প্রথম।

হিব্রুদের একটি সাধারণ উক্তির মধ্যে জগৎসৃষ্টির এক পরমতত্ত্ব লুকিয়ে আছে। সেই উক্তিতে বলা হয়েছে—'ঈশ্বরের বাক্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি।' আমাদের শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে শব্দব্রহ্মণ—ওঁ।' ইহুদীদের এই বিশ্বাসের সূত্র ধরেই সেন্ট জন বলেছিলেন—'আদিতে ছিল বাক, বাক ঈশ্বরের সঙ্গে, ঈশ্বরই বাক।' আধুনিক বিজ্ঞানের Superstring তত্ত্বের সঙ্গে অপূর্ব ভাবে এই ধরনের চিন্তা মিলে যায়। মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর থেকে প্রচণ্ড চাপের ফলে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তারই শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলপর্যায়ে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছে। যার ফলে কেউ আমরা অন্য কারো থেকে বিচ্ছিন্ন হই। There are Parts in the whole and whole in the Parts.

সেন্ট জনের চিন্তাতে বিশ্বসৃষ্টির যথার্থ একটা ব্যাখ্যা থাকলেও আদি খ্রীষ্টানেরা এ-ব্যাপারে স্পষ্ট কোন ধারণার মধ্যে আসতে পারেন নি। মানুষের মধ্যে পাপবৃত্তির প্রাধান্য দেখে তারা এমন একটা দিশেহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা হিসেবে ধরে নেওয়াও ছিল একটা অসুবিধার ব্যাপার—কারণ তাহলে তিনি পাপেরও স্রষ্টা একথাটা স্বীকার করে নিতে হয়। ফলে মধ্যবর্তী এক বিধাতার কল্পনা তাদের মধ্যে এসে যায়—যে বিধাতা পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ ছিলেন না। তাঁর একটা অন্ধ ও বিকৃত প্রকৃতি

থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণার তাঁরা জন্ম দিতে চেষ্টা করেন। যে-জন্য রক্তমাংসের দেহের মধ্যে পাপ ঢুকে গেছে। এ বিষয়ে তাঁরা প্রাচীন ব্যাবিলন, ইরাণ ও ইহুদীদের চিন্তাধারাকেও সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে আসেন। শয়তানের অবতারণা ঘটে। শুভশক্তি ও অশুভশক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান খোঁজার চেষ্টা চলে। বস্তুসত্তার মধ্যেই একটা পাপের বীজ আছে বলে তারা মনে করেন। এই পাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতেই ঈশ্বরপুত্রের মর্ত্যে আগমন।

জগৎ কোথা থেকে কি ভাবে তৈরি হয়েছে এনিয়ে আদিপর্যায়ে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। কেউ বলেছেন, ঈশ্বর আকৃতিহীনবস্তু থেকে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন। আবার আর একদল বলেছেন—শূন্যতা থেকেই ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেছেন। শূন্যতারও নানা রূপ আছে। শক্তিমিশ্রিত শূন্যতাস্বরূপ শূন্যতা এবং নির্ভেজাল শূন্যতা। বর্তমান বিজ্ঞান শূন্যতা থেকে জগৎসৃষ্টির কথা বলেছে। তবে তাদের এই শূন্য শক্তিময়শূন্যতা—মহাশূন্যতা নয়। মহা-শূন্যতা থেকে কি ভাবে শক্তির উদয় হয়েছে তাঁরা একথা বলতে পারেন নি।

প্রাচীন খ্রীষ্টানদের সৃষ্টিসম্পর্কিত কল্পনা সত্যি অত্যন্ত দরিদ্র। মহৎ চিন্তার সঙ্গে কখনও অমহৎ চিন্তা মিশে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করেছে মাত্র। তারা মনে করত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবীই হল কেন্দ্রস্থল। তরঙ্গক্ষুব্ধ জলরাশি নিচে থেকে পৃথিবীকে উপরে ঠেলে রেখেছে। ঊর্ধ্বে এক ধরনের চাদর বঙ্কিম স্বর্গকে ধরে রেখেছে —এর ফলে নির্দিষ্ট পথ ধরে গ্রহনক্ষত্রের পরিক্রমা সম্ভব হচ্ছে।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টানদের মধ্যে জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারণা করেন John Scotus Erigena. তিনি নবপ্লেটোনিয়-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে নতুন চিন্তাধারা আনার চেষ্টা করেন। তিনি প্রকৃতিকে চারভাগে ভাগ করেন :—(১) এই সৃষ্টির মূলে রয়েছেন অসৃষ্ট স্রষ্টা। (২) সৃষ্ট স্রষ্টা। (৩) সৃষ্ট কিন্তু সৃষ্টি করেন না। (৪) সৃষ্টি করেন না এবং নিজেও সৃষ্ট নন। তবে Erigena-এর মতে ঈশ্বর হলেন অসৃষ্ট স্রষ্টা। তিনি সকল উপাদানের মৌল উপাদান। ঈশ্বর তাঁর মৌলসত্তা থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা জগৎসৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। প্রাক্তন বিশ্বাসকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন। তবু এরই মধ্যে কখনও কখনও অদ্ভুত সত্যচিন্তা দেখা দিয়েছে। যেমন, ঈশ্বরের দৈবী ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিশ্বকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির উৎস অনন্ত নয়। সময়ের হাত ধরেই সৃষ্টির উদয়। একথাটাই আধুনিক Big Bang তত্ত্ব স্বীকার করে। যখন সৃষ্টির সকল উপাদান Blockhole-এ ছিল, তখন না ছিল সময়, না দেশ। বিস্ফোরণ হবার পর kinetic energy অগ্রসর হলে—সময় ও দেশের সৃষ্টি হয়। এই সময় ও দেশ থেকেই সৃষ্টির উদয়।

এক্ষেত্রে আরও নতুন ভাবনার আমদানী করেন ক্যানটারবেরির অ্যানসেলম। তাঁর মতে সৃষ্টি এসেছে ঈশ্বরের চিন্তা থেকে। ঈশ্বরের মস্তিষ্কে বাস্তবসত্তা নিয়ে সৃষ্টির মৌল উপাদান ছিল না। ছিল শুধু তার চিন্তার মধ্যে। Albertus Magnus বলতেন, প্রাকৃতিক বিচার বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টির রহস্য ধরা কখনই সম্ভব নয়। তবে এটাও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে বস্তুসত্তা চিরন্তন নয়।

গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধাচারী একদলও এসময় ছিলেন—যাঁরা ঐতিহ্যবাহী চিন্তাকে তেমন প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেদের চিন্তার আলোকে বিশ্বসৃষ্টির রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছেন। এরা প্রাচ্যের ধর্মীয় চিন্তাধারা অনেকটাই প্রভাবিত ছিলেন। প্রাচ্যে সৃষ্টির রহস্যভেদে দ্বৈতবাদের প্রচলন ছিল। এঁরা মনে করতেন, সৃষ্টির মূলে ছিল দুটি উপাদান—শুভ (পুরুষ) ও অশুভ (প্রকৃতি)। এ দুটি উপাদানই চিরন্তন। তবে অনেকে মনে করতেন যে, অশুভশক্তি প্রথমেই অশুভ ছিল না। পরে এর মধ্যে তামসবৃত্তি জন্ম নেয়। খুব মনযোগ দিয়ে খুঁজলে এর মধ্যে সাংখ্যতত্ত্বের উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই অশুভ শক্তিই তাদের মতে ওল্ড টেস্টামেন্ট তৈরি করেছিল। এই অশুভশক্তিই বস্তুসত্তাময় জীব সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক সকল বিশৃঙ্খলার মূলে ছিল এই শক্তিই। নিউ টেস্টামেন্ট রচনা করেন শুভ শক্তি। তিনি মানবাত্মা তৈরি করেন। তবে এই মানবাত্মা অশুভশক্তি (বস্তুসত্তা) দ্বারা কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় দেশেও বহু মরমিয়াপন্থী ছিলেন। এঁদের কারো তত্ত্ব ছিল প্রচলিত খ্রীষ্টতত্ত্ব বিরোধী। কারো তত্ত্ব প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করলেও এই তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা বহুদেববাদের গন্ধ ফুটে উঠেছিল। এমনই একজন ছিলেন একহার্ট। মধ্যযুগীয় অপর পণ্ডিত একুইনাসের সঙ্গে একটি ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। সেই মত হল—অনন্তকাল থেকেই একটি ভাবের জগৎ আছে। এ জগৎ জৈবজগৎ থেকে ভিন্ন। এই ভাব থেকে এক সময়, ধরতে গেলে শূন্যতা থেকেই জীবজগৎ তৈরি হয়। শিল্পীর মনের ভাবনা যেমন চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপ লাভ করে ব্যাপারটা তেমনই। বিশ্ব চিরকালই ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যে ছিল। সৃষ্টি হবার পর তার মধ্যেও তিনি মৌলসত্তা হিসেবে থেকে যান। বহির্জগৎ ঈশ্বরের অন্তর্জগতের প্রতিফলন মাত্র।

আধুনিক খ্রীষ্টীয় জগৎ একুইনাসের এই অভিমতই পোষণ করে। তবে কিছু কিছু অগৌণ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মতের পার্থক্য আছে। রোমান ক্যাথলিক গীর্জা একুইনাসের চিন্তাকেই সমর্থন জানায়। তাঁরা বস্তুবাদে অবিশ্বাসী। একথাও তাঁরাও মানতে রাজি নন যে, বিষয় ও ঐশ্বরিক মৌলসত্তা একই জিনিস। স্থূল ও সূক্ষ্মসত্তা ঈশ্বর থেকেই জাত একথাও তাঁরা মানতে চান না। তাদের অভিমত,

সময়ের আরম্ভ থেকেই—মহাশূন্যতা থেকে ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেছেন—সূক্ষ্ম স্থূল সব। ছয়দিনের মধ্যে ঈশ্বর মহাশূন্যতা থেকে সৃষ্টিকার্য শেষ করেন। ঈশ্বর বাক্যদ্বারা মহাশূন্যতা থেকে স্বর্গ, মর্ত্য, জীবজগৎ সব সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকে তিনিই শাসন ও পরিচালনা করেন। পরিচালনা করেন এই উদ্দেশে, যাতে মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী হয়।

তবে খ্রীষ্টানদের জগৎউৎপত্তিসংক্রান্ত তত্ত্বকে নির্ভুল বলে ধরে নেওয়া যায় না। ফলে প্রটেস্টান্টদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মতের বিরুদ্ধেও ভিন্নতর নানা তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। অনেকে প্রাক্তন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে একথাই বলতে চান যে ধর্মের জগতে বিজ্ঞানের কোন প্রবেশাধিকার নেই। তবে এ ধরনের অভিমত এখন আর অনেকেই মানতে রাজি নন। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন যে, জেনেসিসে যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক। ভূবিদ্যা অন্তত জেনেসিসের সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকের ধারণা, জেনেসিসের বর্ণনা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়। অনেকে আবার এই সৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনীকে আসিরিয় ও ব্যাবিলনীয় কাহিনীর প্রতিধ্বনি বলে ভাবতে চান। শেষপর্যন্ত প্রটেস্টান্টরা সকলে যেখানে এসে এক মত হয়েছেন সেটা হল এই—ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতের সত্যিকারের উৎস। তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই জগতের উদ্ভব এবং তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত।

খ্রীষ্টান সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে বিজ্ঞানের স্পর্শ থাকলেও গীর্জার রক্ষণশীলতার জন্য সবটা কেমন গুলিয়ে গেছে! ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব যেমন কতকগুলি Missing Link খুঁজে পাওয়ার অভাবে অপরিপূর্ণ, খ্রীষ্টান তত্ত্বও তেমনই পূর্ণ নয়। এখানে শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানেরই মত বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছে। বরং এক্ষেত্রে যদি প্রাচীন মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে তাকানো যায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীর অন্তরালে অনেক বেশি বিশ্বাস্য তত্ত্ব ধরা পড়ে।

প্রাচীন মিশরে আকাশকে দেখা হত মহিলা হিসাবে যার নাম ছিল নুট এবং মর্ত্যকে দেখা হত পুরুষ হিসাবে। মর্ত্যের নাম দেওয়া হয়েছিল 'টো'। তবে সেমেটিক চিন্তার প্রাধান্যের কালে এধরনের চিন্তা ছিল সময়ের বিরুদ্ধে। কারণ, সেমেটিক চিন্তাতে আকাশকে ধরা হত পুরুষ হিসাবে। যাকে বলা হত—শাময়ীম্। মর্ত্যকে ধরা হত মহিলা হিসাবে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল আদামাহ্ (আদ্যা মা?)। ব্যাবিলনেও ঈয়া (গভীর সাগর) ও অনু (আকাশ)-কে ধরা হত পুরুষ হিসাবে আর ভূমিকে ধরা হত মহিলারূপে - যার নাম ছিল দম্‌কিন। একই ধরনের চিন্তা ছিল গ্রীস, রোম, জার্মানী, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও। এই লিঙ্গকল্পনায় মিশরই ছিল ব্যতিক্রম।

মিশরীয়রা মনে করত মৃত্তিকা ও জলের মৌল উপাদান আদি বিশৃঙ্খলা থেকে এসেছিল। এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল মহাবিশ্বসাগরে—যাকে এরা বলত নু বা নুন। এই মহাবিশ্বসাগর ছিল এমন এক অবস্থা যখন আকাশ ছিল

না, পৃথিবী ছিল না, মানুষ ছিল না, দেবদেবীও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল অনুপস্থিত।

নীলনদের কুয়াশা ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে মিশরীয়েরা কল্পনা করেছিল যে, 'র' সূর্য অথবা 'শু' বা আবহাওয়া এই কুয়াশাকে ঊর্ধ্বে তুলে নেয়। নুট বা আকাশকে কেব বা সেব অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। 'শু' আকাশকে মাথায় তুলে রেখেছিল। এই জন্য প্রাচীন মিশরে ধারণা জন্মেছিল যে, সেব ও নুট বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে 'র' এবং 'শু'-র জন্ম দিয়েছিল। আবার এমন ধারণাও ছিল যে—একটা বড় হাঁসের ডিম হল সূর্য, বা 'র'। 'সেব' বা পৃথিবী খেলতে খেলতে এগিয়ে গিয়ে এই হাঁসের সঙ্গে যৌন মিলনে আবদ্ধ হয়। এরই ফলশ্রুতি সূর্য। এখানে সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় হংসতত্ত্বের একটি ছায়া রয়েছে —হং+স—পুরুষ+প্রকৃতি একত্রে যুক্ত নিউট্রন ফিল্ড বা ব্রহ্ম—যা থেকেই জগৎ সৃষ্টি। ভিন্নমতে মিশরীয়রা মনে করত 'র' বা সূর্য ছিল স্বর্গীয় গোবৎস—ভারতীয় গো—বিশ্বপ্রকৃতির শিশু—অর্থাৎ আকাশ দেবীর শিশু বা নুটের শিশু। পরবর্তীকালে সূর্যকে মহাবিশ্বসাগর (cosmic-ocean) এর বিশৃঙ্খলাজাত বলে ধরা হয়। কারণ-সলিলে অর্থাৎ নুনে 'র'-র উদ্ভব হয়েছে সর্বপ্রথম। সুতরাং তাকে মৃত্তিকা ও আকাশের পূর্বপুরুষ বলে ধরা হত।

কারণ-সলিলে সৃষ্ট হবার পর 'র' দেখলেন আর কেউ নেই। তার দাঁড়াবার মত কোন স্থানও নেই। তখন নিজের ছায়ার সঙ্গে সে মিলিত হয় এবং তার বীর্য থেকে 'শু' ও 'তেনফুৎ' সৃষ্টি করেন। তেনফুৎ অর্থ আর্দ্রতা। এই 'শু' ও 'তেনফুৎ' থেকে সৃষ্টি হয় 'সেব' ও 'নুট'-এর। এবং এদের থেকে ওসিরিজ-পরিবার ও মানবগোষ্ঠীর।

পৃথিবীর সাগরের মত আকাশকেও প্রাচীন মিশরীয়রা সাগর বলত। তারা মনে করত, এই আকাশসাগরে রোজ সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রাদি নৌকো চরে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবীর নিচ একটি নৈশসাগর আছে বলেও তাদের ধারণা ছিল। সারাদিন নৌকো বেয়ে সূর্য সেই নৈশসাগরে চলে যায়। সারারাত পাড়ি দিয়ে আবার দিনের আকাশ সাগরে ভেসে ওঠে। মৃতের আত্মা এই সূর্যের নৌকো ধরেই ওপারের নৈশ-আকাশসাগরে চলে যায় এরকম বিশ্বাসও—মিশরীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

মিশরে সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে নানা দেবদেবী যুক্ত ছিলেন। এই জন্য তারা Khnumu নামে এক দেবতার কল্পনা করেছিল—যিনি নাকি কুম্ভকারের মত চাকতি ঘুরিয়ে নানা আকারের জীব সৃষ্টি করেছিলেন। এই Khnumu-কে বলা হত পিতার পিতা, মাতার মাতা। মানুষ, দেবতা সবাইকে তিনিই সৃষ্টি করেন। পিতা হিসাবে তিনি চিরন্তন। স্বর্গ ও মর্ত্যও তাঁরই সৃষ্টি। রসাতল, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, কিছুই তাঁর সৃষ্টির স্পর্শ এড়াতে পারেনি। পশু, পাখি,

কীটপতঙ্গ পাহাড়পর্বত সবই তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা। তাঁকে মেষ-মস্তক হিসাবে দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে তার সৃষ্টিশক্তি বোঝানোর জন্য। নীলনদের উৎসস্থানে তাঁকে পুজো করা হত। সূর্যকে সৃষ্টি করে-ছিলেন Ptah নামে এক দেবতা। চন্দ্রডিম্বও তারই কুম্ভকারের চাক্তিতে তৈরি। বিশ্বনিয়মের তিনিই স্রষ্টা। তিনি এসব সৃষ্টি করেছিলেন Maat বা সত্য দ্বারা। ওসিরিজ স্বহস্তে আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন উদ্ভিদজগতের স্রষ্টা। কালে কালে 'আমন-র', 'দেবতাদের পিতা' 'মানুষের রূপকার' হিসাবে দেখা দেন। কারণসমুদ্রের বিশৃঙ্খলায় Thoth নামে এক দেবতা সেব ও নুটকে বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। আকাশের ভিন্ন এক দেবতার নাম ছিল Anher. Anher অর্থ যিনি ঊর্ধ্বগামী। হোরাসকে এরা কল্পনা করেছিল আকাশ হিসেবে। পরে এত সব দেবদেবীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি এমন জটিল হয়ে ওঠে যে, তার রূপরেখা টানাও কষ্টকর।

বর্তমান পদার্থবিদেরা মিশরীয় পুরাণকাহিনীর এই জটিলতার মধ্য থেকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেবদেবীকে তাঁরা সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান হিসেবে দেখেছেন। যেমন—নুনকে দেখেছেন supervoid হিসেবে। 'হুঃ' নামক দেবতাকে অনন্তদেশ হিসাবে। আমনকে দেখেছেন স্থিতির মধ্যে গতির আবেগ হিসেবে। কুক্ নামক দেবতাকে দেখেছেন অন্ধকার হিসেবে। এই চারজন দেবতাই সৃষ্টির আদি উপাদান। নুনরূপ অন্ধকার-বিশৃঙ্খলাকে আধুনিক কোয়ান্টাম ফিল্ডের আলোবিকিরণ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। স্থির অথচ বিশৃঙ্খল এই জলকে আলোড়িত করেন আমন দেবতা। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই যে গতির আবেগ আছে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের এই ভাবকেই প্রাচীন মিশরীয়রা আমন দেবতা নামে অভিহিত করেছিল। আমনের এই সৃষ্টি করার শক্তি নুনের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমনকে নিয়ে যে পুরাণ কাহিনী তার অধিকাংশতেই দেখা যায় যে, তাঁকে গতিশক্তির প্রতীক করে দেখানো হয়েছে। সেইজন্য কখনও কখনও তাঁকে 'সতত সঞ্চরণ-শীল হাওয়া' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে! হাওয়া সতত সঞ্চরণশীল হওয়া সত্ত্বেও এর কোন রূপ নেই। ভারতবর্ষেও আমনেরই মত বায়ু হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল রুদ্রকে। রুদ্রের সত্তাই হল গতি। আমনকে বলা হয়েছে তার কোন জনক-জননী নেই। তিনি স্বয়ম্ভূ।

মিশরে আমনের আত্মাকে মেষ-স্ফীংসরূপী বেদীতে অথবা সর্পদন্ডে স্থাপন করা হয়েছিল। এই সর্পদন্ড 'কম অটেফ্', কাম বা ইচ্ছারূপের প্রতীক। ভারতবর্ষে এই জন্যই ইচ্ছাশক্তিকে কুল (শক্তি) কুন্ডলিনী (গহ্বরস্থ) হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে মিশরে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন জ্ঞান হওয়া মাত্র আমনকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হত। গতিশক্তির মূল্য মিশরীয়রা যতই বেশী উপলব্ধি করেছে ততই আমনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে গতি যুক্ত। গতি

না থাকলে সময় থাকবেনা। পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় না ঘুরলে দিনরাত্রি হবে না। সময় স্তব্ধ হলে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যাবে। মিশরীয়রা আমনে মধ্যে গতি-শক্তির গন্ধ খুঁজে পেয়েছিল বলে পরবর্তীকালে সৃষ্টির ইতিহাসে এই দেবতাকেই বেশী মূল্য দিয়েছিল।

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে গ্রীসে দুধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—কাব্যিক-কাহিনীর ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা। হোমারের রচনাতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা এই পৃথিবী সংক্রান্ত। একে বলা হয়েছে, ওসেনাস। ওসেনাস হল সবার পিতা এবং টেথিস মাতা। ওসেনাস যে সাগর একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু টেথিস-এর চরিত্র তেমন স্পষ্ট নয়। তবে সম্ভবত তিনি মৃত্তিকা। এদের পশ্চাৎপট হিসেবে রয়েছে মহাপ্রকৃতি—রাত্রিদেবী হিসেবে দাঁড়িয়ে। সাগর অপেক্ষা জিউস তরুণ—কিন্তু অধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই জিউসও যার ভয়ে ভীত তিনি দেবী রাত্রি। সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টির মূলে হোমার প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন রাত্রিকে।

সৃষ্টির প্রথম উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় অরফিয়াসে। অরফিয়াসও সৃষ্টির কাহিনী বলতে গিয়ে প্রথম রাত্রির উল্লেখ করেছেন। তারপর টেথিস এবং ওসেনাস-এর। তবে ওসেনাস এবং টেথিসকে তিনিও প্রথম দম্পতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদের আবার তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্তান বলেও উল্লেখ করেছেন। বর্ণনার সবটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে হোমারের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় অরফিয়াসের আমলে ওসেনাস এবং টেথিসের মর্যাদা একটু কম ছিল। কিন্তু পৃথিবী এবং স্বর্গকে এদেরও পূর্ববর্তী দম্পতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে উপরোক্ত দুই দম্পতির কথা বাদ দিলেও একটি ক্ষেত্রে যার সার্বিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—সে হল রাত্রি।

হেসিয়ডে পৃথিবী, স্বর্গ ও রাত্রি এই ত্রয়ী যে দেবতাদেরও উৎস এ ধরনের ইঙ্গিত স্পষ্টতর। এখানেই প্রথম লক্ষ্য করা যায় আদিম বিশৃঙ্খলার। হেসিয়ডের বর্ণনা অনুযায়ী প্রারম্ভে ছিল বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা থেকে আসে Gaia এবং Eros. বিপরীত দিকে আসে Erebus এবং রাত্রি। Erebus এবং রাত্রি ছিল আলো ও দিনের জনকজননী। Gaia স্বতই প্রথম প্রসব করেন ইউরেনাস বা স্বর্গকে। স্বর্গ প্রসব করেন এই কারণে, যাতে সে তাঁর মাথার উপর চাঁদোয়া টানিয়ে দিতে পারে। এই চাঁদোয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর অঙ্কে যেন দেবতারা একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। এই আকাশের পর দেখা দেয় পর্বতমালা ও সাগরসমূহ। পরে এই স্বর্গের সহবাসেই তিনি সকল দেবদেবীর জননী হন। তবে কারো কারো মতে মাতৃত্বের গৌরব তিনি অর্জন করতে পারেননি এরেবাস এবং রাত্রি থেকে যাদের জন্ম হয়েছিল তাঁদের। সুতরাং হেসিয়ড বিচার করলে দেখা যায় সৃষ্টির সর্বপ্রথম ছিল এক ধরনের বিশৃঙ্খলা।

হেসিয়ড যে বিভিন্ন নামের উল্লেখ করেছেন সেই নামগুলির যথার্থ অর্থ কি? অর্থগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট না হলেও অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্ভবত Gaia কে জল, Eros কে বায়ু, Erebus-কে অগ্নি ও রাত্রিকে 'দেশ' হিসেবে দেখেছিলেন। এই দেশকেই তিনি আদিউৎস কল্পনা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফিনিসীয় সৃষ্টিতত্ত্বে এবং আরও কিছু গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির আদি কারণ হিসেবে সময়কেই অগ্রবর্তী ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। সবগুলিকে মিলিয়ে ধরলেই বোধহয় যথার্থ সত্য জানা যাবে। সময় এবং দেশ অর্থাৎ Time and space অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সৃষ্টির অর্থাৎ বস্তুসত্তার (Particles) যথার্থ আবির্ভাব দেশ ও সময় থেকেই। কিন্তু দেশ আছে দু'ধরনের—সময় তাড়িত শক্তিপূর্ণ দেশ, ভারতবর্ষে যাকে বলে ব্রহ্মাণ এবং নিষ্ক্রিয়দেশ যাকে বলে পরব্রহ্মাণ। সাধারণ দেশ অর্থাৎ সময় দ্বারা বিস্তারিত দেশের নাম void, অতি-সাধারণ অর্থাৎ সময় দ্বারা বিতাড়িত যে দেশ নয়, তার নাম Supervoid হেসিয়ডে যদি Supervoid-কে বোঝানোর চেষ্টা হয়ে থাকে তাহলে তিনিই যথার্থ, নয়তো ফিনিসিয়রা সঠিক, কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় out of curved space and time particles arrived. কিন্তু এই Curved Time and Space-এর উদয় হয়েছিল কোথা থেকে একথা যদি চিন্তা করা যায়—তাহলে অবশ্যই Supervoid-কে প্রথম স্থান দিতে হবে।

তবে হেসিয়ড এই দেশ বলতে কোন্ দেশকে বুঝিয়েছিলেন, স্পষ্ট বোঝা দুষ্কর। কারণ, তিনি একে বলেছেন পরিমাপহীন শূন্যতা, এবং আকৃতিহীন বস্তুসত্তা। আকৃতিহীন বস্তুসত্তা দ্বারা যদি একে বুঝতে হয় তাহলে একে গতিময় দেশ বলতে হবে—ব্রহ্মাণ পরব্রহ্মাণ নয়। এবং এক্ষেত্রে তিনি বস্তু-বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ চিন্তার পাশে এক আসন পেতে বসার যোগ্য।

গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টির উৎস হিসেবে যুগ্মদম্পতির নাম পাই যেমন Gaia ও Eros এবং Erebus ও Night. Gaia এখানে মর্ত্যের প্রতীক যদিও স্থূল মর্ত্য নয়, অস্পষ্ট এক ধরনের বাস্তব উপাদানের ছায়া মাত্র। এখানে প্রথম দিকে Eros-এর প্রবেশ ভূমিকাহীন। এখানে তিনি শুধু মৌলশক্তি মাত্র, কোন আকৃতিসম্পন্ন কেউ নন। এরস এখানে সমগ্রপ্রকার মিলনের প্রাণসত্তা। প্রাণ এবং প্রেম একত্রে যুক্ত। এদের অর্থাৎ Gaia ও Eros এর জন্ম কি ভাবে, কিছুই বলা হয়নি। হয় তো তারা বস্তু ও গতি-শক্তি—আদি বিশৃঙ্খলাজাত কোন উচ্চতত্ত্ব নয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলসত্তার মধ্যে কারণ ও ফলের কোন ভূমিকা নেই—আছে সময়ের পারম্পর্য। শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে, Gaia ও Eros পরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় দম্পতি সম্পর্কেও বক্তব্য প্রায় একই ধরনের—অর্থাৎ Erebus ও Night. এরা সম্ভবত এসেছিল দেশ থেকে। সুতরাং এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, Gaia, Eros, Erebus ও Night গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্বে দ্বিতীয়

পর্যায়ের ভূমিকা পালন করেছিল।

আদি বিশৃঙ্খলা থেকে আর এক ধাপ সরে এলেই গ্রীসীয় সৃষ্টিতত্ত্বে আমরা খুঁজে পাই Aether এবং Day-এর নাম—যাদের ধরা হয় এরেবাস এবং রাত্রির সন্তান হিসেবে। সুতরাং অন্ধকারের ভারে পীড়িত রাত্রি (Supervoid) থেকেই এসেছিল রাত্রি ও দিন। পৃথিবী জন্ম দিয়েছিল আকাশের (পৃথিবীর আবির্ভাবে চতুর্দিকস্থ বঙ্কিম দেশকেই কি এই আকাশ বলা হয়েছে?)। আকাশ তৈরি করেছিল পৃথিবীর উপর বাঁকানো চাঁদোয়া। এইভাবে যখন ঘর সাজানো হয়েছে তখনই স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনে আবির্ভাব হয়েছে দেব-দেবীর।

হেসিয়ড যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। তবে দুটি প্রশ্নকে চিন্তার পরিধির মধ্যে আনা যেতে পারে—সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং উচ্চতর দেশীয় কল্পনা, কারণ, এ থেকেই ধাপে ধাপে সৃষ্টি নেমে এসেছে স্থূল পৃথিবী অবধি।

গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্বের নতুন ধরনের বর্ণনা পাই আমরা ফেরেসাইডস নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে। আসলে তিনি ছিলেন Syros-এর অধিবাসী। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে এথেন্সে পিসিস্ট্রাটাসের দরবারে ছিলেন। তিনি এথেন্সে অরফিক্ সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। তবে অরফিক তত্ত্ব কতদূর তিনি অনুসরণ করেছিলেন স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর নিজের গ্রন্থও পাওয়া যায় নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁর রচনার যে-সকল অংশ পাওয়া যায়—তা থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। ফেরেসাইড তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সৃষ্টির সন্ধান করেছিলেন (১) জিউস (২) ক্রোনস এবং (৩) থোনিয়া (Chthonia)।

সৃষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছেন জিউস। এক্ষেত্রে তিনি নির্ভেজাল সত্তা—ভারতবর্ষের দৌস-এর মত। বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছাজাগামাত্র তিনি Eros-এ রূপান্তরিত হন। সুতরাং জিউস জগতের ঊর্ধ্বে। তিনি সর্বশক্তিমান। এই ত্রয়ীর মধ্যে ক্রোনস হল দ্বিতীয় সত্তা। তিনি সময়ের ইঙ্গিতবহ। সময়ের মধ্যেই সব কিছু ঘটে। সময়-দেশাত্মবোধকও। থোনিয়া হল বস্তুর আদি অবস্থা। কিংবা বস্তুসত্তার মৌলাবস্থা।

থোনিয়ার বীজ থেকে—অগ্নি, বায়ু ও জল সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টি-পর্যায় শুরু হয়ে যায়। এর পর জন্ম হয় পাঁচটি দেব-পরিবারের। সৃষ্টির মৌল উপাদান ও দেবদেবীর উৎপত্তি হয় সময় থেকে। এর পরই জিউস ও এরোস বিশ্বসৃষ্টিকার্যে অগ্রসর হন। প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে Cronos-এর সঙ্গে ড্রাগন ওফিওনিয়াসের সংঘর্ষ শুরু হয়। Cronos জয় লাভ করে ওফিওনিয়াসকে সাগরের জলে ছুড়ে দেন (বিষ্ণুর মধুকৈটভহত্যার মত?)। জিউস আবার সৃষ্টিকার্য শুরু করেন।

হঠাৎ Cronos এসে এতে কোথা থেকে ঢুকলেন কে জানে! হয় তো

আরও প্রাচীন কোন পুরাণ-কাহিনী থেকে। হয়তো ফিনিসিয় পুরাণ-কাহিনীর প্রভাবও এর উপর পড়তে পারে। সে যাই হোক, এ থেকে একটি বক্তব্য স্পষ্ট যে, সমস্ত কাহিনী এ কথাই বলতে চায় যে, ছন্দময় প্রকৃতির আবির্ভাবের পূর্বে Cosmic এক বিশৃঙ্খলাকে দমন করে নিতে হয়েছিল।

রূপক কাহিনী এর পর নতুনভাবে এগুতে থাকে। জিউস একটি বিরাট বস্ত্র তৈরি করেন। এতে নয়নতৃপ্তিকর নকশা করা হয়। এর উপর পৃথিবী সাগর ও জলচরপ্রাণীদের চিত্র আঁকা হয়। আঁকা হয় পক্ষযুক্ত ওক্‌বৃক্ষ। মনে হয় পক্ষযুক্ত ওক্‌বৃক্ষ দিয়ে এইটুকু বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী দেশে (Space) ভাসমান।

ফেরেসাইডে-এ জিউসের যে চিত্রকল্প রচনা করা হয়েছে তাতে সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যায়ের বিশৃঙ্খলারও উপরে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে বিজ্ঞানেরও একটা গন্ধ পাওয়া যায়। সৃষ্টির পূর্বে চারটি মৌল উপাদানের কথাও বলা হয়েছে এখানে। Eros এখানে প্রথম কামরূপে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে মহাবৈশ্বিক এক উপাদান হিসেবে দেখা দেয়।

গ্রীসীয় বিশ্বসৃষ্টি কল্পনাতে cosmic egg-এর কল্পনাও ছিল। Damascius-এর রচনাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে শুধুমাত্র ইঙ্গিত ছাড়া স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই।

গ্রীক বিশ্বতত্ত্ব এরপর নতুন এক রূপ নেয়। অরফিয়াসের বিশ্বচিন্তা নতুনভাবে প্রকাশ পায়। নতুন সৃষ্টিতত্ত্বে সর্বাগ্রে স্থান পায় Chronos অর্থাৎ সময় বা কাল। এর পর আসে Aether. গ্রীকমতে অগ্নিতুল্য একধরনের বস্তু। এর পর আসে chaos বা দেশ (space)। তবে প্রাচীন গ্রীকেরাও আধুনিক আইনস্টাইনের মত সময় ও দেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। এই Aether ও chaos থেকে আসে ডিম্ব অর্থাৎ cosmic egg। কখনও কখনও এই ডিম্বকে Chronos ও Aether-জাত বলা হয়েছে। জন্ম যেভাবেই হোক একে বলা হত 'আলোর ডিম'—ভারতীয় ভাষায় বলতে গেলে বিন্দু। এই ডিম্ব থেকেই অরফিক্ মতানুযায়ী প্রথম দেবতার সৃষ্টি হয়। Demascius—এই দেবতার মধ্যে একটা ত্রীত্ব দেখেছিলেন, এইজন্য ভারতীয়দের সৎ + চিৎ + আনন্দের মত এর নাম দিয়েছিলেন Phanes Erica-Paeus-Metis। অর্থাৎ আলো-প্রাণপ্রদ-উপদেশ। সর্বোপরি স্থান আলোর। স্বইচ্ছায় এই আলো বিবেকের আলোরূপে, প্রাণের আলোরূপে ও প্রেমের আলোরূপে রূপান্তরিত হয়। দেবতাদের মধ্যে প্রথম এর জন্ম হয়েছিল বলে এর নাম হয় Protogonos। তবে একে বিকৃত ভয়ঙ্কর আকারেও দেখানো হয়েছে। যেমন—তাঁর ছিল নানা মস্তিষ্ক—মেষ, বৃষ, সর্প ও সিংহের। এর দ্বারা হয়তো এও বোঝানো হতে পারে যে, এই আদিবীজের মধ্যে সকলপ্রকার প্রাণের বীজ লুক্কায়িত ছিল। এইভাবেই বিশ্বজগতে প্রাণের উদ্ভব হয়। মহাশূন্যতা থেকে প্রথম আলোর উদ্ভব। এই

আলোকেই হয়তো বর্তমান অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা Whitehole বলতে আরম্ভ করেছেন।

এই যে আলো—বিশ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? সম্পর্ক এই যে, বিশ্বজাগতিক সর্বকিছুর উপাদান ছিল এর মধ্যেই। কিন্তু এই ধারণা বা জগৎসৃষ্টির এই দর্শন দেবতাদের বংশবিবরণের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে। বিশ্বপৃথিবী ক্রমপর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই একএকটি পর্যায়কে একএকটা দেববংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আদি দেবতার একটা অংশ বিশ্বে প্রাণের সঞ্চার করে। অন্য একটি অংশ সূর্য হয়ে আকাশে উঠে যায়। এখানে শুধুমাত্র রাত্রিই তাকে দেখাশুনার অধিকারিণী হন। তাঁর জাঁকজমক অন্যান্য দেবতাদের চমকিত করে তোলে। কিন্তু কালক্রমে যখন জিউস প্রধান হয়ে দেখা দেন তখন অগ্নিকে তিনি গলাধঃকরণ করেন। জিউসের মধ্যে সকল কিছু তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে। তিনি নিজেই তখন অগ্নির স্থান অধিকার করে নেন এবং তাঁর থেকে নতুন দেবদেবী, নতুন বিশ্বপ্রকৃতি বেরিয়ে আসে। ঋগ্বেদের দৌস-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন জিউস। জিউসের পুত্র হিসেবে Dionysos (অগ্নি) পুনরায় জন্ম নেয়।

এই গল্পটিকে দুই দল দুই দৃষ্টিতে দেখেছেন। একদলের মতে জিউসের অগ্নিকে গিলে খাওয়ার মধ্য দিয়ে যে কথা বলার চেষ্টা হয়েছে তা এই :—এর দ্বারা জিউসকে তাঁর প্রাক্তন গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণের উৎস হিসাবে তাঁকেই দেখানো হয়েছে। অবার ভিন্নমতে মনে করা হয়েছে যে, এর দ্বারা একএকটা প্রলয়ের পর আবার বিশ্বের নতুন অভ্যুদয়ের কথা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

Damascius-এর সৃষ্টিতত্ত্বে মুখ্য পর্যায়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টির সর্বপ্রথমে Chronos-এর আর স্থান নেই, অর্থাৎ অগ্নির। তার বদলে এসেছে জল ও কাদা। এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অগ্নির। তবে সময়কেও এখানেও সৃষ্টির সক্রিয় প্রধান উপাদান হিসাবে মূল্য দেওয়া হয়েছে। এখানে সময়কে শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। বস্তুত সময়ের উদ্ভব Big Bang-এর kinetic energy থেকে হয়েছে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এই শক্তি থেকেই বস্তুর উৎপত্তি—$E=Mc^2$। তবে অরফিতত্ত্বে বড় বিশৃঙ্খলভাবে এসবকিছুকে বর্ণনা করা হয়েছে। Chronos-কে এখানে দেখানো হয়েছে পক্ষযুক্ত ড্রাগন হিসাবে যার একটি মাথা ষাঁড়ের আর একটি সিংহের। এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে দেবতার মুখ। তাকে এখানে দেখানো হয়েছে Chrono-Herakles-Ananke-Adrastein হিসেবে। Herakle এখানে শক্তি, Ananke প্রয়োজন, Adrasteia অনিবার্যতার প্রতীক। এর পরই Chronos থেকে আসছে Aether, Chaos ও Erebus। Aether এখানে বাষ্পীয় আর্দ্রতা, এবং Erebus কুয়াশার প্রতীক। বাষ্পাচ্ছন্ন আলো-

অন্ধকার মিশ্রিত দেশে Chronos সৃষ্টি করেন ডিম্ব অর্থাৎ Cosmic egg. বর্ণনাটি অনেকটা আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ঘূর্ণনের বেগে তৈরি হওয়া গ্রহনক্ষত্রাদির মত। এখানে শক্তিময় দেশের অর্থাৎ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের Pulsating void বা False vacuum-এরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ডিম্বের মধ্যেই ছিল পুরুষ ও প্রকৃতির উপাদান। এ থেকেই আবির্ভাব হয়—Protogonos Zeus Pan নামক দেবতার।

অর্ফির সৃষ্টিতত্ত্বের আরও নতুন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় অন্তত তিনটি। তবে কমবেশি সব বক্তব্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছেই। এর পরেই গ্রীক বিদ্রূপাত্মক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিসের কাছ থেকেও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায়। তাঁর মতে আদিতে ছিল বিশৃঙ্খলা—রাত্রি, এরেবাস ও টারটারাস। Erebus-এর গর্ভে বায়ু একটি ডিম্বের সঞ্চার করে যে ডিম্ব থেকে কালে কালে Eros-এর জন্ম হয়। Eros সবকিছুকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়। এবং এই সব-কিছুর মিলন থেকে জন্ম নেয় স্বর্গ, সাগর এবং মর্ত্য।

তবে গ্রীসের দার্শনিক মানস পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস পাঠ করে খুশি হতে পারে না। এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। ফলে বিশ্বসৃষ্টির যথার্থ রহস্য জানার জন্য নতুন ভাবে চেষ্টা করেন।

পৌরাণিক কাহিনীগুলি যতই বিভ্রান্তিকর হোক না কেন এর মধ্যে যে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই তা নয়। তাকেই গ্রীসের নতুন চিন্তাবিদেরা দার্শনিক ব্যাখ্যায় নবরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

এ ক্ষেত্রে যার কথা প্রথম চিন্তা করা যায় তাঁরা এসেছিলেন এশিয়া মাইনরের আইওনিয়া থেকে। এঁদের দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয় মিলেটাসের থেলস (৬০০ খ্রীঃ পূঃ)-কে নিয়ে। তাঁরা আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিস্টিদেরই মত জগৎ-উৎপত্তির মূলকেন্দ্র ও উপাদান খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন। কি ভাবে তন্মাত্র বস্তুসত্তার রূপান্তর ঘটেছিল তাঁরা সেবিষয়ে অনুসন্ধান চালান। (বিশ্বসত্তার উৎস খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন তাঁরা এই কারণে যে, এই দার্শনিকেরা লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে, বাস্তবজগতে কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটেনা। তাহলে সৃষ্টির আদি কারণ কি? একই ধরনের প্রশ্ন এফেসাসের হেরাক্লিটাসের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। হেরাক্লিটাস এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে, জড়বস্তু ও গঠনশৈলীর দিক থেকে অনন্ত। এ থেকেই গ্রীকমানসে এই চিন্তার উদয় হয় যে—বিশ্বসৃষ্টির পেছনে একটা মানসসত্তা যথার্থই বস্তুজাত। সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান অগ্নি। এই অগ্নির কারণ—শব্দব্রহ্মণ, প্রজ্ঞা বা ঈশ্বর। বাস্তবদিক থেকে এ হল অগ্নি; অধ্যাত্ম দিক থেকে প্রজ্ঞা বা ঈশ্বর)। তবে সৃষ্টির এই প্রথম উপাদান সম্পর্কে অনুমানের বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে এই প্রথম উপাদানকে প্রজ্ঞা রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

অবস্তু থেকে সৃষ্টির প্রথম উদ্ভব—একথা যিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম এমপেডোক্লিস (Empedocles)। সৃষ্টির চারটি উপাদান দু-ধরনের শক্তি-দ্বারা পরিচালিত—প্রেম ও বিশৃঙ্খলা। অ্যানাক্সাগোরাস নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন যে, গতি—যার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে—তার প্রধান কারণ Nous বা প্রজ্ঞা। তিনি অতিক্রমনিক এক অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের অন্তরালে বস্তু ও অতিবাস্তবিক সত্তার দিকে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। এই পার্থক্য অনতিক্রম্য না হলেও এই দ্বৈত অবস্থার চিন্তা পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্লেটোর Dialectic-এ এই প্রশ্নই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয়।

প্রথম প্রশ্ন যেটা দেখা দিয়েছিল সেটা এই যে, যদি সৃষ্টির প্রথম কারণ অবাস্তবিক হয়—তাহলে সেই অবাস্তবিক শক্তি কি করে বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে? প্লেটো বলেছেন, ঈশ্বর এমন বস্তুসত্তা থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন—যে বস্তুসত্তা চরিত্রগত ভাবে ছিল দুঃশাসনীয়। সুতরাং ঈশ্বর তাকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারেন নি। তবে যতদূর সম্ভব এর মধ্যে নিজের মানসশক্তিকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুসত্তার যে দুর্বিনীত অংশ ঐশ্বরিক ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করেছিল তাকেই তিনি অশুভ শক্তির উৎস বলে মনে করেছেন।

জগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বর এতে দেহ ও আত্মা আরোপ করেন। আদি বস্তু-সত্তার আকৃতিহীন ও বিশৃঙ্খল কিছু অংশে ঈশ্বর নানাপ্রকার আঙ্কিক আকৃতি ও সংখ্যা ঢুকিয়ে দেন। এর ফলে সৃষ্টির চারটি উপাদান ফুটে উঠে যা দিয়ে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেন। পাইথাগোরাসের প্রভাবে প্লেটোর সৃষ্টিতত্ত্বে অঙ্ক এই জন্য বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। প্লেটো তাই বলতেন, জগৎ-সৃষ্টিতে ঈশ্বর বড় গণিতজ্ঞের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সেইজন্য আত্মার উপাদান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম হল—গতি। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করে তিনি এই গতি সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন। আত্মার মৌল চরিত্র এই জন্য স্বতগতি। এই আত্মাই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গতি সঞ্চার করে। এই আত্মার জন্যই বিচ্ছেদকরণ, মিশ্রণ, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং বিগলন। আত্মার দ্বিতীয় চরিত্র হল বুদ্ধিবৃত্তি। প্লেটোর মতে এই আত্মা সৃষ্ট, অবতরিত। সময়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। বিশৃঙ্খলা থেকে ঈশ্বর যা কিছু বাইরে নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে নিজের ভেতর থেকেই তিনি আত্মার সঞ্চার করেন। আদিবস্তুসত্তাতে তিনি গাণিতিক হিসাবে আকৃতি প্রদান করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি যেমন দেহসত্তা দান করেন তেমনই দান করেন প্রাণসত্তা। নিজের অনুকৃতিতেই তিনি মানবদেহ ও প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জীব জগৎ ও মানবের কাছে তিনি পিতাস্বরূপ। এ ভাবে তাঁকে চিন্তা করলে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মধ্যে এসে যান। আবার ভিন্নভাবে ভাবতে

গেলে রহস্যজনক ভাবে তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। তখন তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণার মধ্যে আনা রীতিমত কষ্টকর।

প্লেটোর জগৎসৃষ্টিতত্ত্বে সূক্ষ্মভাবে একটা দ্বৈতাবস্থা রয়েছে। ঈশ্বর নির্ভেজাল নৈর্ব্যক্তিক ভাব হিসাবে বস্তুসত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। সুতরাং সৃষ্টির রূপকার হিসাবে তাঁকে স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা করতেই হয়েছিল। এই জন্যই তিনি গাণিতিক একটা রূপরেখার এবং বস্তুর মধ্যে প্রাণ-সত্তার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশ্বাত্মার অবতারণা করে বস্তু ও ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি সংযোগসূত্র সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বস্তুর বাইরে স্বতন্ত্র একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্লেটো যে চিন্তা করেছিলেন অ্যারিস্টটল সেই ধারণা সমর্থন করতে রাজি না হলেও—নিজেও দ্বৈতভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। ঐশ্বরিক জীবনকে তিনি আত্মচিন্তাজাত শক্তি হিসেবে দেখতেন। কিন্তু এর পর থেকেই গ্রীক চিন্তাতে দ্বৈত সত্তার—মন ও বস্তু, আত্মা এবং বিষয় এই দুই মেরুপ্রান্তিক ধারণাকে একটি অদ্বৈত অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়। আত্মসত্তাকেই বিশেষ গুরুত্ব দেবার চেষ্টা চলে। তবে এই আত্মিক অবস্থার মধ্যেও দুটি দিক থেকেই যায়—সার্বিক আধ্যাত্মিক এক অবস্থা এবং স্বতন্ত্র বাস্তবিক অবস্থা। এক্ষেত্রে দু'দল-এর উদ্ভব হয়—ভোগবাদী দল ও শোক-দুঃখে উদাসীন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলার দল। ভোগবাদীদের বলে Epicureans এবং দুঃখ-শোকে সমবোধকারীদের Stoics. তবে উভয়েই অদ্বৈত সত্তা ছিল বস্তুবাদী। এক্ষেত্রে দার্শনিক দিক থেকে কাউকে নিয়ে যদি আলোচনা করা চলে তবে তাঁরা Stoic-দল।

সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হেরাক্লিটাসের মত Stoic-দের কাছেও ছিল অগ্নি। তবে এ অগ্নি হল তন্মাত্রিক অগ্নি বা অগ্নির অতিসূক্ষ্ম অবস্থা। একে অগ্নিবায়ু বা ব্যোমরূপেও কল্পনা করা যেতে পারে—যেটা আধুনিক ফিজিক্সের ভাষায় pulsating void. বস্তুসত্তা এখানে শক্তিরূপ। তাঁদের মতে যখন স্বর্গ বা মর্ত্য কিছুই ছিল না—তখন শুধুমাত্র ছিল আদিবস্তু, তন্মাত্রিক অবস্থা। সমগ্র অস্তিত্বের এ ছিল একমাত্র অস্তিত্ব। এ থেকেই দৃষ্টিগোচর বিশ্বের উদ্ভব। আবার পরিণতিতে এখানেই মিশে যাবে। এইই হল সৃজনশীল শক্তি অথবা দেবতা। এই থেকেই ছন্দময় বিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং Stoic-তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু ও শক্তি মিলে স্বতন্ত্র এক অবিছিন্ন অস্তিত্ব ছিল। এই শক্তি হল এক ধরনের দ্বান্দ্বিক শক্তি। আন্তচাপের ফলে যে শক্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছিল—অথচ একটা তুলনামূলক ঘনত্ব অর্থাৎ আন্তআকর্ষণীয় চাপের জন্য বৈচিত্র্য 'একে'র মধ্যে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে অবস্থান করছিল। এ ঠিক ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরভাগের অবস্থার মত। ভাবতেও অবাক লাগে, বহু প্রাচীন কালেও মানুষ কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যুগের অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার মত

চিন্তা করতে পেরেছিল। এই ঘনত্বের মধ্যে বস্তুসত্তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। এই অবস্থাটাই ছিল অগ্নির প্রাথমিক উপাদানের অবস্থা। চাপ বাড়তে থাকলে অগ্নির সূক্ষ্ম উপাদান বায়ুতে পরিণত হয় অর্থাৎ শক্তিতে। এ থেকেই বেরিয়ে আসে জলের স্থূল উপাদান—অর্থাৎ আদ্র'বাষ্পীয় শক্তিপ্রবাহ। এর পরই দেখা দেয় স্থূলজগৎ অর্থাৎ স্থূলসৃষ্টির উপলব্ধিযোগ্য সূক্ষ্ম উপাদান—হয়তো অণুপরমাণু। এ থেকেই সৃষ্টি হয় আকাশের—যে আকাশ বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ-যোগ্য। বস্তুসত্তা না থাকলে কখনই আকাশ দেশে ভারি বস্তুর উদ্ভবে তার চতুর্দিকে বেঁকে যেতে পারে না—যে বঙ্কিমসত্তার প্রমাণ আধুনিক পদার্থবিদ্যা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং বস্তুজগতে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুরূপ যে স্বতন্ত্র উপাদান নজরে পড়ে তার বিশেষ অস্তিত্ব একটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব মাত্র। না হলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তারা স্বাতন্ত্রিকতাহীন। Stoic-রা তাই স্পষ্ট বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা যত সূক্ষ্ম তার মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব তত বেশী। তাই স্থূলবস্তুর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কম। এখানে Stoic-রা মূলত যা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ higher frequency and lower frequency. বিশ্বপ্রকৃতিতে বস্তুসত্তার নির্দিষ্টরূপ আসে Stoic-দের মতে ব্যোমীয় শক্তি থেকে। এর পশ্চাতে একটা বৌদ্ধিকবৃত্তির উপস্থিতিকে সহজে যেন অস্বীকার করা যায় না। এই বৌদ্ধিকবৃত্তির আধার হিসেবে Stoic-রা আত্মার কল্পনা করেছেন—সম্ভবত একেই বোধহয় আধুনিক পদার্থবিদেরা morphogenetic field বলেছেন। সুতরাং বস্তুর আদি অবস্থা স্থূল বাস্তবিক অবস্থা নয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তিও সৃষ্টির পূর্বে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। হয়তো সবই ঘুমন্ত ছিল কোন ক্ষুদ্র field-এ, না হলে বৃহত্তর field-এ হয়তো এরই নাম Supervoid—আমরা যাকে বলি পরব্রহ্মন—যেখানে আত্মার যথার্থ অবস্থান, ঔপনিষদিক ঋষি বাহেবর কথা মত 'শান্তো ইয়মাত্মা'। সুতরাং অদ্বৈত বস্তুতান্ত্রিক অবস্থা থেকে বিশ্বসৃষ্টির রহস্যব্যাখ্যাতে Stoic-রাই বোধহয় প্রথম এগিয়ে এসেছিল।

অদ্বৈতবাদী তরফ থেকে গ্রীসে বিশ্বসৃষ্টির আরেকটি দর্শনও গজিয়েছিল। একে বলা হয় Neo-Platonic Cosmogony. এঁদের মতে বিশ্বের যথার্থ উৎস বাস্তবিকও নয় আত্মিকও নয়। এই উভয়কেই অতিক্রম করে এক উত্তরণীয় অবস্থা। মনে হতে পারে যে, এঁরা এই ধরনের অভিমতের জন্য আত্মিক অর্থাৎ subjective ভাবকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এঁরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা আত্মিক। অধ্যাত্ম জগতের চাবিকাঠি তাঁদের মতে রয়েছে আত্মিকতার মধ্যেই। আত্মিক জগৎ অপেক্ষা বাস্তব জগৎ অনেক বেশী অবাস্তব। সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই জানা সম্ভব। যথার্থ সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেই অর্থাৎ অহং-এর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেই করা যায়। একেই ইংরেজীতে বলে

ecstasy, বাংলায় চরমানন্দ। এই অবস্থায় আত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় ভাবই তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

Neo-Platonic-রা যদিও বলেন যে, তাদের এই তত্ত্ব সরাসরি প্লেটো থেকে লাভ করা তবু আসল সত্য যা তা হল এই যে, এ ধরনের চিন্তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচ্যের মরমিয়াবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন। এই ধরনের চিন্তা বোধহয় প্লোটিনাসের (A D. 204-269) মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে পরমসত্তা নির্ভেজাল উত্তরণীয় এবং অজ্ঞেয়। একে জীবও বলা যাবে না নির্ভেজাল বুদ্ধিও বলা চলবে না। কারণ, উভয় শব্দের মধ্যেই একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং উপনিষদের মত এবং গৌতম বুদ্ধের মত এই পরমকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চুপ করেই থাকতে হবে—কারণ, এই পরম যে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—অনুচ্ছিষ্ট। তবুও পরিকল্পনা ছাড়া যখন সৃষ্টি সম্ভব নয় তখন একে এক ধরনের মানস বলে ধরে নিতে হবে—যাকে বলে ঐশ্বরিক মানস। এই ঐশ্বরিক মানসে চিন্তা স্বতজাত। পরম সত্য হল একই সঙ্গে জ্ঞানের কাছে মন ও বিষয়ের ঐক্যবদ্ধ অবস্থা। সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্তে এটি স্থির। সৃষ্টির মুহূর্তে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই পরমাবস্থার উদ্ভব কোথা থেকে? এর উদ্ভব তাঁর মতে স্বভাব থেকে, যেমন সূর্যের স্বভাব থেকে তাঁর গুণ হিসেবে আলো বিকিরিত হয়।

সর্বোচ্চের মধ্যে রয়েছে এমন গুণ যা নিচে নেমে ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু নিজে কখনও ক্ষুদ্র নয়। কোনকিছু থেকে যেমন মনের উৎপত্তি, তেমনই মন থেকে আত্মার উৎপত্তি। মনের পাশাপাশি যেমন এসেছে ধারণা, তেমনই দেহের পাশাপাশি এসেছে আত্মা। আত্মার মধ্যে বিভাজক উপাদান থাকলেও আত্মা কিন্তু অতিবাস্তবিক। নির্ভেজাল আত্মা অবিভাজ্য—তবুও স্বতন্ত্র দেহের মধ্যে তা প্রবেশ করে। সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করেই আত্মা ছড়িয়ে রয়েছে। তথাপি এর গুণাবলী— বিশ্লেষণাত্মক শক্তি, স্মৃতি, অনুভব, প্রাণশক্তি প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আত্মা হল বিশ্বাত্মা। তথাপি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্বও আছে।

প্লেটো বস্তু ও মনকে দুটি পৃথক সত্তা দিয়েছিলেন। প্লোটিনাস বলছেন, আত্মার গতি থেকেই বস্তুর জন্ম। বস্তুর অন্তরালে এমন কিছু রয়েছে যার সঙ্গে বস্তুর রূপের মিল নেই। সেই অন্তরালস্থ উপাদানগুলি ভিন্নরূপও নিতে পারে। সর্বকিছুরই গভীর অন্তঃপুরে একটা কিছু রয়েছে যার বস্তুত কোন অস্তিত্বই নেই। বর্তমান বিজ্ঞানে একেই বলা হচ্ছে 'ইনার স্পেস'। ফলে নবপ্লেটোপন্থিদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা মরমিয়াবাদের গন্ধ রয়েছে—যে মরমিয়াবাদের গন্ধ ফুটে উঠেছে বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মধ্যেও।

হিব্রুদের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি নিয়ে প্রথম দিকে তেমন মাথা ঘামানো হয়নি। যা যেমন ভাবে আছে তেমন ভাবেই তাকে ধরে নেওয়া হয়েছে।

বরং মানুষের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে সেটা নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। 'জেনেসিস'-এ দেখা যায় পৃথিবীকে তার বর্তমান অস্তিত্বে স্বতসিদ্ধ একটা ঘটনা বলে ধরে নিয়ে তবেই আলোচনার শুরু হয়েছে। তখন পৃথিবী ছিল অনুর্বর ভূমি মাত্র। লতাগুল্মাদি কিছুই গজায়নি। কারণ—জহ্ওয়েহ্ এলোহিম অর্থাৎ যেহোবা তখন ধরনীর উপর বৃষ্টিপাত ঘটাননি। মৃত্তিকা কর্ষণ করার জন্য কোন মানুষেরও জন্ম হয়নি। একটি ঝর্ণা যা উপরে উঠে গিয়েছিল—তা থেকে নিচে জল ঝরে পড়ে। সম্ভবত এখানে পৃথিবীর নদী থেকে উপরে বাষ্প উঠে মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টিপাতের কথাই বলা হয়েছে, কারণ, ঝর্ণা উপরে উঠতে পারে না। এর ফলে মৃত্তিকা সিক্ত হয়। কাদা জমে উঠে। জহ্ওয়েহ্ এলোহিম কুম্ভকারের মত সেই কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণ বায়ু অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেন। ফলে জীবন্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটে। মাটি—, যাকে বলা হয় আদামা বা ধুলো তাই দিয়ে তৈরি বলে মানুষের নাম হয় আদাম আমরা যাকে আদম বলতে অভ্যস্ত। জহ্ওয়েহ্-এলোহিম ইডেন উদ্যানে নানাপ্রকার উদ্ভিদের সঞ্চার করেন। তৈরি হয় জীবন বৃক্ষ, জ্ঞানবৃক্ষ, যে জ্ঞানবৃক্ষে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার ফলই ফলে। এই উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে পরে চারটি নদীতে পরিণত হয়—পিশোন, গিহোন, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস।

ঈশ্বর আদমকে এই উদ্যান চাষের দায়িত্ব দেন এবং এর ফলমূল ভক্ষণের অনুমতি দেন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন। অবে আদমকে নিঃসঙ্গ দেখে তার জন্য নানাধরনের পশুপাখি তৈরি করেন—কিন্তু তার যথার্থ সঙ্গী হবার মত কাউকে সৃষ্টি করেন না। এটা বুঝতে পেরে জহ্ওয়েহ্ এলোহিম আদমকে নিবিড় নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে তাঁর পাঁজর থেকে একটি অস্থি নিয়ে তাকে রক্তমাংস দিয়ে আবৃত করে দেন। ইনিই হলেন ইভ্। মানবী। আদমের দেহ থেকে অর্থাৎ Man-এর দেহ থেকে পঞ্জর ধার করে অর্থাৎ owe করে তাঁর সঙ্গিনীকে তৈরি করা হয়েছিল বলে তার নাম হয় Owe-man= Woman. আদম নিদ্রাভঙ্গ হবার পর তাকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারেন যে, এ হল তার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস—ইশ (পাঁজরের হাড়) শা—অর্থাৎ পঞ্জরজাতা। এইভাবে স্বতসিদ্ধ ধরণীতে মানব ও মানবীর উদ্ভব হয়। প্রথম এরা ঘুরে বেড়াতেন উলঙ্গভাবে—নিষ্পাপচিত্তে।

আদম ইভের এই গল্পের মধ্যে প্রাচীন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার আদিম ধরনের জবাবেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—যেমন, মানুষ কি দিয়ে তৈরি? যেহেতু মৃত্যুর পর সে ধুলোতে মিশে যায়. সেইজন্য সহজ উত্তর, ধুলো দিয়ে তৈরি। কুম্ভকার যেমন মাটি থেকে পাত্র তৈরি করে, ঈশ্বর তেমনই তাদেরও মাটি থেকেই তৈরি করেছিলেন বলে বিশ্বাস। শ্বাস যেমন বায়ু, যা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে—এই শ্বাস মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ঈশ্বর মানবের মধ্যে

জীবনসঞ্চার করেছিলেন বলেও তারা মনে করে। এই শ্বাস বা প্রাণ দেহ থেকে বাইরে গেলেই তার মৃত্যু হয়। তারা মনে করে নাম ও বিষয় এক। কারণ, নাম মনে হতেই নামের বিষয় মানসপটে ভেসে ওঠে। কোন কিছুর নাম করা মানেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করা। আদম বিভিন্ন পশুর নাম দিয়েছিলেন বলেই পশুগুলি তাঁর অধীন হয়েছিল। এই যে ভাষা যা মানুষ ব্যবহার করে তা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ঈশ্বরের মুখ থেকে।

ইডেন শব্দের উদ্ভব হয়েছিল ব্যাবিলনীয় এডিনু বা সমতলভূমি থেকে। একেই উদ্যান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদমের প্রথম সঙ্গী ছিল পশুকুল। গল্পটি হয়তো রূপক। এ দ্বারা হয়তো আদিম বন্যমানুষকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে – যাকে ব্যাবিলনীয় ভাষায় বলা হত ইয়াবানি। ব্যাবিলনীয় কাহিনীতে দেখা যায়, ইয়াবানিকে সৃষ্টি করেছিলেন দেবী ইশ্তার। এই আদিম মানুষের মধ্যেই ছিল প্রাণের গর্ভ বা ক্ষেত্র। পশুজগতের সঙ্গে সে তখন মিশে ছিল।

আদমের গল্পের মধ্যে ব্যাবিলনীয় প্রভাব থাকলেও এর উপর যে রঙ চেপেছে সেটা প্যালিস্টিনীয়। এখানে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ছিল ওল্ড টেস্টামেন্টে তারই ছায়া পড়েছে। সুতরাং জেনেসিস[১]-তে যে জীবসৃষ্টিরহস্যের কাহিনী পাই তা প্যালিস্টিনীয় লোকগাথা থেকে এসেছে বলে মনে হয়। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এলোহিম অর্থ ঈশ্বর। তাকে এ-রূপেই কল্পনা করা হয়েছে। হিব্রুরা এই ঈশ্বরকে ডাকত 'জুহু' বলে। হিব্রুদের ধারণা ছিল, ঈশ্বর থাকতেন সাইনাই অঞ্চলে।

হিব্রুদের মধ্যে জগৎসৃষ্টির চিন্তা এসেছে জহ্ওয়েহ্-এর সঙ্গে রহব নামে এক অশুভ শক্তির সংগ্রাম থেকে। সম্ভবত এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পূর্বে যে আদিম বিশৃঙ্খলা ছিল সেই বিশৃঙ্খলার কথাই বলা হবেছে—যার নাম cosmic chaos।

জোব গ্রন্থের 26/2f-এতে রয়েছে এমনতর বর্ণনা— যে বর্ণনা চণ্ডীতে কারণসমুদ্রে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটভের সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জোবের বক্তব্য এই ধরনের ঃ—

> 'সমগ্র শক্তি দিয়ে তিনি সাগরকে আন্দোলিত করলেন।
> অশুভ শক্তি রহবকে তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলেন ॥
> তার শ্বাসে আকাশ ফুটে উঠল।
> সহস্তে তিনি পলায়নপর সর্পকে হত্যা করলেন ॥'

কারণসমুদ্রের বিশৃঙ্খলা এখানে Blackhole-এর কৃষ্ণগহ্বরস্থ অস্থিরতা। রহবহত্যা হল symmetry breaking। শ্বাস হল বিস্ফোরণজাত kinetic energy যা দেশ ও কাল সৃষ্টি করেছিল। এবং সর্পহত্যার অর্থ একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে শক্তিকে ধরে রাখা—অর্থাৎ গোলকের মধ্যে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই তত্ত্ব মধুকৈটভবধের মধ্যে আরও বিরাট মহিমা লাভ করলেও মূলতঃ সৃষ্টি

পর্যায়ের আদি বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ cosmic chaos-এর কথাই বলা হয়েছে। এই chaos দার্শনিক হেগেলের antithesis। 'এক'-এর অভ্যন্তরের যা স্বাভাবিক অবস্থা, তারই ফলে এক থেকে বহু হয়েছে।

এই যে আদিম বিশৃঙ্খলা ইহুদী পুরাণকাহিনীতে তার ভিন্নতর বর্ণনাও আছে। এখানে শ্রীশ্রী চণ্ডী বর্ণিত মধু-কৈটভের মত দুটি দৈত্যাকে দেখা যায়—স্থলের দানবীয় শক্তির প্রতীক বেহেমথ এবং জলের দানবীয় শক্তি লেভিয়াথান। এদের মধ্যে বেহেমথ হল পুরুষ এবং লেভিয়াথান মহিলা। আবার কোথাও কোথাও দানবদের কোন উল্লেখই নেই; সেখানে শুধু দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর সাগরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। দুই দানবীয় শক্তির যে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরও অন্ধকার বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে বিরাট রূপক রয়েছে, অন্তরালে রয়েছে অধ্যাত্ম সত্য। অনেকে এই জন্য ইহুদীদের মিশর থেকে মুক্তি পাবার ঘটনাকে মহাজাগতিক কোন অবস্থার পৌরাণিক রূপক কাহিনী বলে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁরা মনে করেন মিশরই এই রহবরূপ দৈত্য।

মিশরীয় কাহিনীকে প্রলয়রূপ কাহিনী বলেও অনেকে মনে করেন। ঈশ্বর আদিম বিশৃঙ্খলা থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এই ছন্দময় বিশ্বে (cosmos) মানুষের ভ্রান্তিতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে, গুণসাম্যে তারতম্য ঘটলে আবার তিনি এই জগৎকে ধ্বংস করবেন—এবং আদিম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেবেন। এরপর আবার নতুন করে বিশ্বরচনা করবেন।

কখনও কখনও ইহুদী সৃষ্টিতত্ত্বে তিনটি দানবীয় শক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়—(১) দ্রুতগতিসম্পন্ন লেভিয়াথান—kinetic energy, যে লেভিয়াথান দেশে (space) থাকে। (২) সলিলস্থ ক্রূঢ় লেভিয়াথান এবং (৩) গভীর সমুদ্রের ড্রাগন। একে বলা হয় সর্প 'অম্' (Am)। একই ধরনের একটি ধ্বংসাত্মক কাহিনীতে দেখা যায় বিশ্বের সকল জীব, পাহাড়, পর্বত, সব কিছু গলে গিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। আকাশের আলো নিভে অন্ধকার নেমে এসেছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এটাই হল Big Crunch. এই বিশৃঙ্খলাকে জেনেসিস ১[২]-তে তোহু এবং বোহু বলা হয়েছে।

এ-সব কাহিনী থেকে হিব্রুদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা হল :—আদিতে ছিল নিরন্ধ্র অন্ধকারের মত বিশৃঙ্খল, অনুর্বর সলিল (কারণ সলিল?)। এর মধ্যে ছিল দুষ্টাকার দৈত্য। দেবদেবীদের আনন্দ উৎপাদন করে জহ্ওয়েহ্ এই বিশৃঙ্খলশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সংগ্রামে তিনি তার বায়ু (kinetic energy)-কে ব্যবহার করেন। এর ফলে আকাশের উদ্ভব হয়। সেই আকাশ থেকে নিচে জল ঝরে পড়ে। এই জল এখানে অণু ও পরমাণুস্বরূপ। এর পর মহাশূন্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এখানে হিব্রু সৃষ্টিতত্ত্বের যথেষ্ট মিল খুঁজেও পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয় কাহিনীর হিব্রু সংঘর্ষ মারডুক ও টিয়ামতের সংঘর্ষে

পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর এই দৈত্যকে দু-ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ দিয়ে তৈরি করেন স্বর্গ এবং আর এক ভাগ দিয়ে মর্ত্য। জলও দু'ভাগে বিভক্ত হয় —ঊর্ধ্ব দেশরূপে এবং নিম্নে অর্থাৎ স্থূলজগতে যথার্থ সলিলরূপে।

ব্যাবিলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী সাতটি ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। হিব্রু সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টি হয়েছিল সাতদিন ধরে।

সৃষ্টির আদিতে ছিল তোহু ও বোহু নামে বিশৃঙ্খলা। সম্ভবত এর দ্বারা 'এক'-এর মধ্যে দুইয়ের দ্বন্দ্বকে বোঝানো হয়েছে—Hegel-এর থিসিসের মধ্যে অ্যান্টিথিসিসের খেলা। একে অর্থাৎ chaos-অবস্থাকে আরও সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে—ট্-হোম (আদিসলিল, কারণসলিল)-এর বুকের উপর ভাসমান অন্ধকার রূপে বর্ণনা করে, ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে যাকে বলা হয়েছে 'তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন'। এই অন্ধকারের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঈশ্বরের শ্বাস—অর্থাৎ kinetic energy যা Bigbang-রূপ বিস্ফোরণজাত শক্তিরূপে বিশ্বকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল, কালের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এর পর ঈশ্বরের সাতটি বাক্য থেকে জগতের উদ্ভব হয়। এই সাতটি বাক্য প্রকৃত পক্ষে bigbang-এর সাতটটি মূল কোয়ান্টাম লীপ। যার এক একটি আরও সাত ভাগে বিভক্ত—৭ × ৭ = ৪৯। এরসঙ্গে আদি অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা মিলে (৭ × ৭ = ৪৯ + ২) = ৫১টি ধাপে জগৎ সৃষ্টি করে।

সৃষ্টির আদি পর্যায়ে দেখা দেয় আলো—যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের big-bang বা blackhole-এর মহা বিস্ফোরণজাত আলো বা ভারতীয় বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তারপরই মহাশূন্যতার বুকে দেখা দেয় Pulsating void বা আকাশ। এর পরই দেখা দেয় স্থূলসত্তা (dryland) বা স্থূলসত্তার তন্মাত্র—অণু-পরমাণু যার পারস্পরিক যোগাযোগে স্থূলবিশ্ব তৈরি হয়। তার উপর উদ্ভিদ পশুমানবাদি প্রাণের সঞ্চার হয় অর্থাৎ প্রাণের বীজাবস্থা দেখা দেয় plasmic মেঘের মধ্যে। তারপর প্রকাশ পায় গ্রহনক্ষত্রাদি। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণেও এই plasmic ছায়াপথ বা নীহারিকাপুঞ্জ থেকেই গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় হয়েছিল। পঞ্চমত দেখা দেয় প্রাণের বীজবাহী জলরাশি। ৬ষ্ঠ দিনে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। প্রাণের বিকাশ মনুষ্যরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সপ্তম দিনে সৃষ্টিশেষে ঈশ্বর বিশ্রাম করেন অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎকে স্ফীতমান অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি কুলকুণ্ডলিনী হিসেবে সৃষ্টির প্রান্তদেশে এসে মৌল শক্তিরূপে বিরাজ করতে থাকে। ব্যাবিলনেও দেখা যায় সপ্তম ফলকে মারডুককে সৃষ্টিকার্যের জন্য স্তুতি করা হচ্ছে। সুতরাং ক্রমেক্রমে হিব্রু সৃষ্টিকল্পনায় অদ্ভুত একটা বৈজ্ঞানিক সত্য রূপককাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ববিদেরা অনেকেই আদিম বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার গভীর সমুদ্র প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাইরে এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করে এর মধ্যে দ্বৈতবাদের একটা সুর খুঁজে পান বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু

এটা বোধহয় ভৌতিক আশঙ্কা মাত্র। গভীরভাবে ডুব দিলে সেই এক এবং অদ্বিতীয়েরই সন্ধান পাওয়া যাবে। অনেকে তা পেয়েও ছিলেন। সবকিছুই সেই এক ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। দ্বৈতবাদীয় সন্দেহ নিরসনের জন্য এধরনের বক্তব্যই তো যথেষ্ট—'আমি জহ্ওয়েহ্। আমি ছাড়া দ্বিতীয় নেই। আমিই আলো সৃষ্টি করেছি, আমিই অন্ধকার সৃষ্টি করেছি। আমিই পৃথিবীকে সম্পদশালী করেছি। আবার শয়তানও আমারই সৃষ্টি। আত্মজ্ঞানের এটাই কথা—যে কথা ভারতবর্ষে ঋষি বাক্ বলেছিলেন।

পৃথিবীর নানাদেশেই প্রাচীনকালে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যেমন নানা ধরনের চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে তেমনই ভারতবর্ষও সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বৈদিক ধারণামতে বিশ্ব তিন অংশে বিভক্ত—পৃথিবী (স্থূলজগৎ) বায়ু ও আকাশ। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনার ক্ষেত্রে দুটি শব্দকেই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে —স্বর্গ এবং মর্ত্য। স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়ই দেবতাদেরই ক্ষেত্র—দেবতা ও দেবপুত্র। কখনও কখনও এক দেবতা, কখনও ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, সোম সকলে সমবেতভাবে স্বর্গ-মর্ত্য ও সমগ্র জগৎ তৈরি করেছেন এমন দেখা যায়। সৃষ্টিকর্মকে কখনও বর্ণনা করা হয়েছে কারিগরের হাতে সৃষ্টির মত করে, কখনও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। কখনও তন্ত্রী হিসেবে অর্থাৎ বুনন করা হচ্ছে এমন ভাবে। তবে মাঝে মাঝেই চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্যও চোখে পড়ে। কখনও বলা হচ্ছে স্বর্গ ও মর্ত্য থেকে দেবতাদের সৃষ্টি, কখনও আবার বলা হচ্ছে দেবতারাই স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন। কখনও বলা হয়েছে অদিতি থেকেই সবকিছু, যেমন দক্ষের জন্ম হয়েছে। আবার কখনও বলা হয়েছে, দক্ষ অদিতিকে সৃষ্টি করেছেন। অদিতিকে ধরা হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে, দক্ষকে পুরুষশক্তি হিসাবে। দক্ষকে প্রধানত পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুরুষ নিজেকে বিশ্বহিসাবে প্রকাশিত করেছেন। এই পুরুষকে লক্ষ্য করেই ঋগ্বেদের (১০, ৯০) পুরুষ-সূক্ত রচনা করা হয়েছে। অথর্ববেদ (১৯,৬) বাজসনেয়ি সংহিতা (৩১), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩,১২) প্রভৃতিতেও এই ধরনের চিন্তার ছায়া পাওয়া যায়।)

পুরুষকে বলা হয়েছে সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু ও সহস্রপদবিশিষ্ট। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন এবং দশঅঙ্গুলী পরিমান দেশ-এর উপরে উঠে গেছেন। এই দশঅঙ্গুলী বলতে ঋগ্বৈদিক ঋষি কি বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, সম্ভবত ত্রিমাত্রিক জগতের উর্ধ্বে যে দশমাত্রিক অবস্থা সেই কথাই বলা হয়েছে—যেখানে সৃষ্টি অণুর নিউক্লিয়াস অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এ ধরনের চিন্তাও দাঁড়ায় না যখন পরক্ষণেই তাকে সমগ্রবিশ্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যা আছে তাতো বটেই ভবিষ্যতে যা হবে তাও তিনি। তিনি অমৃতেরও উর্ধ্বে। বস্তুজগৎ যতটুকু দেখা যায় তা তাঁর চারভাগের একভাগ মাত্র। বাকী অংশ রয়েছে মহাদেশে (space) অর্থাৎ মহাশূন্যতার মধ্যে। এই তিন ভাগ

ধরেই পুরুষ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে রয়েছেন। জড় অজড় সব কিছুর মধ্যেই তিনি রয়েছেন। তার থেকেই বিরাজ-এর জন্ম। এই বিরাজ অর্থে অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। এই বিরাজ থেকে পুরুষ। এই পুরুষ সম্ভবত আদি পুরুষের সৃষ্টির আবেগ। জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থূল জগৎ অতিক্রম করে যান। সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে তাঁকে false vacuum হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতারা এই পুরুষকে বলি দিলে তা থেকে তার সূক্ষ্ম সত্তা (Plasma) ঝর্ণাধারা নিয়ে বেরিয়ে আসে। গ্রীষ্ম এর জ্বালানী হিসেবে কাজ করে—অর্থাৎ ইচ্ছা, কাম বা কম অটেফ। এর আহুতি হয় শরৎ হেমন্তে—অর্থাৎ সৃষ্টি যখন তার নির্দিষ্ট একটা রূপরেখাপ্রাপ্ত হয়। দেববৃন্দ, সাধ্যগণ এবং অন্যান্য ঋষিরা তাঁকে বলি দেন অর্থাৎ এরা পুরুষের আন্তশক্তি হিসাবে কাজ করেন—যাঁরা তাকে স্ফীত হতে সাহায্য করেছিলেন—অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরস্থ শক্তির বা বেগের মত। এই যজ্ঞ অর্থাৎ বলি থেকেই জগতের সব কিছুর উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ তার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য জঙ্ঘা ও শূদ্র পদপ্রান্ত সৃষ্টি করেন। এর অর্থ এই নয় যে সমাজে বর্ণভেদ আনা হয়। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মন অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরস্থ অস্থির তেজের বিস্ফোরণজাত শব্দসৃষ্টির প্রথম অধ্যায়। শব্দ মুখ থেকে নিসৃত হয় বলেই একে পুরুষের মুখনিসৃত বলা হয়েছে। এরপরই আসে তেজপর্যায় যাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। তেজের অর্থাৎ তেজপ্রকাশের মাধ্যম বাহু বলে ক্ষত্রিয়কে পুরুষের বাহুনিসৃত বলা হয়েছে। এ হল—kinetic energy-এর সম্প্রসারণপর্যায়। এই বেগ কমে এসে মাধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাকেই জঙ্ঘাদেশ বলা হয়েছে। এই হল বিশ্বজগতের মধ্যমা পর্যায়। সর্বশেষে জগৎ তামস গুণ-সম্পন্ন স্থূলতাপ্রাপ্ত হলে একে বলা হয়েছে স্থূলতা পর্যায়। পুরুষের এই ব্যবচ্ছেদ সামাজিক বর্ণভেদের কারণ নয়। এহল ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির একটি মরমিয়া অভিজ্ঞতা যা রহস্যময়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। D. D Kosambi-এর মতে সাধ্যঋষিরা ভারতের আদি মনুষ্যশ্রেণীর। আর এই মরমিয়া ভাব ভারতের আন্তস্বভাব। পুরুষের এই ব্যবচ্ছেদে যদি শ্রেণীভেদ হত তাহলে আবার বলা হতনা যে, তাঁর আত্মা থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্র। এই চন্দ্র হল দিব্যজ্যোতি, একে বিন্দুও বলা যেতে পারে। মহাশূন্যতার হৃদয় থেকে অব্যক্ত শক্তি-প্রবাহের পর সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টি বিন্দুরূপেই ফুটে উঠেছিল, যে-চিত্র যোগীরা ধ্যাননেত্রে দেখতে পান। সূর্য এসেছিল তার চক্ষু থেকে। এই সূর্য প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম চোখে দেখা জ্যোতিমাত্র। plasmic ছায়াপথ অথবা নীহারিকাপুঞ্জও হতে পারে। ইন্দ্র ও অগ্নি আসেন তার মুখ থেকে। এ দুটিও তেজেরই প্রতীক। বায়ু আসে তার প্রশ্বাস থেকে - যাকে বলে বিস্ফোরণজাত kinetic energy, নাভিদেশ থেকে আসে আবহাওয়ামন্ডল। এই নাভিদেশ—দেহতত্ত্বের মতে, তন্ত্রের ষটচক্রভেদ মতে স্থূলপর্যায় থেকে ঊর্ধ্বদিকে সৃষ্টির তৃতীয় ধাপ, যেখানে বাষ্পপূর্ণ মেঘের আনাগোনা চলে। সুতরাং একে আবহাওয়ামন্ডল বলা চলে।

তাঁর মস্তিষ্ক থেকে আকাশ দেখা দেয়—এই আকাশ মস্তিষ্কের সপ্ততলের সাত ভাগের একটি ভাগ মাত্র অর্থাৎ তন্মাত্রিক আকাশ অথবা সহস্রারের কূটস্থানস্থ মহাশূন্যতারূপী পরব্রহ্মন বা supervoid. পদদ্বয় থেকে এসেছে পৃথিবী অর্থাৎ স্থূলজগৎ। সুতরাং 'পুরুষ সূক্তে'র মধ্যে একটা রহস্যময় মরমিয়া ভাব যে কাজ করেছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে ঋগ্বৈদিক সূক্তগুলিকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। এই 'পুরুষ সূক্তে'ই বলা হয়েছে, যজ্ঞ করে দেবতারা যজ্ঞকে পূজা করলেন। অর্থাৎ যে আন্তশক্তি জীবরূপে প্রকটিত হল তারা এই আত্মবলিদান অর্থাৎ পুরুষের আত্মবোধত্যাগজাত জগতের স্বরূপ জ্ঞাত হয়ে সেই বলিদানকে শ্রদ্ধা জানালেন, যেমন খ্রীষ্টানরা যিশু খ্রীষ্টের আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা করেন, উপাসনা করেন। দেবতারা আকাশে স্থান লাভ করলেন বলে পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে। এর অর্থ পুরুষের আন্তশক্তির বহিঃপ্রকাশ দেশেই (space) ধৃত হয়ে আছে। যে সাধুঋষিরা এই যজ্ঞ করেছিলেন অর্থাৎ পুরুষের বধচ্ছেদে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাও আকাশেই স্থান লাভ করেছেন। এই সাধুঋষিরা সম্ভবত স্বধা শব্দজাত অর্থাৎ আন্তভাবে ফুটে ওঠা অস্তিত্ব।

এই সাধুঋষিরা সম্ভবত পুরুষের আন্তভাব। ঋগ্বেদের অন্যত্র এইজন্য পুরুষকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, অজাত এবং সর্বদেবো-(দাতা)পরি স্থান দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে (১০. ৮১, ৮২) এই পুরুষকেই বিশ্বকর্মন নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্বকর্মন হলেন সর্বস্রষ্টা। ঋগ্বেদের আর একটি উল্লেখযোগ্য সূক্তে (১০, ১২১) এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, প্রথম সৃষ্ট দেবতা কে যিনি এই বিশ্বজগৎ তৈরি করে তাকে তুলে ধরে রেখেছেন? শেষ কবিতায় তাঁকে প্রজাপতি বলা হয়েছে, জীবের অধীশ্বর। পরে 'প্রজাপতি ব্রহ্মা'র সঙ্গে এক হয়ে যান। প্রাচীন পৌরাণিক ধারণাতে আদিসলিল থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রথম দেবতার উদ্ভব। বিজ্ঞান বর্তমানে মহাশূন্যতাজাত এই ব্রহ্মাকে নিউট্রন ফিল্ড রূপে কল্পনা করেছে—যে ক্ষেত্র আপনাআপনিই নিজ থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন নিক্ষেপ করে দেশে সৃষ্টির উপাদান সৃষ্টি করছে। একে স্বর্ণময় বীজ বা হিরণ্যগর্ভ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এই হিরণ্য শব্দ দ্বারা সম্ভবতঃ ঘনীকরণকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে সৃষ্টির উপাদান আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। তবে ধ্যানকালে দেশে (space) এক সময় গোধূলির মত এক ঘন হিরণ্যদেশ নজরে পড়ে যার মধ্যে অসংখ্য অণুপরমাণুকে দিব্যদৃষ্টিতে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। দেশের এই অবস্থাকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হয়েছে কিনা স্পষ্ট করে তা বলা সম্ভব নয়। হিরণ্যগর্ভস্থ এই অসংখ্য অণুপরমাণুই অসংখ্য দেবদেবী—যাঁদের হিরণ্যগর্ভজাত বলা হয়েছে। এ থেকেই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে। এই জন্য হিরণ্যগর্ভকে স্রষ্টাও বলা হয়। পরবর্তীকালে এই হিরণ্যগর্ভকেই cosmic egg বা ব্রহ্মা বলে ধরা হয়েছে। এই হিরণ্যগর্ভই এক সময় বিষ্ণুরূপে কল্পিত হয়েছেন। ব্রহ্মা থেকে আপনাআপনিই জগতের

উপাদান, proton ও electron-এর প্রকাশ। বিষ্ণু অর্থও স্বয়ংপ্রকাশ। গণ্ডক নদীতে এই জন্য এক ধরনের যে পাথর পাওয়া যায় যার মুখগহ্বর দিয়ে ভেতরে তাকালে হিরণ্যজ্যোতি অনুভব করা যায়, তাকে বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে শালগ্রাম শিলারূপে হিন্দুরা পুজো করে।)

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির ইতিহাস আরও সুন্দরভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হয়ঃ

তখন (সৃষ্টির পূর্বে) না ছিল বস্তু না অবস্তু
না ছিল পার্থিব জগৎ, না ছিল আকাশ।
তা হলে কি ছিল ? কে-ই বা থাকতেন কোথায় ?
শুধুই কি ছিল অতলস্পর্শী সেই আদিম জলরাশি (কারণসলিল) ?
তখন না ছিল মৃত্যু না অমৃতত্ব।
না ছিল রাত্রি, না দিন বা দিনরাত্রির পার্থক্য (relativity)।
তখন শুধু ছিল রুদ্ধশ্বাস 'অচঞ্চল এক'।
সেই 'এক' ছাড়া আর কেউই ছিল না।
তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন।
অবিচ্ছিন্ন আদিম বারিতে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল সব।
যা ছিল সবই মায়াচ্ছন্ন।
তার মধ্য থেকে সৃষ্টি প্রকাশিত হল (ইচ্ছার) উত্তাপে।
সেই মহামানসে প্রথম দেখা দিল ইচ্ছা এবং
সেই ইচ্ছাই মহামানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এল বীজের আকারে।
সত্যদ্রষ্টা কবিরা অনুভবের মধ্যে সেই অপ্রকাশ থেকে দেখতে পেলেন
প্রকাশ।
সৃষ্টির যে আলো প্রকাশিত হল সেটা কোথায় দেখা দিয়েছিল
প্রথম ? নিম্নে না ঊর্ধ্বে ?
ছিল বীজ বপনকারীরা (particles) ছিল শক্তি (kinetic energy)।
স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিচে এবং ইচ্ছা ঊর্ধ্বে।
সেই প্রথম প্রকাশকে দেখতে পেয়েছিল কে ? কেইবা সেকথা জানিয়েছে ?
কোথায়ই বা এই সৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল ?
দেবতাদের উৎপত্তি এই সৃষ্টিরও পরে। কে তবে বললেন
কোথা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ?
যাঁর থেকে এই সৃষ্টি তিনি নিজে কি সৃষ্টি করেছিলেন বা করেন নি ?
দ্যুলোকের সেই সর্বোত্তম স্রষ্টা—
একমাত্র তিনিই জানেন (এর উত্তর) কিংবা তিনিও জানেন না ?

ভারতীয় ঋষিরা নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন—যেখানে বর্তমানে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ও কোয়াণ্টাম ফিজিক্সের

লোকেরা যেতে পারছেন। সৃষ্টির পূর্বে যে এক অদ্ভুত মহাশূন্যাবস্থা ছিল সে কথা তারা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। মহাশূন্যতা ও শূন্যতার মধ্যে তাঁরা পার্থক্যও করতে পেরেছিলেন। তাই বলেছিলেন—তখন পার্থিব জগৎ অর্থাৎ বস্তুসত্তাও ছিল না এবং আকাশ অর্থাৎ pulsating void বা স্পেস বলতে যা বোঝায় তারও কিছুই ছিল না। মহাশূন্যতাস্থিত সুপ্ত শক্তি জাগরিত বা বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ kinetic energy না দেখা দেওয়া পর্যন্ত দেশ (space) বা কাল কিছুই সৃষ্টি হয়নি। এক সময় যে দেশ ও কাল কিছুই ছিলনা তা বর্তমান ফিজিক্স স্বীকার করে। Blackhole-এর অভ্যন্তরে 'দেশ ও কাল' কিছুই নেই—থাকলেও তার অস্তিত্ব পরিমাপ্য নয়। বৌদ্ধদের নির্বাণের মত এমন এক অবস্থা ছিল—যেখানে 'হাঁ' বা 'না' বা 'হাঁ'+'না' একত্রে, এসব কিছুই ছিল না। শুধু যে আপেক্ষিকতা ছিল না তা নয় তার ঊর্ধ্বেও কিছু ছিল না—যাকে ভারতীয় শাস্ত্রে বলেছে অনির্বচনীয় অবস্থা। 'তখন যা ছিল সবই ছিল মায়াছন্ন' একথা বলার অর্থ মহাশূন্যে শূন্যস্থ হয়ে শক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। শক্তিই হল মায়া। নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে সৃষ্টির উদ্ভব উত্তাপে। এই উত্তাপ-শক্তি কোথাও ঘনীভূত হলে তবে ঘননের চাপে সৃষ্টি হয়। শক্তি কখনও জাগ্রত কখনও ঘুমন্ত হয় কি ভাবে? শক্তি হল মহাশূন্যতার শ্বাস ও প্রশ্বাস স্বরূপ। যখন শ্বাসস্বরূপ তখন তা ঘুমন্ত। আমরা শ্বাস নিলে কলজের মধ্যে যেমন বায়ু সমাবেশিত হয় মহাশূন্যতা শ্বাস নিলেও তেমনই হয়। সেই ঘনীভূত শক্তিই ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি করে। শ্বাসের সাংকোচনচরিত্র প্রচণ্ড হলে এত চাপের মধ্যে পড়ে যায় যে, তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ অস্থিরতা। একেই বলা হয়েছে chaos. শক্তি যখন আর চাপ সহ্য করতে পারেনা তখনই বিস্ফোরণ হয়। মহাশূন্যের সেটাই হল প্রশ্বাস। শক্তি ঘনীভূত হলে ইচ্ছারূপ তাপ দেখা দেয়। এই ইচ্ছাই বিস্ফোরিত হয়ে আদ্যাশক্তি সৃষ্টি করে। আদ্যাশক্তিই হল সৃষ্টির বীজাবস্থা। আদ্যাশক্তি থেকে দেশ ও কাল সৃষ্টি হলে—মাঝে মাঝেই মহাশূন্যের প্রবল আকর্ষণে তা বেঁকে যায়—অর্থাৎ ক্ষেত্র বা field তৈরি হয়। এই ফিল্ড থেকেই অণুপরমাণু সৃষ্টি হয়। এই অণুপরমাণুই হল সৃষ্টির বীজ যা মহাশূন্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই মধ্যে কেন্দ্রবহির্ভূত অবস্থায় দেখা দেয়। মহাশূন্যতা থেকে আদ্যাশক্তি বিস্ফোরিত হয়ে বাইরে এলে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় বিন্দুরূপে, যাকেই নাসদীয় সূক্তকার বলেছেন 'আলো' আধুনিক ফিজিক্স বলে whitehole. স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিচে ছিল মানে গোলাকার সৃষ্টির অভ্যন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার অণ্ড বা বলের মত। এর প্রান্তভাগ থেকে আদ্যাশক্তির অঞ্চলে (যেখানে particles-ও তৈরি হয়নি) তাকে নিচেই মনে হবে। ইচ্ছা ঊর্ধ্বে মানে ইচ্ছার পরিণতি বা প্রান্তভাগ। এই সৃষ্টি প্রান্তভাগে আসার পূর্বে জীবের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং সৃষ্টির আদিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার মত কেউ ছিল না। একমাত্র মহাশূন্যতারূপী যে

মহামানস থেকে এই সৃষ্টি সেই মহামানসই জানেন এই সৃষ্টিক্রিয়া। যে যোগী বুদ্ধিরূপী আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে এই মহাশূন্যতার স্বরূপে ফিরে যেতে পারেন তিনি নিজের মহামানসসত্তা দিয়ে এই supervoid-এর চরিত্র বুঝতে পারেন। যোগীরা ধ্যানকালে প্রথমেই দেখতে পান যে, মহা অন্ধকার থেকে বৃত্তাকারে আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে। এর অভ্যন্তরস্থ অন্ধকারের এমন আকর্ষণ যে, তাঁর সূক্ষ্ম চৈতন্যকে মুহূর্তে তা টেনে নিয়ে ভিন্ন এক বিশ্ব-জগতের আকাশে ফেলে দেয়। সেইজন্যই নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে যে, 'সত্যদ্রষ্টা কবিরা (ঋষিরা) অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন সেই 'অপ্রকাশ থেকে প্রকাশ।' এই মহান সত্য একমাত্র হৃদয়ে ছাড়া অনুভব করা যাবে না। সেই জন্য যাঁরা এই সত্য দর্শন করেছেন বা অনুভব করেছেন তাঁদের বলা হয় মরমিয়া। কোয়ান্টাম ফিজিক্স এমন এক অবস্থায় এসেই বিজ্ঞানের মধ্যে মরমিয়া ভাব প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং প্রাচীন অনেক অনুভবজাত বক্তব্যকে বা রূপক আকারে রাখা বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

তবে সত্য নানাচোখে নানাভাবে প্রতিভাত হয়। এইজন্যই তো সত্য infinite এবং infinite suggestion-এ পূর্ণ। ফলে নাসদীয় সূক্তের দর্শন অথর্ববেদে এসে ভিন্নরূপ নিয়েছে। নাসদীয় সূক্তের কেন্দ্র অথর্ববেদে প্রজাপতি নামে পরিচিত, অর্থাৎ জগৎরূপ প্রজার যিনি পতি বা স্বামী। নিজ থেকে নিজকে পতৃ অর্থাৎ বিভক্ত করে তিনি নিজেরই অংশবিশেষের পতি বা অধীশ্বর হয়েছেন। এই বিভক্ত অংশই প্রকৃতি—স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং তাঁর পত্নী। এইজন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে অথর্ববেদ বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে—রোহিত-রক্তবর্ণ—অর্থাৎ শাসকের প্রতীক, অনড়বাণ অর্থাৎ বৃষ (সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার মহান দেবতা বৃষ থেকে এই কল্পনা এসেছিল), বশা বা গাভী যা থেকে দুগ্ধ অর্থাৎ জগতের উপাদান বেরয়, কাল-গতির প্রারম্ভ এবং কাম বা ঘনীভূত ইচ্ছা বা ফিল্ড—নিউট্রন ফিল্ড যা থেকে আপনা-আপনিই proton ও electron বেরয় অর্থাৎ সৃষ্টির উপাদান।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে নানা পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে এই বিশ্বসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'প্রারম্ভে প্রজাপতি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি বহু হবেন। এই জন্য তিনি নানা কৃচ্ছ্রসাধনা করলেন—অর্থাৎ শক্তি অর্জন করলেন অর্থাৎ শ্বাসরূপে মহাশূন্যতাস্থিত শক্তিকে হৃদপিণ্ডে টেনে এনে ফিল্ড তৈরি করলেন। ফলে এই জগৎ (জড়, অজড়, জৈব, অজৈব অস্তিত্বসহ) সৃষ্টি হল। প্রজাপতি ছাড়া আরও অনেকের নাম করা হয়েছে—স্বয়ম্ভূ নারায়ণ অর্থাৎ কারণসলিলে স্বসৃষ্ট আদি পুরুষ, নর=পুরুষ (primal being)। ভিন্ন অর্থে নারা অর্থাৎ সলিল অর্থাৎ কারণসলিল যাঁর অয়ণ অর্থাৎ বাসস্থান তিনিই নারায়ণ। তিনি আপনাআপনিই সৃষ্ট মহাশূন্যতা। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মন অর্থাৎ স্বতসৃষ্ট নিউট্রন ফিল্ড বা মহাশূন্যতা।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মূলতঃ যজ্ঞ, পুজাপার্বন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাঝে সৃষ্টিতত্ত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেছে। তা থেকে সৃষ্টি সম্পর্কে সেকালে কি প্রকার ধারণা ছিল তা অনুমান করা যায়। সৃষ্টির আদিতে কারণ সলিল ছিল এ ধারণাটা বেশ স্পষ্ট অর্থাৎ মহাশূন্যতা ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫ম, ৬, ৪. ২ এবং ৭ম, ১ ৫. ১) তাই বলা হয়েছে—আদিতে শুধুমাত্র ছিল কারণ-সলিল ! এর উপর দিয়ে শ্বাসরূপ প্রজাপতি ভাসছিলেন। কিংবা তিনি পদ্মপত্রের (নিউট্রন ফিল্ডে) উপর ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ (৯ম, ১. ৬ ১)·এএই প্রজাপতি বিশ্বডিম্বরূপে দেখা দেন। গল্পটি এই ধরনের : 'আদিতে কারণ সলিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শুধুই কারণসলিল। সেই মহাসমুদ্রে ইচ্ছা জন্মাল—কি করে আত্মা থেকে প্রজাতি জন্মাতে পারে। ফলে তপস্যা (শ্বাস) আরম্ভ হল। এর ফলে একটি স্বর্ণডিম্ব ফুটে উঠল। এ ডিম্ব বছর খানেক (নিউট্রন ফিল্ডের বছর, অর্থাৎ ব্রহ্মার বছর অর্থাৎ অনেক দিন) মহাশূন্যে ভেসে বেড়াল। তা থেকে বৎসরান্তে পুরুষের জন্ম হল—এই পুরুষই হলেন প্রজাপতি। এখানে পুরুষ ক্রিয়াশীল শক্তিরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এই শক্তির চাপে ডিম্ব ভেঙে গেল অর্থাৎ black-hole-এ বিস্ফোরণ হল। একবছর পর তিনি কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অর্থাৎ ব্রহ্মার সময় হিসেবে এই বিস্ফোরণ শব্দরূপে ফুটে উঠল। তাই এই শব্দ দ্বারা ভূর (পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টির আদিউপাদান) ভুবঃ (ব্যোম) স্বর (বায়ুমণ্ডলীয় আকাশ) তৈরি হল। অর্থাৎ কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে জগৎ বৃদ্ধি পেতে থাকল। সহস্র বছর (ব্রহ্মার বছর হিসেবে যা আজও পূর্ণ হয়নি) পরমায়ু নিয়ে তিনি জন্মালেন। জীবনের প্রান্তভাগ বা লক্ষ্য কি তা তিনি অনুভব করতে পারলেন অর্থাৎ জগতের স্থূল প্রান্তভাগ সৃষ্টি হল। এখানে প্রজাতি সৃষ্টি করার জন্য তিনি তপস্যা অর্থাৎ চেষ্টা করতে লাগলেন (অণু পরমাণুর মিশ্রণ বিমিশ্রণ হতে লাগল)। নিজের মধ্যে প্রজাতির রূপরেখা অঙ্কন করে মুখ দিয়ে দেবতাদের সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ মুখের শব্দ দ্বারা অর্থাৎ bigbang-এর তরঙ্গ বা vibration দ্বারা সূক্ষ্মসত্তা সৃষ্টি করলেন। তার পর হল জীবজগৎ—যে জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে জীবকে তটস্থা বলা হয়েছে। অনুরূপ গল্পই ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩য়, ১৯) বলা হয়েছে—'আদিতে কিছুই ছিল না। তারপর অস্তিত্ব হল। অস্তিত্ব বৃদ্ধি পেল। একটা ডিম্ব তৈরি হল অর্থাৎ ফিল্ড। এক বছর তা ডিমের আকারে থাকল। তারপর ডিম ভেঙে গেল (bigbang হল)। তার এক ভাগ রৌপ্য, একভাগ স্বর্ণ অর্থাৎ প্রথমে আবরণ ও পরে তার ভিতর বীজ। আবরণ অর্থাৎ প্লাজমা-স্থূলজগৎ সৃষ্টি করল। বীজ আকাশরূপে থেকে গেল। সেই প্লাজমা অর্থাৎ ছায়াপথ বা নীহারিকাপুঞ্জ থেকে সূর্যের আবির্ভাব হল। এই বর্ণনার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিশ্বসৃষ্টির ধারণার প্রচুর মিল রয়েছে।

ব্রাহ্মণ যজ্ঞসম্পর্কিত প্রয়োজনে লিখিত হলেও উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বে সৃষ্টির উত্তরণশীলতার কথা বলা হয়েছে! এইজন্য প্রজাপতির পরিবর্তে

উপনিষদে ব্রহ্মন, আত্মন, পরব্রহ্মন প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি হল সৃষ্টির আত্মিক উপাদান (psychical agencies)। এখানে নানা সংমিশ্রণ বিমিশ্রণের পরে শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে যে, সেই আদি মানসসত্তা সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসনে যখন সত্যই দেখা যায়, অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে বস্তুত কিছুই নেই। এই 'কিছুই নেই'-ই হল সর্বব্যাপ্ত পরব্রহ্মন। তবে নানা উপনিষদে নানাভাবে এই একই কথা বলা হয়েছে। ফলে কিছুটা ধাঁধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, সকল বর্ণনার মূলে সত্য সেই একই।

বৃহদারণ্যকে আত্মনকে নরাকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না বলে নিরানন্দ সেই 'এক' লীলার জন্য নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন যেমন করে এককোষী সত্তা আপনা-আপনিই দ্বিধাবিভক্ত হয়। অবশ্য এর মধ্যে ত্রিভঙ্গরূপে তিনটি গুণ গুণক্ষোভ হিসাবে কাজ করেছিল যাকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে আরো স্পষ্ট করে রাধাকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গে সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের ক্ষোভ হিসাবে দেখানো হয়েছে। চৈনিক 'তাও' প্রতীকের অভ্যন্তরে এই গুণত্রয় 'S'—এইভাবে ইয়াং ও ইনের মধ্যে বিভক্তিকরণের শর্ত হিসাবে বিরাজ করছে। পদার্থবিদ্যাতে এইজন্য দেখা যায় তিন ছাড়া সৃষ্টি হয়না। তিনের বেশি হলে হিলিয়াম গ্যাস রূপেই সৃষ্টি থেকে যায়। কম হলে অর্থাৎ দুই হলে ম্যাটার-অ্যান্টিম্যাটারের সংস্পর্শে সব ধ্বংস হয়ে যায়।

পরম পুরুষ নিজেকে ভাগ করে অর্থাৎ 'পত্' করে এক ভাগে নিজে থাকলেন পতি হিসাবে মহাশূন্যতা হিসাবে অপর ভাগে জগৎকে সৃষ্টি করলেন পত্নী হিসাবে, যে পত্নী বা গো, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি ছন্দে ছন্দে নৃত্যায়িতা হয়ে পুরুষকে আনন্দ দান করেন বলে তার নাম গোপী—গো ইতি আপ্যায়তি পী= গোপী। এই প্রকৃতি আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও ভিন্নরূপে প্রতিভাত হল। বিচ্ছিন্ন যে হতে পারেনি তার প্রমাণ সৃষ্টির সূক্ষ্ম উপাদান অণুপরমাণুকে ভেঙে দিলে তার অন্তর থেকে বস্তুসত্তাহীন নির্ভেজাল শক্তি বেরিয়ে পড়ে। আরো বিশ্লেষণ করা হলে মহাশূন্যতা দেখা দেয় —যে মহাশূন্যতাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে আজও ধরা যায় নি। কিন্তু যোগীরা দেহস্থ কুল (শক্তি)-কে সূক্ষ্মতর করতে করতে মস্তিষ্কের মহাশূন্যতারূপী কূটে (গৃহে) নিয়ে গিয়ে শক্তিকে অশক্তি বা মহাশূন্যতারূপী অতিশক্তিতে পরিণত করতে পারেন। এই দ্বিধাবিভক্ত পুরুষই পুরুষ + প্রকৃতি। তন্ত্রমতে শিব + শক্তি। বৌদ্ধমতে যুগনদ্ধ। তন্ত্রমতে মৈথুন-রত নর + নারী। উৎসের এই স্বত দ্বৈতভাবের জন্য—সৃষ্টির সর্বত্রও দ্বৈতের সংগম রয়েছে। তন্ত্রে একেই বলা হয়েছে মৈথুন—"মৈথুনং পরমতত্ত্বং সৃষ্টি-স্থিত্যান্তকরণম।" যে সাধক প্রাকৃতজগতে নারীবিহীন থাকেন তিনিও মূলত নারীহীন নন। তার শ্বাসপ্রশ্বাসে পুরুষ-প্রকৃতির লীলা চলেছে। তাঁর কুল-কুণ্ডলিনী সহস্রারের কূটস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলে মহাশূন্যতার সঙ্গে যে মিলন

হচ্ছে তাই তাকে মৈথুনানন্দ দান করছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২য়, ১)-এ বলা হয়েছে—'ব্রহ্মন থেকে দেশের উদয় (কথাটা পরব্রহ্মন হওয়া উচিত)। কারণ দেশই false vacuum বা pulsating void-ই দেশ)। দেশ থেকে বায়ুর। বায়ু থেকে অগ্নির। অগ্নি থেকে 'অপ্'-এর এবং 'অপ্' থেকে মৃত্তিকার। যাকে উল্টো দিক থেকে বলা হয়েছে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এরপর ক্ষিতি থেকে প্রাণের উৎসরণ। তবে আরো প্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে এই পাঁচটি তত্ত্ব বা উপাদানের পরিবর্তে মাত্র তিনটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলছেন—'হে পুত্র প্রারম্ভে শুধুমাত্র 'এক' ছিল। কোন দ্বিতীয় ছিল না। সেই এক ছিল নঞর্থক (supervoid)। সেই 'না' থেকে 'হাঁ' অর্থাৎ নঞর্থক অবস্থা থেকে ধনাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যা আছে তা 'না-আছে' এমন অবস্থা থেকে সৃষ্টি হতে পারে কি করে? সুতরাং প্রারম্ভে 'এক'-ই ছিল ধনাত্মক অবস্থায়। তবে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সেই 'এক'-এর মনে হল—'আমি বহু হব।' ফলে তিনি নিজের ভিতর থেকে সলিল নিক্ষেপ করলেন (কারণসলিল super void থেকে pulsating void-এর সৃষ্টি করলেন)। কোথাও কেউ থাকলে তার মধ্যে উত্তাপ থাকবেই। তাপ থাকলেই ঘর্ম হবে। ফলে সলিলের জন্ম তাপ থেকে (এই সলিল false vacuum বা pulsatingvoid)। এই সলিল (false vacuum) ভাবল আমি বহু হব (inner urge for expansion for pulsating void)। ফলে মৃত্তিকা (খাদ্য) জন্মাল। বৃষ্টিপাত হলেই অর্থাৎ জল হলেই খাদ্যশস্য জন্মায়। সেই 'এক'—যিনি অগ্নি, জল ও খাদ্য হলেন, ভাবলেন, 'এবার তাদের মধ্যে জীবাত্মা হয়ে প্রবেশ করব। তারপর নাম ও রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করব। এই—বলে তিনি তাদের ভেতর প্রবেশ করলেন এবং নাম ও রূপে প্রকাশ পেলেন।'

সম্ভবতঃ এখানেই সাংখ্যতত্ত্বের প্রথম বীজ উপ্ত হয়। এই তত্ত্বই শ্বেতাশ্বতর। এবং আরও কিছু উপনিষদ-এর মধ্য দিয়ে মহকাব্য ও পুরাণের যুগ পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনশৈলী সম্পর্কে বৈদিক ঋষিরা যে চিন্তা করেছিলেন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগ পর্যন্ত তারই প্রাধান্য ছিল। মূলতঃ এখানে তিনটি উপাদানের কথাই বলা হয়েছে—মৃত্তিকা, বায়ু এবং আকাশ। তিনটি শব্দে একে প্রকাশ করা হয়েছে—'ভূর্, ভুবঃ এবং স্বর্। ঐতরেয় আরণ্যক (২য়, ৪, ১)-এ অবশ্য বলা হয়েছে যে, প্রারম্ভে আত্মন অম্ভস (জল) মরীচি (আলো) এবং মর (অনিত্য মর্ত্য) সৃষ্টি করেন। এই অম্ভস আকাশেরও উপরে অর্থাৎ আবহাওয়া মণ্ডলীয় আকাশের উপরে। সুতরাং এই জলকে pulsating void বলা যেতে পারে। আকাশকে বলা হয়েছে আলো—অর্থাৎ দৃশ্যমান আকাশ অর্থাৎ আবহাওয়া মণ্ডলীয় আকাশ। এর পরই অনিত্য স্থূল মর্ত্য। এই

স্থূল মর্ত্যের নিচে ধরা হয়েছে 'অপ্'-কে অর্থাৎ জলকে। এই জল যার উপর পৃথিবী ভাসমান তা দেশ (space) ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩য়, ৬) ন'টি অথবা দশটি জগতের কল্পনা করা হয়েছে। এগুলি হল বায়ু (তেজ), হাওয়া, গন্ধর্ব, সূর্য, চন্দ্র, তারা, দেবদেবী, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও ব্রহ্মন। এগুলির যথার্থ অর্থ যে কি বলা কষ্টকর। সম্ভবত এর দ্বারা ক্ষুদ্রতম অবস্থা false vacuum থেকে দশটি মাত্রায় ত্রিমাত্রিক থেকে দশটি মাত্রায় ত্রিমাত্রিক জগতের কথা বলা হয়েছে যে দশ মাত্রার কথা বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানও বলেছে। কিন্তু এই দশ মাত্রার কথা চিন্তা করা হলেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বিশ্বজগৎসৃষ্টিতে সপ্তস্তর। এই সপ্তস্তরের মূল হয়ত ছিল ত্রিতলের মধ্যেই। পরবর্তী কালে অবশ্য দেহতত্ত্বযোগে সপ্ততল বিরাট মূল্য পেয়েছে। সপ্তমতল হল দিব্য তল যেখান থেকে সৃষ্টি ধীরে ধীরে আজ্ঞা চক্রের দুয়ার ভেদ করে—ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকারূপে ক্রম্ অনুসারে অবতরিত হয়েছে। যোগ-তন্ত্রের ষট্চক্রে এর বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০ম, ২৭)-এ এই ধরনের ব্যাহৃতি পাওয়া যায়—ভূর্, ভুবঃ, স্বর্, মহর্, জনস, তপস, ও সত্যম। এ হল নিম্ন থেকে উর্ধ্বগতি। ফলে পরবর্তী কয়েকটি উপনিষদে সাতটি জগতের নাম পাওয়া যায়। ঐতরেয় উপনিষদের সপ্তজগৎ বা তল হল—রসাতলীয় সপ্ততল থেকে পৃথক—অতল পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল ও তলাতল।

উপনিষদ পর্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির কারণ কিছুটা উপাখ্যান জাতীয় হলেও মহাকাব্য ও পুরাণে ব্যাপারটাকে নির্ভেজাল বিষয় হিসেবেই আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। পুরাণে বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখার চেষ্টা হয়েছে। একটা আবর্তনিক ভঙ্গীতে বার বার বিশ্বসৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই একে দেখার চেষ্টা চলেছে। সৃষ্টির উৎস সন্ধানে এখানেও বেশ বৈচিত্র্য থাকলেও একটা শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা হয়েছে। বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে —সৃষ্টির উৎস হিসেবে ব্রহ্মন ও আত্মনের স্থান নিচ্ছেন ভগবান নারায়ণ, বিষ্ণু, শম্ভু প্রমুখ পুরুষশ্রেষ্ঠ দেববৃন্দ। বৈচিত্র্য এসেছে লেখকের নিজস্ব আনুগত্য অনুসারে। কেউ পছন্দ করছেন এঁকে নারায়ণ বলে উল্লেখ করতে, কেউবা বিষ্ণু হিসেবে কিম্বা শম্ভু হিসেবে। সেই কারণসলিল বা আদিম অন্ধকার থেকেই যাচ্ছে। সেই সমুদ্র থেকে উৎসারিত হচ্ছেন পুরুষ বা হিরণ্য গর্ভ। সেই বিশ্বডিম্ব বা cosmic eggও থাকছে যার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছেন—ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা পিতামহ। সেই পদ্মও রয়ে গেছে। এই পদ্মের উদ্ভব হচ্ছে হয় কারণসলিল থেকে নয়তো ভগবান বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে। প্রলয় ও নতুন বিশ্বআবির্ভাবের কথাও রয়েছে। বিশ্বসৃষ্টিকে একটা ধারাবাহিক অবস্থা দেবার চেষ্টা চলেছে। আসছে কল্প, মন্বন্তর ও যুগের কল্পনা।

আদি পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টির উল্লেখ করে সৃষ্টিতত্ত্বে একটা পারম্পর্য আনার চেষ্টা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, সুশৃঙ্খলভাবে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা আলোচনা করতে গিয়ে বরং বেশি করে একটা বিশৃঙ্খলার চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি এমন জটীল ভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যে, এই জটীল গ্রন্থি খুলে কোন্‌টা আগে আর কোনটা পরে সেটা ধরাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিতত্ত্বের রূপকারেরা মহাভারত ও পুরাণে সাংখ্যতত্ত্বই এনেছেন, তবে যথেচ্ছ ভাবে। কপিলের সৃষ্টিতত্ত্বকে কেউ কেউ আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টির কাহিনীকে একটা তাত্ত্বিক রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে বেশ বোঝা যায়।

সাংখ্য সৃষ্টির মূলে দুটো উপাদানের কথা বলেছে যে দুটি উপাদানই স্বতন্ত্র। এক হল আত্মারূপী পুরুষ এবং আর এক হল প্রকৃতি। এই আদি প্রকৃতিকে কখনও প্রধান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকৃতি আবার তিনটি গুণ দিয়ে তৈরি— সত্ত্ব রজ ও তম—যারা পরস্পর সাম্যাবস্থা রক্ষা করে ছিল। যখন পুরুষের উপস্থিতিতে প্রকৃতিতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তখন তার মধ্যে প্রকাশ পায় মহৎ বা বুদ্ধি। এই মহৎ বা বুদ্ধি সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরি। বুদ্ধি থেকে জন্ম নিচ্ছে অহংকার অর্থাৎ 'আমি' সম্পর্কিত স্বতন্ত্র ভ্রান্ত ধারণা। এই অহংকার থেকে হচ্ছে মনের উদয়। আসছে পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম উপাদান যাকে বলে তন্মাত্রা)। শেষেরটি একে অপরের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করছে জগতের স্থূল উপাদান— মহাভূত। এই মহাভূত হল—ব্যোম, অগ্নি, বায়ু, জল ও পৃথ্বী অর্থাৎ মৃত্তিকা। সব মিলে সৃষ্টিতে দেখা দিচ্ছে ২৫টি তত্ত্ব। এখন যাকে বলা হয় মাত্রা। উপনিষদের ভাবনাকে এখানে একটা সুশৃঙ্খল সুরের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা হয়েছে। মহাভারতে এর প্রভাব স্পষ্ট। বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যতত্ত্বের একটা মিলন ঘটাবার প্রয়াস এখানে পরিষ্কার। তবে সাংখ্য থেকে যে কিছুটা সরে আসার চেষ্টা না হয়েছে তাও নয়। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এই সরে আসার চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট—যেমন (১) এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ সৃষ্টির মৌল সত্তা সম্পর্কিত প্রাচীন চিন্তা সাংখ্যে এসে স্পষ্টভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির রূপ নিয়েছিল। এ দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। তবে কি ভাবে এই সমন্বয় ঘটানো যাবে তা নিয়ে বেশ মত পার্থক্যও ঘটেছে। কেউ পুরুষকে এক করে দেখার চেষ্টা করেছেন প্রধানের সঙ্গে, হিরণ্যগর্ভকে বুদ্ধির সঙ্গে, এবং ব্রহ্মাকে অহংকারের সঙ্গে।

(২) দ্বিতীয়ত—সাংখ্যে বলা হয়েছে যে, তন্মাত্রগুলির পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে অহংকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির ভৌতিক উপাদান গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এটাকে মানা হয়নি। তন্মাত্রাগুলিকে বাদ দিলে সরাসরি অহংকার থেকে মহাভূতের সৃষ্টি হয়েছে এই ধরনের কথা বলা হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে উপনিষদের চিন্তার সঙ্গে এদের চিন্তার অনেক

মিল আছে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির উপাদান সরাসরি ব্রহ্মন থেকে এসেছে। বর্তমান বিজ্ঞান অবশ্য উপনিষদকেই সমর্থন জানাবে কারণ সেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, বঙ্কিম pulsating void অর্থাৎ দেশ (space) ও কাল থেকেই অণু পরমাণুরূপ সৃষ্টির উপাদান তৈরি হয়েছে। তবে যা কিছু সত্য মহাকাব্যিক সৃষ্টিবর্ণনার মধ্যে থাক না কেন লোকে যে তাকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল তেমন মনে হয় না। মনুসংহিতাতে কিন্তু সৃষ্টির বর্ণনা একটু ভিন্ন ভাবেই দেওয়া হয়েছে।

মনু সংহিতাতে বলা হয়েছে আদিতে বিশ্বজগৎ অন্ধকারের রূপ ধরে ছিল। সে এমন অন্ধকার যার মধ্যে ভেদাভেদ করা সম্ভব নয়। বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে সে অন্ধকার অভেদ্য। বিশ্বজগৎ নিবিড় নিদ্রার মত অবস্থায় ছিল। পরে স্বয়ম্ভু আপন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে অবিশ্লেষীকে বিশ্লেষী উপাদানে প্রকাশ করেন। সেই অবর্ণনীয় স্বয়ম্ভু আপন ইচ্ছায় অব্যক্তকে ব্যক্ত করেন। তিনি ইচ্ছাশক্তিতে নিজের ভেতর থেকে সলিল অর্থাৎ দেশ তৈরি করেন—ঠিক যে ভাবে blackhole-এর অভ্যন্তর থেকে দেশ ও কালের উদয় হয়। সেই দেশ ও কালে স্বয়ম্ভু তাঁর বীজ অর্থাৎ সৃষ্টির বীজ প্রোথিত করেন। এই বীজ বা বীর্যই স্বর্ণডিম্বের আকৃতি নেয়। এর ঔজ্জ্বল্য হয় সূর্যের দীপ্তির মত। এই ডিমের মধ্যে তিনি নিজেই প্রবেশ করেন এবং বিশ্বজগৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মন রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সৃষ্টিতে গতি সঞ্চার করেন। ইতিপূর্বে দেশ ও কাল সৃষ্টি করলেও স্বর্ণডিম্ব অর্থাৎ singularity তৈরি হবার জন্য বঙ্কিম দেশ ও কাল গতিহীন হয়েছিল। স্বর্ণডিম্বে বিস্ফোরণ হলে ব্রহ্মন (বৃ=to grow থেকে) স্ফীতমান হতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বর্দ্ধিত হতে থাকেন যার ফলে জগৎ অর্থাৎ যা গতিশীল সেই গোলকাকার ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে গোলকাকার বর্তমান বিজ্ঞানেও তা প্রমাণিত। এই যে ব্রহ্মন তা ভারতীয় চিন্তায় দেশরূপে সলিল নামে অভিহিত। এই সলিলকে বলে 'নারা'। এই 'নারাই' তার 'অয়ণ' বা বাসস্থান হয়। সেই জন্য তিনি নারায়ণ নামে পরিচিত হন। তাঁকে আদি মানব ('নর') হিসাবে চিন্তা করা হয় বলেও তিনি নারায়ণ। এই নিত্য পুরুষ থেকে সত্য ও মিথ্যা নিয়ে ব্রহ্মনের প্রকাশ ঘটে। যে স্বর্ণডিম্ব থেকে তাঁর প্রকাশ হয়েছিল—সেই প্রকাশ হয়েছিল তাঁর আত্মশক্তিবলে যে শক্তি তার গুণ মাত্র। তাঁর সেই আত্মসত্তা থেকে ধীরে ধীরে মনেরও প্রকাশ ঘটে। এই মনের মধ্যেও নির্ভেজাল মানসসত্তা রূপে সত্য এবং ভ্রান্তিমূলক আমিত্ব হেতু—স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ পায়। তখন সেই সত্তা তিনগুণ (সত্ব, রজ, তম) প্রভাবিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জন্ম দান করে। নিজ সত্তা থেকে অণুপরমাণু রূপ শক্তিশালী উপাদানগুলিকে যুক্ত করে তিনি সকল জীবের সৃষ্টি করেন। এই সূক্ষ্ম ছয়টি উপাদান জীবদেহে প্রবেশ করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই ছয়টি উপাদান হল ছটি মাত্রা যা দিয়ে সূক্ষ্ম দেহ গঠিত। সম্ভবত plasmic

body. এই সূক্ষ্মদেহ থেকে সাতটি পুরুষের অর্থাৎ দেহের সপ্ততলের সৃষ্টি হয়। এই সপ্ততল বা স্তর জড়, জীব, অনিত্য সকলের মধ্যেই রয়েছে। প্রয়োজন-বোধে এক এক ক্ষেত্রে এক এক ধরনের গুণ আরোপ করা হয়। এবং বেদের বক্তব্য অনুসারে তিনি এক একটির এক একটি নামকরণ করেন। তিনি দেবতাদেরও সৃষ্টি করেন যাদের প্রধান গুণ হল কর্ম অর্থাৎ গতি যা সূক্ষ্মসত্তার পরিচায়ক। এরাই হলেন সূক্ষ্ম সাধু যাঁদের গুণ হল আত্মত্যাগ ও নিত্যরূপান্তর যা particle-এর গুণ। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য থেকে তিনি তিন ধরনের জ্ঞান অর্থাৎ বেদ বের করে এনে—এই আত্মত্যাগের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ রচনা করেন। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে এই তিনটি বেদের মূল বক্তব্য হল সৃষ্টি রহস্য—রূপকের অন্তরালে সাধারণ ভাবে তা গল্পের কাহিনী রূপে বর্ণিত হলেও। এরপর তিনি স্থূলজগতের সময় বিভক্ত করেন অর্থাৎ সময় যে অবিচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর না হয়ে কোয়াণ্টাম পদ্ধতিতে চলে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সময় যদি নিরবচ্ছিন্ন হত তাহলে ত্রিকাল সম্ভব হত না, কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকলেও বর্তমান থাকত না। কারণ সময় কোন প্রকারে স্থির না হলে বর্তমান বলে কিছু থাকতে পারে না। না-হলে সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গতিটুকুকেই বর্তমান বলে ধরতে হয়—অতীত ও ভবিষ্যতে গতি সঞ্চার করা যায় না। সময়ের পর তিনি গ্রহ নক্ষত্র নদনদী সাগর মৃত্তিকা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। স্থূলজগৎ যে সময় দ্বারাই সৃষ্ট এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শোক দুঃখ আনন্দ আশা আকাঙ্ক্ষা, বাক্য ইত্যাদিও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। দোষ গুণ ইত্যাদিও তিনিই সৃষ্টি করেন। কিন্তু যেহেতু সূক্ষ্মতম উপাদানগুলি চিরন্তন নয় সেই জন্য জগৎও ধ্বংসশীল। জগতের উন্নতির জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। যদিও এখানে মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য ও পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে এরা মূলত গুণ—,রূপ নয়। ঈশ্বর নিজে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পুরুষ ও মহিলা হন। মহিলা অংশ থেকে বিরাজ সৃষ্টি করেন! এই বিরাজ থেকে স্বয়ম্ভু মনুর সৃষ্টি হয়। মনু তপস্যা দ্বারা দশটি গোত্রপুরুষ তৈরি করেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতস, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। এই দ্বিতীয় প্রজাপতিরা অন্যান্য মনু, দেবদৈত্য, মানব, পশু, উদ্ভিদ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এর পরই দ্বিতীয় সৃষ্টি ধ্বংস হয়। এবং দ্বিতীয়বার বিশ্ব সৃষ্টি হয়।

মনুর এই সৃষ্টিতত্ত্ব অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অবৈজ্ঞানিক মনে হবে না। সাধারণত মনুসংহিতায় মনুকে যে ভাবে ধরা হয় তিনি তেমন নন। বাচ্যার্থে মনুকে ধরা হয়েছে বলেই সমাজে এমন বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তশক্তিকে ক্ষয়ের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একদল ব্যক্তি বিশেষ করে রাজনীতিবিদ এর অপব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় সভ্যতার দ্রুত অবক্ষয় ঘটাচ্ছেন। সেই জন্য রাজনীতিকদের সম্পর্কে বার বারই

ডিস্‌রেলির উক্তিটিই মনে পড়ে 'Politics is the last refuge of the 'scoundrels'.

পুরাণেও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে মেনে নেওয়া হয়নি। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিকে ব্রহ্মনেরই দুটি অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আঠারটি পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের নানা ধরনের ব্যাখ্যা থাকলেও মূলতঃ বিষ্ণু-পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে—তাকে কেন্দ্র করেই অন্য কয়টি পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব ঘোরাফেরা করেছে। বিষ্ণু পুরাণে স্বয়ম্ভূ—ব্রহ্মনকে বাসুদেব বলা হয়েছে। মূলত—তিনি এক। তথাপি তিনি তিনটি রূপে প্রতিভাসিত—পুরুষ, প্রধান অর্থাৎ অবিকশিত অথচ উদ্ভূত এবং কাল বা সময়। কাল পুরুষ ও প্রধানকে যুক্ত করে রেখেছে। যখন 'সর্বোত্তম' পুরুষ ও প্রধানে প্রবেশ করেন তখনও প্রধানের মধ্যে সত্ত্ব রজ ও তম গুণ গুণসাম্যে থাকে। এতে সর্বোত্তমের প্রবেশ ঘটলে তা থেকে মহান (মহৎ) বা বুদ্ধি প্রকাশ পায়। বুদ্ধি থেকে অহংকার আত্মপ্রকাশ করে। অহংকার থেকে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ স্থূল উপাদান এবং এগারটি ইন্দ্রিয় আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের ধরন অনেকটা সাংখ্যতত্ত্বের বিকাশের মত। প্রত্যেকটি সৃষ্ট উপাদানের মধ্যে সেই এক আবদ্ধ হয়ে থাকেন। স্থূল উপাদান পরস্পর যুক্ত হয়ে ঘনবস্তু সৃষ্টি করে। এই ঘনবস্তুই ব্রহ্মাণ্ড হিসেবে দেখা দেয়। এই ব্রহ্মাণ্ড দেশে ভাসমান থাকে। একে ঘিরে থাকে সাতটি আবরণ—জল, বায়ু, অগ্নি, হাওয়ামণ্ডল, অহংকার, বুদ্ধি এবং প্রধান। এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে থাকেন ব্রহ্মা—যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ নিউট্রন ফিল্ড। সেই একই দেবতা শুভগুণ হিসাবে বিষ্ণু নামে পালন করেন এবং কল্পশেষে রুদ্ররূপে ধ্বংস করেন। স্থূল জগতে এই দেবতাত্রয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতীক। অতীতে সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে—এবং ভবিষ্যতে ধ্বংস হবে।

বিষ্ণু-পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে সময়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে ব্রহ্মার দিন রাত্রি ও প্রাণের বিস্তারের হিসাব, অর্থাৎ পরমায়ুর হিসাব। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কি ভাবে বিষ্ণু বরাহরূপে দেশে ধরিত্রীকে দন্তে ধারণ করে আছেন। বরাহ এখানে আকাশের ধারণক্ষমতার প্রতীক। বর অর্থ ব্যোম—space, অহ অর্থ দিন যা প্রকাশ করে। সুতরাং বর+অহ=বরাহ হল প্রকাশিত ধরণীর ধারণক্ষেত্র। তিনি তিনটি নিম্নস্তর অর্থাৎ ধরণী, আকাশ, স্বর্গ ও একটি ঊর্ধ্বস্তর হিসাবে মহর্লোকের স্রষ্টা। পঞ্চম অধ্যায়ে সাংখ্যের ধারা অনুসরণ করে নয়টি সৃষ্টিস্তরের ইতিহাস ব্যক্ত করা হয়েছে।

সৃষ্টির স্তর হিসাবে প্রথম এসেছিল মহৎ বা বুদ্ধি। একেই বলা হয় ব্রহ্মা (material manifestation of psychic mind field)। এর পরই আসে সৃষ্টির তন্মাত্রা। এর পরই সৃষ্টির মৌল অবস্থা দেখা দেয় যাকে বলে

ভূতস্বর্গ। এরপরই আসে ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম উপাদান ঐন্দ্রিয়িক। এই তিনটি মিলেই হয় প্রাকৃত সৃষ্টি। চতুর্থত দেখা দেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তু। এরপর পশু জগৎ। এর পর দেবোকূল। শেষে মানব। অষ্টম সৃষ্টি হল অনুগ্রহ যার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি হল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত এবং তিনটি আদি পর্যায়ভুক্ত। এর পর আসে নবম সৃষ্টি যার নাম কুমার সৃষ্টি। এর মধ্যেও আদি ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাদান রয়েছে। মহাপ্রজাপতি কর্তৃক এই হল নয়টি সৃষ্টিস্তর—আদি উৎস থেকে এই ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

বিষ্ণু-পুরাণের সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কি ভাবে বিশ্বসৃষ্টির পর নিজের মন থেকে আরও মানসপুত্র সৃষ্টি করেছিলেন তা বলা হয়েছে। এই যে মানসপুত্র প্রজাপতিগণ, এঁদের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা নিজের মন থেকে মনু স্বয়ম্ভুবকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি রক্ষার জন্য। মনুর কন্যা প্রসূতিকে বহু প্রজাপতির মধ্যে এক বিশেষ প্রজাপতির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল—যার নাম দক্ষ। তিনি দেবকুলের পূর্বপুরুষ হলেন। এরা অধিকাংশই রূপক কাহিনীর আবরণে ভাল ও মন্দ গুণ মিশ্রিত।

বিষ্ণু-পুরাণের এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন বৈদিক পুরাণ-কাহিনী, পরবর্তী বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত বর্ণনা, সাংখ্যের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব সব মিলিয়ে একটি সমন্বয়ী সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা হয়েছে বিষ্ণু পুরাণে। তবে এই সৃষ্টিতত্ত্বের উপাদান সবই প্রতিভাসিক। এর কারণ হয় তো এই যে, ঐতিহ্য ভেঙে তাঁরা নতুন চিন্তা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পারেননি।

নতুন চিন্তার প্রকাশ দেখাতে পারেননি বটে তবে পুরাণকারেরা বিশ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনাকে একটা ছকের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মহাকাব্যে বিশ্বসৃষ্টির কল্পনায় নতুন চিন্তাভাবনার তেমন সংযোজনা হয় নি। তবে পৃথিবী সম্পর্কে এবং নরক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃততর বর্ণনা পাওয়া যায়। পাশাপাশি ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, বায়ুলোক, অগ্নিলোক, আদিত্যলোক, যমলোক প্রভৃতির চিন্তাও থেকে যায়। তবে এই সব লোকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইন্দ্রলোক ও যমলোক ব্যতীত অন্যান্য লোকের বর্ণনা তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরাণকারেরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে তেমন ভাবে রক্ষা করে চলেন নি।

বিশ্বাডিম্ব-এর মধ্যে সুপ্ত জগৎকে ঐতিহ্যবাহী ত্রিভুবন বা ত্রিলোকের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। এই চিন্তা থেকে গেছে যে, পৃথিবীর উপরে হল স্বর্গলোক ও নিচে পাতাল। তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মূলত দু' ভাগে বিভক্ত। উপরে রয়েছে সাতটি স্তর যার নিম্নতম স্তর হল ধরণী। নিচে রয়েছে সপ্তনরক। সুতরাং

লোক হিসাবে প্রায়শই চোদ্দটি লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই ভাগের মধ্যে নরকের কল্পনা করা হয়েছে যার স্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বাপেক্ষা নিম্ন স্তরে। যদিও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এবং সত্যের দিক থেকেও এ ধরনের চিন্তার যথার্থ কোন ভিত্তি নেই। মূলত নরকের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। নরক বাদ দিয়ে যে রসাতল কল্পনা করা হয়েছে—তার মধ্যে রয়েছে অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল এবং পাতাল। ঊর্ধ্ব সাতটি স্তর হল – ভূর (পৃথিবী) দৌস, স্বর্, মহর, জনস, তপস এবং সত্যলোক। এই সব লোকের একটি কাল্পনিক আয়তনও দেবার চেষ্টা হয়েছে। পাতালে নাগ, দৈত্য ও দানবদের বাস এরকম বিশ্বাস ছিল। তবে সৌন্দর্য ও জাঁকজমকে পাতাল যে স্বর্গ থেকে পিছিয়ে ছিল তা নয়। ধারণা ছিল, পাতালের নিচে রয়েছে—শেষরূপী সর্প—সমগ্র বিশ্বকে সে মস্তকে মুকুটের মত ধারণ করে আছে। তারই উপর সপ্ত পাতাল নির্ভরশীল। পাতালের নিচে হল নরক। তবে নরকের যথার্থ অবস্থান যে কোথায় স্পষ্ট করে বলা হয় নি। বস্তুত দেশই (space) হল নরক যেখানে জীবের plasmic সূক্ষ্মদেহ আপন ওজন অনুযায়ী (কামনা বাসনার ওজন) ভাসমান থাকে। কিন্তু পুরাণকারেদের মধ্যে কেউ একে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন নিচে, কেউ উপরে। তবে এই উপর বা নিচ উভয়ই দেশ (space) মাত্র। সে কথা ও'রা বুঝেছিলেন। তাই বলেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জল (space) বেষ্টিত। নরক সম্পর্কে এই বিভ্রান্তির কারণ পূর্বে তাদের রসাতলীয় জগৎ থেকে ভিন্ন করে দেখানো হয়নি।

জৈনরা সপ্ত পাতালের পরিবর্তে সপ্ত নরকের কল্পনা করেছেন। মাটির নিচে গহ্বরে অসুরেরা বাস করে এমন ধারণা ছিল। তবে এই অসুরলোক প্রথম নরকের উপরেই। জৈনদের ঊর্ধ্বজগৎ ভূলোক দিয়ে আরম্ভ। তার পরই রয়েছে ভুবর্লোক ও দৌস। এরপর ঊর্ধ্বলোক সূর্যের দিকে চলে গেছে। সূর্য থেকে ধ্রুব নক্ষত্র পর্যন্ত রয়েছে স্বর্লোক। এখানেই দেবতাদের বাস। কল্পশেষে এই তিন লোকই ধ্বংস হয়ে যায়।

স্বর্লোকের উপরে রয়েছে—মহর্লোক। এই লোকের ধ্বংস নেই। কিন্তু কল্পশেষে এখানকার অধিবাসীরা অন্য এক অঞ্চলে চলে যায়। সম্ভবতঃ ভিন্ন কোন সৌরমণ্ডলে অথবা বিশ্বে, যেটা যোগে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ভিন্ন অঞ্চলের নাম জনলোক। এখানকার অধিবাসিরা সনন্দন ও ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রের সঙ্গে বাস করেন। ষষ্ঠ অঞ্চল হল তপলোক। এখানে বৈরাজ দেবতারা বাস করেন। এর উপরই রয়েছে সর্বোচ্চলোক সত্যলোক,—যেখানে মৃত্যু বলে কিছু নেই। পুরাণের এই লোককল্পনা সম্ভবত যোগলব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচিত হয়েছিল—যেখানে ষটচক্রের এক এক চক্রে এক এক ধরনের সূক্ষ্ম জগৎ রয়েছে—ধ্যানীরা যা যোগে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সত্যলোককে ব্রহ্মলোকও বলা হয়েছে। সম্ভবত ব্রহ্মরন্ধ্রের কূটস্থানকেই ব্রহ্মলোক বলা হয়েছে—যেখানে যোগীদের আভ্যন্তরিক

অনন্ত অর্থাৎ inner space—বাইরের অনন্ত অর্থাৎ outer space-এর সঙ্গে মিলে যায়, জন্ম মৃত্যুর লীলা যেখানে শেষ হয়—অর্থাৎ অন্তরাত্মা পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ব্যাসের যোগাভ্যাসে (৩য়, ২৬) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুটা ভিন্নতর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হয় তো খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ধারণা এটা। এখানেও সৃষ্টির ইতিহাস একটু বিস্তৃত-ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পুরাণের ধ্যান ধারণা থেকে যে সম্পূর্ণ ভাবেই সরে এসেছে তা নয়। তবে বৌদ্ধদের ধ্যান ধারণার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। সমগ্র বিশ্বই ক্ষুদ্র একটি ডিমের মধ্যে আছে অতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণু দিয়ে এই ডিম তৈরি। এর মধ্যে একের উপর আর একটি এইভাবে সাতটি ভূমি আছে। সর্বশেষ ভূমি হল ভূর্লোক। সর্বনিম্ন নরক থেকে মেরুপর্বতের শীর্ষদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। দ্বিতীয় ভূমি হল অন্তরীক্ষলোক—ধ্রুবনক্ষত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। তৃতীয় ভূমি হল স্বর্লোক বা মহেন্দ্রলোক। চতুর্থ ভূমি হল—মহর বা প্রজাপাত্যলোক। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমি হল জন, তপ এবং সত্যলোক। এই শেষ তিনলোক একত্রে ব্রহ্মলোক গঠন করেছে।

ভূর্লোকের মধ্যে রয়েছে-নরক, পাতাল এবং পৃথিবী। ভূর্লোকের নিচে—সাতটি নরক। এই নরকগুলোও একের উপর আর একটি এই ভাবে সাজানো রয়েছে। নরকগুলির নাম অবীচি, ঘন, সলিল. অনল, অনিল, আকাশ এবং তমহ্প্রতিষ্ঠ। অবীচি বাদে এই নরকগুলির বর্ণনা পড়ে মনে হয় এগুলো হল ব্রহ্মাণ্ডের উপরের আবরণ মাত্র। এই কারণেই বোধহয় ব্যাসদেব এর ভিন্ন নামও দিয়েছিলেন,—যেমন মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, এবং অন্ধতামিস্র! এই নরকের উপরে রয়েছে সপ্তপাতাল, মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল। এই সপ্তভূমির উপরে হল পৃথিবী বা বসুমতী। এই বসুমতীর মধ্যে রয়েছে সাতটি মহাদেশ।

এই সব ভূমির অধিবাসী কারা? ধারাবাহিক ভাবে এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হল (১) পৃথিবীর পাতাল, সাগর ও পর্বতসমূহে বাস করে এক ধরনের দেবোকুল—দেবোনিকায়ঃ—অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিংপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, অপস্মারক, অপ্সরা, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড এবং বিনায়ক। সপ্ত মহাদেশে বাস করে মানুষ ও দেবতা, মেরু পর্বতের অন্তরে শুধুই দেব বৃন্দ।

(২) অন্তরীক্ষলোক হল দিব্যভূমির গোলক। (৩) মহেন্দ্রলোকে থাকে ছয় শ্রেণীর দেবতা—ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিত বশবর্তিন—এবং পরিনির্মিত বশবর্তিন। (৪) প্রাজাপত্যলোকে থাকে পাঁচ ধরনের দেবতা—কুমুদ, রিভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ এবং প্রচিতাভ। (৫) জনলোকের অধিবাসীরা চার ধরনের—ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্ম মহাকায়িক এবং অমর। (৬) তপলোকের অধিবাসিরা তিন ধরনেরঃ—আভাস্বর, মহাভাস্বর, এবং

সত্য মহাভাস্বর। (৭) সত্যলোকের অধিবাসী চার ধরনের—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভাস এবং সংজ্ঞাসজ্ঞিন।

প্রজাপাত্যভূমি থেকে ঊর্ধ্বদিকে যে সকল দেবতা বাস করেন তাঁরা সব সময় ধ্যানেই মগ্ন থাকেন—ধ্যানাহর। তাঁদের ক্ষমতা এবং জীবনের পরিধি নিম্ন ভূমির অধিবাসিদের অপেক্ষা অনেক বেশি। তপলোকের অধিবাসিদের আর নিম্নভূমিতে জন্ম হয় না। সত্যলোকের চার ধরনের দেবতা চারমাত্রার সুখ লাভ করে—সবিতর্ক, সবিচার, আনন্দমাত্র, এবং অস্মিতামাত্র ধ্যান।

যাঁরা যোগ করেন, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে অন্তরাকাশ দেখতে পান, তাঁরা জগতের এই স্তরগুলি আশ্চর্য ভাবে লক্ষ্য করতে পারেন। সত্যি সত্যি এই স্থূল জগতের ঊর্ধ্বে বস্তুতপক্ষে নিম্নে কারণ, প্রান্তভাগে স্থূলজগৎ এবং অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম জগৎ। এই সূক্ষ্মজগতে অদ্ভুত অদ্ভুত স্তর এবং সেইসব স্তরের অধিবাসিদের দেখতে পান। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে এসব অদ্যাবধি ধরা সম্ভব হয়নি। হয় তো একদিন হবে। তখন সারা পৃথিবী মানুষের আন্ত শক্তির মহিমা লক্ষ্য করে চমকে উঠবে,—বুঝবে মরমিয়ারা স্থূলবিজ্ঞানের অনেক আগে আগেই চলেন। তাঁরা সহজে যা বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা আজ তা ধারণার বৃত্তের মধ্যে আনতে পারলেও—অধিকাংশই এখনও অধরা রয়ে গেছে—সেই বাউল গানের মত—'তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে দেয়না ধরা।' তবে একথা ঠিক বিশ্বসৃষ্টির মূল কথাটি কেউই বলতে পারেননি। যোগীদের বর্ণনা সত্য কিনা বুঝতে হলে যোগ করতে হবে। নইলে সব হেঁয়ালীই থেকে যাবে।

জৈন লেখক উমাস্বাতি মনে করেন—একমাত্র যোগের দ্বারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও গঠনশৈলী জানা যাবে। পতঞ্জলির যোগসূত্র (৩য়, ২৬)-তেও অনুরূপ বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। তবে যোগাশ্রয়ী যাঁরা নন তাদের কাছে এটা একটা বিশ্বাস হয়েই থাকবে। যাঁরা যোগাশ্রয়ী, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস একচুলও ছেড়ে দিতে রাজি নন। তবে বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যা চালু হবার পর বিজ্ঞান ও যোগসূত্রের মধ্যে একটি মিলন ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে যেটা 'সূর্য সিদ্ধান্তে' স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

'সূর্য সিদ্ধান্ত' মনে করে ব্রহ্মাণ্ড মূলত ফাঁপা। এরই মধ্যে রয়েছে জগৎ, স্থূল বস্তুজগৎ, আকাশ ইত্যাদি। এই জগৎ হল গোলকাকার। দুটো কড়াইকে মুখোমুখি জুড়ে দিলে যেরকম দেখায় সেইরকম। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বৃত্তাকারে ব্যোম আবর্তিত হচ্ছে। এই বৃত্তকক্ষে নক্ষত্রপুঞ্জাদি আবর্তিত হচ্ছে। এই ঘূর্ণায়মান বিশ্ব স্তরে স্তরে সাজানো। কক্ষপথে গ্রহাদি ঘুরছে। নিচের দিকে মানে উৎসের দিকে স্তরে স্তরে রয়েছে সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণ সত্তা, বিদ্যাধর, জ্ঞানী সত্তা, এবং মেঘমণ্ডলী। এই মেঘমণ্ডলী সম্ভবত plasmic gas. বিশ্বের

সাতটি গহ্বরে—(সম্ভবত শক্তিহীন দেশে (space) রয়েছে নাগ—(ন আগ= নাগ) অর্থাৎ যার গতি নেই এমন কৃষ্ণগহ্বর ও অসুর—যারা-স্বর্গের অমৃত উদ্ভিদে সানন্দ চিত্তে পাতালে বাস ক'রে। পৃথিবী গ্রহের মধ্য দিয়ে রত্নভূষিত মেরু পর্বত তাকে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ভেদ করে গেছে। সূর্য সিদ্ধান্তের এই বক্তব্য কোথাও কোথাও বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক সত্যে পূর্ণ হলেও বহু ক্ষেত্রেই মরমিয়া কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সেটা ভেদ হলে হয়তো বস্তু বিজ্ঞানের অবদান অপেক্ষাও বড় অবদান আমাদের ভাগ্যে এসে জুটতে পারে।

ভারতবর্ষের বিচিত্র এই ব্রাহ্মণ্যচিন্তার পাশাপাশি জৈনরাও এই বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে এই বিশ্ব অনন্ত,—এর আরম্ভও নেই শেষও নেই। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তাঁদের কোন বক্তব্য নেই। তবে তাদের বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব না থাকলেও বিশ্ববিবরণ আছে। কিন্তু এই বিশ্ববিবরণ ব্রাহ্মণ্য বিবরণ থেকে অনেকটাই পৃথক। এই মত পার্থক্য ঊর্ধ্ব জগতের ক্ষেত্রেই বেশি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাতে ভাসমান আছে জৈনরা তাকে বলেন লোকাকাশ। বাকী অংশ আলোকাকাশ। আলোকাকাশ হল মহাশূন্যতা—দুর্ভেদ্য। এখানে বস্তুকণা কেন মানুষের আত্মাও প্রবেশ করতে পারে না। লোকাকাশে ধর্ম ও অধর্ম দুইই আছে। ধর্ম হল গতি, অধর্ম-স্থির (বস্তুত কিছুই স্থির নয়)। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন চরকার দুটো কাঠির মত—একটি অপরটির মুখে লেগে আছে। অনেকে আবার তাকে তিনটি বাটী জাতীয় পাত্র হিসাবেও কল্পনা করেছেন—যে তিনটি বাটীর মধ্যে নিচেরটি উল্টো হয়ে আছে উপরের দুটি মুখোমুখি যুক্ত হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ একে কল্পনা করেছেন কটিদেশে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার মত। পৃথিবীর রেকাবী রয়েছে তার মধ্যদেশের নিম্ন প্রান্তে। পুরুষের ক্ষেত্রে এটাই তার কোমর। এর নিচে রয়েছে নানা নরক। ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বলোক। এক ঘনীভূত জলের উপর বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে (সম্ভবত এর দ্বারা বায়ুমণ্ডলির কল্পনা করা হয়েছে)। এই ঘনীভূত জল দাঁড়িয়ে আছে ঘনবায়ুর উপর—অর্থাৎ তেজপূর্ণ দেশের উপর-pulsating void। এই ঘনীভূত বায়ু দাঁড়িয়ে আছে হাল্কা বায়ুর উপর-(সম্ভবত মহাশূন্যতা)। শেষ দুটি স্তরের পরিধি অসংখ্য অর্থাৎ যার সীমা নেই।

জৈনরা সাতটি নিম্নভূমিরও কল্পনা করেছেন—রত্নপ্রভা, শর্করাপ্রভা, বালুকাপ্রভা, পঙ্কপ্রভা, ধূম্রপ্রভা, তমাহপ্রভা ও মহাতমহ্‌প্রভা। এগুলিকে সূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে ধরে নিতে হবে, অর্থাৎ ক্রমবস্তুপুঞ্জ থেকে প্লাজমিক ও শূন্যতা পর্যায়ে এগুলিকে কল্পনা করা হয়েছে। উমাস্বাতি এর আরও নাম দিয়েছেন—ধর্মা, বংশা, শৈলা, অঞ্জনা, অরিষ্টা, মাধব্যা এবং মাধবী। এই অঞ্চলগুলির মধ্যেই রয়েছে নরক। এদের মধ্যে নিম্নতম ভূমিতে পাঁচ এবং ঊর্ধ্বভূমিতে তিন হাজার নরক রয়েছে। পাপীষ্ঠ আত্মারা এখানে বহুদিন বেঁচে থাকার পর

পুনরায় ভিন্ন পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে। রত্নপ্রভা থেকে পৃথিবী যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে ভবনবাসিন দেবতারা বাস করেন। এই স্তর হল ব্রাহ্মণদের পাতাল তুল্য। এই সপ্তনিম্ন ভূমির উপর রয়েছে পার্থিব তল। এই পার্থিব তল ভেদ করে উঠেছে মেরুপর্বত—যাকে ঘিরে গ্রহনক্ষত্রাদি সহ জ্যোতিষ্ক দেবতারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মেরুপর্বতের মাথায় তিন ধরনের স্বর্গীয় ভূমি আছে—বিমান—সেখানে বৈমানিক দেবতারা বাস করেন। এই অঞ্চলগুলি হল—দ্বাদশ কল্প—সৌধর্ম, ঐশান, সনৎকুমার, মহেন্দ্র, ব্রহ্মলোক, লান্তক, মহাশুক্র, সহস্রার, আনত, প্রাণত, আরণ এবং অচ্যুত। আর রয়েছে নটি গ্রৈবেযক ঃ—গ্রীবা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চক্র অঞ্চল ঘিরে রয়েছে এই জগৎ। এই জগতের রয়েছে পাঁচটি অনুত্তর ভূমি—বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপরাজিত এবং সর্বার্থসিদ্ধ। অনুত্তর ভূমির দেবতারা দুবারের বেশি পুনর্জন্মের বেদনা সহ্য করেন না। মোট যে ২৬ টি স্বর্গ আছে সেগুলি একে অপরের উপর স্থাপিত। সম্ভবত একে বর্তমান পদার্থবিদ্যার ২৬টি মাত্রা হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সর্বার্থসিদ্ধ ভূমির উপর রয়েছে ঈষৎ প্রাগভার অঞ্চল, নির্বাণ লাভ করার পর আত্মা যেখানে গিয়ে বাস করে।

জৈনদের এই যে জগৎ-স্তর কল্পনা করা হয়েছে এর মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব না থাকলেও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্থূলপর্যায় থেকে স্থূল পর্যায়ের যে বিবরণ রয়েছে তা পরোক্ষভাবে বিশ্বপ্রকাশের একটা ইঙ্গিতও দেয়। তবে ইঙ্গিত মরমিয়া, বিজ্ঞানের গণিতের সঙ্গে এর মিল হবে না, অর্থাৎ গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে।

পৃথিবীর সব দেশেই সৃষ্টি নিয়ে মানুষের ভাবনা চিন্তা দেখা দিয়েছিল। কোন দেশই এই ভাবনা চিন্তা এড়িয়ে যেতে পারেনি। ভারতবর্ষের পূর্বে বিশেষ করে বৈদিক ভারতের পূর্বে ইরাণেও এই চিন্তা দেখা দিয়েছিল। ইরাণে যে দুটি গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সে গ্রন্থ দুটির নাম বেন্দীদাদ (১) এবং বুন্দাহিশন্। এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে বুনদাহিশনে এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা আছে। বুনদাহিশন্-এর মতে অহুর মজদ ও অহ্রিমন অনন্তকাল ধরেই আছেন। এই দুই বিভক্ত হয় বায়ু (তেজ, বিস্ফোরণের আবেগ) দ্বারা। সম্ভবত চৈনিক তাও-বৃত্তের মত বা ভারতীয় চণকের বহিরাবণের মধ্যে বিভক্ত দুটি বীজাংশের মত তারা 'এক' রূপে প্রতীয়মান ছিলেন। বিভক্ত হবার পর অহুর মজদ ভাস্বর জ্যোতিতে বাস করতে থাকেন এবং অহ্রিমন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে। অহুর মজদ তাঁর সর্বদৃষ্টি দ্বারা অন্ধকারের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অহ্রিমনের অস্তিত্ব জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু অহ্রিমন অহুর-মজদ-এর অস্তিত্ব জানতে পারেনি। জানতে পারে তখনই যখন অহুর মজদ-এর আলো সে দেখতে পায়। আর ঠিক তখনই শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। অহুর মজদ সুন্দর একটি দেশ (ভূমিখণ্ড) তৈরি করলে অহ্রিমন সেই সৃষ্টি নষ্ট করার জন্য নানা ধরনের রোগ শোক নিয়ে আসে—যেমন নৈতিক

অপরাধ, জৈবিক দেহের রোগ ইত্যাদি। এ ধরনের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে পৃথিবীর সব দেশেরই অধিকাংশের মত ইরাণেও আদি বিশৃঙ্খলার কল্পনা ছিল অর্থাৎ cosmic chaos-এর।

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে জরথুস্ত্রবাদীরা বার হাজার বছরের একটি সময় সীমা ধার্য করেছেন। এই বার হাজার বছরকে আবার চারটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। ফলে এক একটি যুগে পড়েছে তিন হাজার বছর করে। প্রথম তিন হাজার বছরের যে যুগ তা ভারতবর্ষে সত্য যুগের মত। এ-সময় সৃষ্টির স্তর ছিল অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, অস্পর্শযোগ্য, মানসক্রিয়াস্তব্ধ ও গতিহীন। সম্ভবত এখানে মহাশূন্যতাকেই বোঝানো হয়েছে। এ সময় অহ্রিমন দৈত্যদের সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সৃষ্টির আবেগ। স্বর্গীয় সত্তার সঙ্গে অহ্রিমন কোন ধরনের আপোস করতে রাজি হয়না। অর্থাৎ স্থির সত্তার মধ্যে অস্থিরতা আনার চেষ্টা করে। এ-হল হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের মত। অহুর মজদ জানতেন যে, প্রথম তিন হাজার বছর সম্পূর্ণটাই তার নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয় তিন হাজার বছর দেবতা ও দৈত্যের মধ্যে তিক্ত সংগ্রাম চলবে। তৃতীয় তিন হাজার বছর এই সংগ্রামে দৈত্যেরা বিতাড়িত হবে। দ্বিতীয় তিন হাজার বছরের অবস্থা মহাশূন্যের কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণ হবার যে আবেগ সেই অবস্থা। তৃতীয় তিন হাজার বছরে বিস্ফোরণ হবার পর পার্টিক্‌ল্ ও অ্যান্টিপার্টিক্‌ল একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। অ্যান্টি-পার্টিক্‌ল্ অর্থাৎ দৈত্যরা বিস্ফোরণ জনিত kinetic energy-র জন্য অর্থাৎ kinetic energy দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দূরে সরে যাবে। এই অ্যান্টি পার্টিক্‌লই দৈত্য। দ্বিতীয় তিন হাজার বছরের সংগ্রামে সমগ্র বস্তুসত্তার ভিত্তি তৈরি হবে। তৃতীয় তিন হাজার বছরে প্রথমে অহ্রিমন—আদিমানব অর্থাৎ নারায়ণ অর্থাৎ কারণ সলিলস্থ field-কে হত্যা করে অর্থাৎ চাপ সৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটাবে। বাকি তিন হাজার বছর মহাকাশে পার্টিক্‌ল্—অ্যান্টি-পার্টিক্‌লের সংগ্রাম চলবে। অর্থাৎ অ্যান্টি-পার্টিক্‌ল নির্দিষ্ট সময়ে পার্টিক্‌লজগৎ থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। অ্যান্টি-পার্টিক্‌ল্ পার্টিক্‌ল্ জগৎ থেকে দূরে সরে যাবে। পার্টিক্‌ল-জগৎ ফুটে উঠবে—অর্থাৎ এখানে প্রাকৃতিক নিয়মের রাজত্ব চলবে। একেই বলা হয়েছে ইরানীয় শাসকদের শাসনের কাল।

পৃথিবীকে ইরানীরা সাত ভাগে ভাগ করেছেন অর্থাৎ সাতটি স্তরে। সেমিটিক চিন্তাতেও এমন সাতটি স্তরের কল্পনা দেখা যায়। হিন্দুদের সপ্তদ্বীপ পরি-কল্পনার সঙ্গেও এর মিল আছে। তবে ইরাণে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হওয়াতে দ্বৈতবাদীয় ধারণা একেশ্বরবাদীয় ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে। এই একের মধ্য থেকেই দুইয়ের উদ্ভব হয়েছিল। ইরাণী কোন কোন সম্প্রদায়ের ধারণা, ঈশ্বরের অশুভ চিন্তা থেকেই শয়তান রূপী অহ্রিমনের উদ্ভব। অহুর মজদ এক সময় চিন্তা করেছিলেন 'আমার যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত তবে তাকে দেখতে কি

রকম হত? এই চিন্তা থেকেই অভ্যুত্থানের উদ্ভব। তবে এমনতর ধারণা রক্ষণশীলরা স্বীকার করেন না। কিন্তু অবেস্ত-এর সৃষ্টি কল্পনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ-সৃষ্টি চিন্তার সঙ্গে তার বেশ মিল আছে। গল্পের আড়াল থেকে এই সত্যটুকুকে শুধু বের করে আনতে পারলেই হয়।

জাপানীদের সৃষ্টিতত্ত্বও গল্পের আবরণে আবৃত। কিন্তু একটুখানি সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখলে তার মধ্যেও যথেষ্ট বিজ্ঞানের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে। যে গ্রন্থে এই সৃষ্টি তত্ত্ব রয়েছে তার নাম কোজিকি অর্থাৎ 'পুরাণতথ্য সংগ্রহ'। গ্রন্থটি সম্ভবত লেখা হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠিক যে মুহূর্তে আরবীয়েরা ভারতের সিন্ধু উপত্যকাতে তাদের প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্যায়ের দেবতার নাম অমে-নো-মি নক-নুশি-নো কমি অর্থাৎ স্বর্গের কেন্দ্রস্থলের অধিকর্তা। অর্থাৎ নিশ্চলক্ষেত্রের অধিপতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেবতার নাম তক-মি-মুসু-বি-নো-কমি অর্থাৎ মহান চলমান দেবতা bigbang প্রসূত kinetic energy, এর পরের দেবতার নাম কমি-মুসু-বি-নো-কমি অর্থাৎ দিব্যশক্তিস্রষ্টা অর্থাৎ পার্টিক্‌ল স্রষ্টা দেবতা। এই তিন দেবতাই স্বতস্ফূর্ত দেবতা, আমাদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মত—নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন। 'এঁরা যেমন স্বতই আবির্ভূত হয়েছেন তেমন স্বতই অদৃশ্য হয়ে যাবেন।

এর পর যে দেবতারা এসেছিলেন তাঁরা নলখাগড়ার মত ফুটে বেরিয়েছিলেন। এঁদের আবির্ভাবের সময় ধরণী ছিল নিতান্তই তরুণ। তেলের উপর ভাসমান অবস্থার মত অর্থাৎ স্থূলসৃষ্টির তন্মাত্রিক অবস্থায় এঁদের নাম উমশি-আশি-কবি-হিকো-জি-নো-কমি অর্থাৎ আনন্দময় প্রাচীন দেবতা। সম্ভবত সৃষ্টির সূক্ষ্ম উপাদান—পার্টিকলের মত যে পার্টিক্‌লগুলি দেশের (space) বুকে ছন্দায়িত ভঙ্গীতে নৃত্যায়িত থাকে। এঁদের পরে আসেন অমে-নো-টোকো-টচি-নো কমি অর্থাৎ দেশের বুকে স্থিত নিত্য অণু-পরমাণু। এঁরাও স্বতসৃষ্ট এবং অদৃশ্য। এরা সৃষ্টিপর্যায়ে স্বর্গস্তরের দেবতা অর্থাৎ দেশের অণু-পরমাণু মাত্র।

এরপরে যে সকল দেবতার জন্ম হয়েছে তাঁরা হলেন কুনি-লো-টোকো-টচি-নো-কমি অর্থাৎ স্থূল জগতের শাশ্বত উপাদান। এর পরে আসেন টোয়ো-যুমো-নু-নো কমি অর্থাৎ অণু-পরমাণু সংযোগী দেবতা। এঁরাও স্বতন্ত্রভাবেই জন্ম নেন এবং অদৃশ্য থাকেন। এর পর যে সকল দেবতা আসেন, তাঁরা হলেন—উ-হিজি-নি-নো-কমি অর্থাৎ স্থূল মৃত্তিকার তন্মাত্রিক দেবতা। তাঁর স্ত্রী বা ভগ্নী-সু-হিজি-নি-নো-কমি-অর্থাৎ মৃত্তিকার সূক্ষ্ম উর্বরা শক্তি। এর পরে আসেন জুনু-গুহি-নো-কমি অর্থাৎ বীজসঞ্চারী দেবতা। এরপর তাঁর ভগ্নি ইকু-গুহি-নো-কমি অর্থাৎ প্রাণপ্রদায়িনী দেবী। এরপর আসেন ওহো-

টো-নো-জি-নো-কমি অর্থাৎ স্থূল জীবের প্রথম দেবতা। সঙ্গে আসেন তার বোন ওহো-টো-নো-বে-নো-কমি, অর্থাৎ প্রথম স্থূল নারী। এর পর আসেন ওমো-দরু-নো-কমি অর্থাৎ বহির্জগতে দৃষ্ট দেবতা ও তাঁর ভগ্নী -অয়-কশিকো-নে-নো-কমি অর্থাৎ শ্রদ্ধার দেবী। এর পর আসেন ইজানা-গি-নো কমি অর্থাৎ কাম দেবতা, এবং তার ভগ্নি ইজানা-মি-নো-কমি অর্থাৎ রতি।

এইভাবে সাতটি দৈবীপ্রজাতি পার হয়ে অবশেষে জীবজগৎ আত্মপ্রকাশ করে। যদি সত্যি গভীর ভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে পার্থিব জীবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সূক্ষ্ম জগতের অণুপরমাণুর খেলাই এতে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তখন বর্তমানকালের মত স্থূলবিজ্ঞান ছিল না বলে মরমিয়া ভাবে সৃষ্টির এই ক্রম স্তরিত পর্যায়ের কথা জাপানী মরমিয়া সাধকেরা আলোচনা করেছেন। সৃষ্টির প্লাজমিক মেঘতুল্য ঘূর্ণায়মান অবস্থা থেকে, সূক্ষ্ম বস্তুসত্তার আবির্ভাবের চমৎকার কাহিনী এখানে পাওয়া যায়। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা এই জাপানী পুরাণকাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট ভাবেই বৈজ্ঞানিক সত্যের ছায়া খুঁজে পাবেন। এতে যেমন পাওয়া যাবে অণুপরমাণুর পারস্পরিক সংযোগ-বিয়োগের ইতিহাস তেমনই জৈব জীবকোষের যৌনতার ইঙ্গিত। একটি অতিক্ষুদ্র অণুকে ভেঙে কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টরা যেমন পেয়ে গেছেন বিস্ময়কর এক সাম্রাজ্যের সূক্ষ্ম ইতিহাস তেমনই রহস্য লুকিয়ে আছে জাপানের পুরাণ কাহিনীর মধ্যেও।

জাপানীরা নিজেরাই অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পুরাণ কাহিনীর আন্তরহস্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সুতরাং তারা একে অর্থবহ একটি রূপ দেবার চেষ্টা করেন। সুতরাং নতুন আকারে সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠকদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। হিরাতা মনে করেন দেবতা উ-হিজি-নি-এবং দেবী সু-হিজি-নি নামকরণ করা হয়েছে এই দিকে লক্ষ্য রেখে যে, তাঁদেরই মধ্যে সৃষ্টির সকল বীজ লুক্কায়িত ছিল। দেবতা ওহো-টো-নো-জি ও দেবী ওহো-টো-নো-বে-এর নাম পৃথিবীর আদিম অবস্থাদ্যোতক। পৃথিবী যখন বর্তমান অবস্থায় আসার পর নতুন দেবদেবীর কল্পনা করা হয় —যেমন দেবতা জুনু গুহি এবং দেবী ইকু গুহি। সৃষ্টি এক ধরনের পরিপূর্ণতার মধ্যে এলে এবং জীবের চারিত্রিক বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তাদের নিয়ন্ত্রক দেবতা হিসেবে যে নতুন নিয়ন্ত্রক শক্তির কল্পনা করা হয় তাঁদের নাম দেবতা ওমো-দরু এবং দেবী অয়-কশিকো-নে। সৃষ্টির ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রক শক্তির নামও পাল্টে যায়। ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও বিপিনচন্দ্র পাল ভারতীয় দেবীদের অর্থাৎ শক্তির আবির্ভাবের ক্ষেত্রে ক্রম পর্যায়ে তাঁর বিভিন্ন নাম হয়েছে এমন কল্পনা করেছেন। যেমন আদিম পশুশক্তির নিয়ন্ত্রক দেবীর নাম তিনি করেছেন দেবী জগদ্ধাত্রী। উপজাতীয় আমলে তীব্র গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কালে শক্তিকে তিনি দেখেছেন দেবী কালিকা হিসেবে। আবার সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের কালে এই শক্তিকে

তিনি দেখেন দেবী দুর্গা রূপে।

জাপানী নিহোঙ্গি অর্থাৎ কালানুক্রমিক বৃত্তান্তে এই সৃষ্টির কাহিনীই আরও সহজ হয়ে এসেছে। হয়তো জাপানীচিন্তার উপর চীনের প্রভাব পড়ার জন্যই এমন হয়েছিল। চৈনিক এই চিন্তাকে আরো মূল্যবান করে তুলেছিল জাপানের নিজস্ব মানসিকতা। নিহোঙ্গিতে বলা হয়েছে আদিতে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিলনা ইন্ এবং যোও দ্বিধা বিভক্ত হয়নি। ডিম্বের মত একটি গোলকে সৃষ্টির আবেগ টগ্‌বগ্ করে ফুটছিল—ঠিক আধুনিক অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের ব্ল্যাকহোলের আভ্যন্তরভাগের মত। এরই মধ্যে ছিল সৃষ্টির বীজ। এর মধ্যে স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম উপাদানগুলি নিয়ে স্বর্গ এবং স্থূল উপাদান গুলি নিয়ে মর্ত্যের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্ম উপাদানগুলির সংমিশ্রণে কোনই অসুবিধা হয়নি কিন্তু স্থূলসত্তা তৈরি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই কারণে-ই স্বর্গের সৃষ্টি হয় আগে এবং মর্ত্যের সৃষ্টি পরে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে প্রথম দিব্যসত্তার উদয় হয়। মর্ত্য সৃষ্টি হবার সময় সৃষ্টির উপাদানগুলি পুকুরের জলে মাছের মত স্বেচ্ছাবিহারী ছিল। ঠিক এই সময় স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে কিছু সৃষ্টি হয়। নল খাগড়ার ডগার মত অকস্মাৎই যেন তা বেরিয়ে আসে। এই আকস্মিক আবির্ভূত সত্তাই কুনি-টোকো-টচি-নো-নামে পরিচিত অর্থাৎ স্থূল-সত্তার যথার্থ উপাদান। এর পরই আসেন টোয়ো-কুমু-নু-নো-মিকোটো অর্থাৎ স্থূলসত্তার উপাদানগুলির যথার্থ সংমিশ্রণ। সুতরাং, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল দেবতা হিসেবে কাজ করেছেন তিন জন।

এর পরই বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কেমন একটা ছেদ পড়ে যায়। কখনও বলা হয় সৃষ্টির আদিতে ছিল শূন্যতা মাত্র-বা-এমন এক অবস্থা যার বর্ণনা দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এবং এই অবস্থা থেকেই প্রথম দেবতার উদ্ভব হয়। আবার কখনও কখনও বলা হয়েছে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল যখন দেশ ও স্থূল জগৎ অত্যন্তই তরুণ ছিল—এবং জলের উপর তেলের মত ভাসছিল। ভারতীয়দের জন্মের মত এ থেকেই অকস্মাৎ নলখাগড়ার ডগার মত কিছু বেরিয়ে আসে প্রাণের আবির্ভাব ঘোষণা করার জন্য। আবার কখনও বলা হয়েছে স্বর্গ ও মর্ত্য যখন একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল, ঠিক তখনই এক দিব্যপুরুষের আবির্ভাব হয়-(ভারতীয়দের ব্রহ্মার মত)। আবার এমন বর্ণনাও আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি হবার সময় দেবতারাও সৃষ্ট হন। আবার কোথাও বলা হয়েছে—স্বর্গ ও পৃথিবীর আবির্ভাবের পূর্বে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল—যা নাকি সমুদ্রের উপর মেঘের মত ভাসমান ছিল। এই মেঘের আশ্রয় পাবার মত কোন স্থান ছিল না। এই অবস্থার মধ্য থেকেই জলের নিচে কাদা থেকে নলখাগড়ার ডগার মত কিছু একটা গজিয়ে উঠে। এবং সেটাই রূপান্তরিত হয়-মানুষরূপে।

এই বর্ণনাবৈচিত্র্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়, এমন কি বিজ্ঞানও

এই বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। সেখানেও সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে কোথাও ধরা হয়েছে Bigbang তত্ত্বকে, কোথাও বা-Stady State তত্ত্বকে। একেবারে নির্ভুল জবাব পুরাণকাহিনী থেকে বিজ্ঞান কেউই দিতে পারে নি। তবে যারা অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স ও কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জাপানী এই সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই এর পেছনে আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার সঙ্গে একটা নিবিড় নৈকট্য খুঁজে পাবেন।

এই বৈচিত্র্যের কারণ হয় তো এই যে, নানা গোষ্ঠীর পুরাণ কাহিনী জাপানী সৃষ্টিতত্ত্বে এসে স্থান পেয়েছে। ঠিক একই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নিহোঙ্গিতে স্বর্গ ও মর্তের পার্থক্য দিয়ে যে সৃষ্টি তত্ত্বের সূচনা হয়েছে নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চীনে যেখানে ইয়াং ও ইন্ এসেছে জাপানে সেখানে এসেছে-ইজানাগি ও ইজানামি। Cosmic Egg-এর চিন্তারও ক্ষীণ সূত্র খোঁজাখুঁজি করলে এখানে পাওয়া যাবে।

ইজানাগি ও ইজানামি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জাপানের দ্বীপে তাঁদের মিলন ঘটিয়েছিলেন। প্রথম তাঁরা যে সন্তানের জন্ম দেন সে ছিল খুবই দুর্বল। ফলে একে এঁরা নলখাগড়া দিয়ে একটি নৌকো তৈরি করে তাতে ভাসিয়ে দেন। এর পর তাঁরা অওয়া দ্বীপের জন্ম দেন। একেও তাঁরা গ্রহণ করতে রাজি হন না। কিন্তু দেবতারা স্বর্গ থেকে ঘোষণা করেন যে, এই সন্তানেরা মনোমত না হবার কারণ— বিবাহ-উৎসবে স্ত্রী প্রথম কথা বলেছিলেন। যা-হোক এর পর ইজানাগি ও ইজানামি উপযুক্ত পরিবেশে নতুন সন্তানের জন্ম দেন। ফলে আওয়াজি দ্বীপের জন্ম হয়। এর পর আরো নানা দ্বীপের জন্ম দেবার পর একদল প্রাকৃত দেবতার জন্ম দেন তাঁরা।

এই ধরনের গল্প থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে জাপানীরা ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাস করতেন।

ইজানামির সর্বশেষ সন্তান ছিলেন অগ্নিদেবতা কগুজচি। এই কগু-জুচি হঠাৎ নিজের জননীকে এমন ভাবে দগ্ধ করে ফেলেন যে, ইজানামি তাতে মারা যান। ইজানামিকে ঘিরে তাঁর স্বামী ইজানাগি কান্নাকাটি শুরু করেন। তাঁর চোখের জল থেকে তখন আর এক দেবতার জন্ম হয়। ইজানাগি ইজানামিকে হিবা পর্বতে সমাধিস্ত করেন। এরপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মাতৃঘাতী সন্তানকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেন। কিন্তু কগুৎসুচির রক্ত ও দেহের অন্যান্য অংশ থেকে-আরো বহু দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। ইজানাগি তখন স্ত্রীর সন্ধানে পাতালে প্রবেশ করেন। নোংরা কর্দমাক্ত জলে তিনি ইজানামির মুখোমুখি হন। এতে ভীত হয়ে ইজানাগি উপরে উঠে আসেন এবং নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য ক্যাশু নদীতে পাপস্খালন করেন। তাঁর দণ্ড থেকে এই সময় আরও বারটি দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। দেহবর্ণ ও বস্ত্র থেকেও দেবতাদের

জন্ম হয়। প্রায়শ্চিত্তকালে আরও চোদ্দটি দেবতার জন্ম হয়। তিনি তার বাম ও দক্ষিণ চক্ষু এবং নাসিকা ধৌতিকরণের সময় আরও তিনজন বিখ্যাত দেবতার জন্ম দেন। এঁরা হলেন সূর্য, চন্দ্র ও সমুদ্রদেবতা। পরে তিনি ঝড়ের দেবতায় রূপান্তরিত হন। ইজানাগি বিশ্বশাসনের ভার এঁদের উপর অর্পণ করেন।

ইজানাগি ও ইজানামির গল্পের মধ্যে ভারতীয় দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। এতে একান্নটি শাক্ত মহাপীঠের উদ্ভব হয়েছিল। আসলে এই একান্নটি পীঠ হল দেশে একান্নটি তরঙ্গ—যা থেকে স্থূল পৃথিবীর উদয় হয়েছিল। এই গল্পের পেছনেও সৃষ্টির ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এখানে গ্রীসের অরফিয়াসের পাতাল গমনের ছায়াও রয়েছে। এসব লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কি করে অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন করে মিলন সম্ভব হয়েছিল।

৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এক রাতে পূর্বদিক থেকে ভয়ানক গোলমালের শব্দ আসতে থাকে—যেন কেউ জয়ঢাক পিটুছে। সকালবেলা দেখা যায়, সমুদ্রের বুক থেকে একটি দ্বীপ গজিয়ে উঠেছে। এই গর্জন জাপানীদের মতে ছিল দ্বীপ তৈরি করার সময় দেবতাদের কলরোল। এঠিক Black Hole-এর অভ্যন্তরের Chaos ও Bigbang-এর মত, যে Bigbang বা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ থেকে জগতের সৃষ্টি। অপরপক্ষে গল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় দেবতা ও দৈত্যদের সমুদ্রমন্থনের মত।

জাপানে বিশ্বসৃষ্টি গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদির আবির্ভাব প্রভৃতি নিয়ে নানা ধরনের গল্প আছে। খুঁজে দেখলে এর অন্তরালে নানা সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে। একটি বিশ্বাস সর্বত্রই রয়েছে যে, সৃষ্টির জন্য পুরুষ ও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নিয়ে-পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে গল্প আছে তার মধ্যে নানাধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষে অদ্বৈত-বাদের যে গল্প আছে তার সন্ধান অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। অদ্বৈতবাদী তত্ত্ব-অদ্ভুত এক তত্ত্ব হলেও এ থেকে দ্বৈতের আবির্ভাব কি ভাবে হয়েছে—সে কথাটা বোধগম্য করে অদ্যাবধি বলা যায় নি।

আধুনিক ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরস্থ বিশৃঙ্খলা বিস্ফোরিত হয়ে কি ভাবে নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে সেটা আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি দ্বারা ধরা সম্ভব হলেও—সেই ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরের সঠিক হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। তবে ব্ল্যাকহোল তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রীসে জগৎ-উৎপত্তির জন্য বা ছায়াপথ আত্মপ্রকাশ করার জন্য হেরার দুধ যে পুরাণচিত্র অঙ্কন করেছে, ব্ল্যাকহোলের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে তার একটা হেরফের তেমন নেই। আবার গ্রীসের এই হেরার দুধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানেও কুগুজুচির গল্প দেখা দিয়েছে।

পিতা ইজানাগি তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে তার দেহ থেকে যে রক্ত ছুটে বেরিয়েছিল তা থেকেই নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে জাপানী পুরাণ কাহিনীতে এমন ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। হেরার দুধ থেকে ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছিল এই বিশ্বাস থেকেই ছয়াপথের নাম Milky Way হয়েছে। জাপানী-দের কাছে এই ছায়াপথের বর্ণ রক্ত দিয়ে তৈরি হবার জন্য একটু রক্তিমাভ। আর উভয় গল্পের সঙ্গেই একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ব্ল্যাকহোল তত্ত্বের মধ্যে রয়েই গেছে।

আশ্চর্য হবার মত এই যে, প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যখন এমনতর যোগাযোগ ছিলনা তখন কি করে দুটি দুই প্রান্তের দেশের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে এত মিল দেখা যায়। জাপানীরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশেরই মত মৃত্যুকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিতে পারেন নি। সুতরাং মৃত্যু বহিরাগত অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার এই ধারণাই প্রবল ছিল। আশ্চর্য হবার ব্যাপার এই যে, উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের চিন্তার সঙ্গে জাপানের এই মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তার মিল আছে। যে কারণেই হোক জাপানীরা মৃত্যুকে নিয়ে অনুসন্ধান না করলেও জীবন সম্পর্কেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, প্রাচীন গল্পগুলির মধ্যে সত্য আশ্চর্য ভাবে লুকিয়ে ছিল যেগুলি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থবহ হয়ে উঠছে।

ইহুদীদের মধ্যে র‍্যাব্বিশ্রেণীর উদ্ভব হবার পর বিশ্বসৃষ্টির আদি পর্যায় নিয়ে তেমন ভাবনাচিন্তা করার প্রয়াস দেখা যায় না। সুতরাং বাইবেলের সময় থেকে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সৃষ্টির অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের ক্ষেত্রে বেশ একটা অনীহাই লক্ষ্য করা যায়। সেই জন্য একটি কবিতাতে বলা হয়েছে :—

'যা তোমার কাছে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ তা জানার জন্য
তেমন আগ্রহ দেখিও না।
তোমার কাছ থেকে যা আড়াল রয়েছে তাকে তেমন
খোঁজার চেষ্টা কোরোনা।
যা রহস্যাবৃত রয়েছে তা নিয়ে তেমন মাথা না
ঘামানোই ভাল।'

এ ধরনের বক্তব্য রয়েছে তালমুদ ও মিদ্রাশা-এ। সৃষ্টি নিয়ে যতটুকু কৌতূহল দেখানো হয়েছে তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেকে ধর্মীয় ভাবাবেগই বেশি।

বাইবেল ও দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময়ে তিনটি বিশেষ ধারায় সৃষ্টি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। র‍্যাব্বিরা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে দুটি কারণে আগ্রহের অভাব দেখিয়েছেন—(১) সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার উপাদান ও পদ্ধতি গ্রীকচিন্তার প্রভাবে এমন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে, তা শেষ পর্যন্ত

নিরীশ্বরবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং (২) স্বধর্মত্যাগ করার জন্য প্ররোচনা দিয়েছে। সেইজন্য তারা তর্কবিতর্কে না গিয়ে একটি বিশ্বাসই প্রবল ভাবে আঁকড়ে থেকেছে, অর্থাৎ এই জগতের স্রষ্টা শুধুমাত্র ঈশ্বর, আর কেউ নন।

তবে ঈশ্বরই একমাত্র স্রষ্টা একথা বিশ্বাস করতে গেলে সৃষ্টির জন্য যে উপাদান থাকা প্রয়োজন ইহুদীরা সেই উপাদান নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি, কারণ তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে বস্তুসত্তার চিরন্তনতা মেনে নিতে হয় এবং দ্বৈতবাদের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং একটা অপূর্ণতা থাকলেও সৃষ্টি শূন্য থেকেই ঈশ্বর দ্বারা হয়েছে তাঁরা এই ধারণাটাকে স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। ঈশ্বর আকৃতি দান করেছেন, কিন্তু বস্তুসত্তা দান করেন নি। ঈশ্বর বললেন আর জগৎ সৃষ্টি হল এ কথাটাকেই তাঁরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন। বাক্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব এটা তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা একেই বলেছেন শব্দ-ব্রহ্ম। এই শব্দ ব্রহ্মই ওঁ এবং এর ব্যাপ্তি তরঙ্গে তরঙ্গে Superstring-এ কাজ করে একের মধ্যেই বৈচিত্র্য ফুটিয়েছে। জগতে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যত ব্যতিক্রম তা সবই শব্দতরঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সির তারতম্যের জন্য। বর্তমান পদার্থবিজ্ঞান অবশ্য এরকম চিন্তাতে খুব একটা অনাগ্রহ প্রকাশ করতে রাজি নয়। সুতরাং ইহুদীদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই কথাটাই মেনে নিতে হবে যে, বাইবেল থেকে মধ্যযুগে ইহুদীদর্শন সৃষ্টি হবার পূর্বে সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে যা বোঝায় ইহুদীদের মধ্যে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল না। তবে পরবর্তী কালে কাবালাতত্ত্বে সৃষ্টি নিয়ে মানুষের দেহকে ঘিরে যে জ্যামিতিক ডায়াগ্রাম এঁকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাতে বিজ্ঞান ও মরমিয়া দেহতত্ত্ব পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকান আদিবাসীরা মরমিয়া বিশ্লেষী দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। সৃষ্টি সম্পর্কিত তাদের কাহিনীর মূলকথা এই যে, প্রারম্ভে দেবতারা টিওটিহুয়াকান নামক স্থানে একত্রিত হয়ে এই আলোচনা শুরু করেন যে জগৎ-পালক কে হবেন। এবং কেই বা সূর্য সৃষ্টি করবেন, কারণ তখন ছিল শুধুই অন্ধকার—নাসদীয় সূক্তের 'অন্ধকার ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন' হয়ে থাকার মত অন্ধকার।

এই অন্ধকারকে ভেদ করে আলো ছড়াতে রাজি হলেন এক দেবতা যাঁর নাম টেকুসিজটেকটল্। কিন্তু সৃষ্টি করার জন্য তার সঙ্গী হবেন কে, এ প্রশ্ন উঠতেই একের পর এক দেবতারা কেটে পড়তে লাগলেন। শেষপর্যন্ত নেনোয়াৎজিন নামে একজনকে টেকুসিজটেকটল-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল যার—শরীর ভর্তি ছিল বুবোসো বা গুটিকা (Pox)। নেনোয়াৎজিন এজন্য চারদিন উপবাস করলেন বা নিজেকে পাপ মুক্ত করার চেষ্টা করলেন।

দেবতারা টেকুসিজটেকটল্ ও নেনোয়াৎজিনকে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত

করে তার দুদিকে দাঁড়াতে বললেন। প্রথম টেকুসিজটেক্‌টল্‌কে আগুনে ঝাঁপ দিতে বললেন। চার বার টেকুসিজটেক্‌টল্‌ আগুনের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড তাপে ফিরে এলেন। দেবতারা তখন ননৌয়াৎজিনকে ঝাঁপ দিতে বললেন। সে সাহস সঞ্চয় করে চোখ বুজে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। টেকুসিজটেক্‌টল্‌ও তখন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। ওঁদের দুজনকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল। উভয়েই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আকাশ রক্তিমাভ হয়ে উঠল। মনে হল ঊষার আকাশ দেখা দিয়েছে। দেবতারা হাঁটু গেড়ে বসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন না কোন্‌ দিক থেকে সূর্য উঠবে—কারণ চারদিক থেকেই আলোর ঝলকানি আসছিল। অবশেষে পূর্ব দিক থেকে সূর্যের উদয় হল। সূর্য উদিত হয়েই এদিকওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। তীব্র আলোকচ্ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম হল। কিন্তু কিছুকাল পরেই চাঁদ ভেসে উঠল। ভেসে উঠল পূব দিক থেকেই। চন্দ্র ও সূর্য মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রথম দিকে উভয়ের জ্যোতি সমান সমান ছিল। দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন—কাজটা ঠিক হয়েছে তো? মনে হল ঠিক হয়নি। তখন একজন দেবতা ছুটে গিয়ে টেকুসিজটেক্‌টল্‌-এর মুখে খরগোস দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এর জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এবং টেকুসিজটেক্‌টল্‌ চাঁদের আকৃতি ধারণ করলেন। এই ভাবে চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি হল। কিন্তু তখনও তারা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন, এ ভাবে কি ভাবে চলবে? তাহলে অযোগ্য মরণশীলদের পাশাপাশি আমাদের বাস করতে হবে? তার চেয়ে বরং আত্মাহুতি দিয়ে স্বর্গীয় এই জ্যোতিষ্ক দুটিকে প্রাণময় করা যাক। বায়ু তখন দেবতাদের হত্যা করলেন। এতেও সূর্যের গতি হল না। এর পর বায়ু স্বয়ং এত প্রবল বেগে বইতে শুরু করলেন যে, সূর্য গতিশীল হতে বাধ্য হলেন। কিন্তু চন্দ্র নড়ল না। অবশ্য কিছুকাল পরে সেও নড়তে লাগল। এর পর থেকে সূর্য ও চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয়ে আকাশপরিক্রমা করতে লাগল। টেকুসিজটেক্‌টল্‌ যদি আগে আগুনে ঝাঁপ দিতেন তবে তিনিই সূর্য হতেন।

গল্পটিকে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখা যায় তাহলে আদিম বিশৃংখলা, তুরীয়াতীত অবস্থা, এবং সৎ+চিৎ+আনন্দ (অগ্নি) অবস্থা, কৃষ্ণ গহ্বরের বিস্ফোরণ, দেশের উদয়, দিব্য জ্যোতিরূপে চাঁদের আলোর প্রকাশ, Super-string প্রভৃতি নানা মরমিয়া ও বৈজ্ঞানিক সত্যের আভাস এতে লক্ষ্য করা যাবে। গল্পের অন্তরালে প্রত্যেক দেশের প্রাচীন মরমিয়া অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতেও দেরী হবে না।

এদের মধ্যে একই ধরনের আরো গল্প ছিল। নতুন গল্প সিট্‌লালটোনাক ও সিট্‌লালিকিউ নামে দুটি আদি দেবতা অর্থাৎ দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সিট্‌লালিকিউয়ের একটি পাথর ছিল। সেই পাথরটিকে তার ক্রুদ্ধ সন্তানেরা পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথর থেকে ১৬০০ দেবতা আত্মপ্রকাশ করেন। এরা আদিমাতার কাছে প্রজননক্ষমতা প্রার্থনা করেন। সিট্‌লালিকিউ তাদের মিক্‌টলনটেকুট্‌লির কাছে পাঠিয়ে দেন। জনৈক দেবদূত পাতাল থেকে এদের দেহে হাড়মাস সঞ্চার করার উপাদান হিসাবে ছাই সংগ্রহ করে আনেন। পাছে মিক্‌টলনটেকুটলি আবার তা ফিরে চায় এই ভয়ে দেবদূতটি দ্রুত ছুট্‌তে আরম্ভ করে। কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ফলে তার হাড় ভেঙে যায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি সেগুলি সংগ্রহ করে দেবতাদের তিনি তা উপহার দেন। তারা এগুলো একটি থলেতে ভরে রক্ত দিয়ে ভিজিয়ে নেয়। চতুর্থ দিনে এ থেকে একটি বালকের আবির্ভাব হয়। অষ্টম দিনে একটি বালিকার। এঁরাই হল মানুষের আদি পূর্বপুরুষ।

তখনও সূর্যের আবির্ভাব হয়নি। দেবতারা তখন টিওটিহুয়াকন নামক স্থানে সমবেত হয়ে বলেন, 'যে অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে সূর্যে পরিণত হবে'। এক ব্যক্তি সাহসে ভর করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দর্শকরা আকুল হয়ে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তারা বাজি ধরে যে, যত পশু উপস্থিত রয়েছে তারা একত্রে মিলেও সূর্য কোথায় রয়েছে তা অনুমান করতে পারবে না। পশুকুল ব্যর্থ হলে তাদের বলি দেওয়া হয়। এর পর সূর্য ওঠে। কিন্তু উঠলে কি হবে স্থির হয়ে থাকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে দেবতারা তার দিকে তিনটি করে তীর ছুঁড়ে দিয়ে দুবার তাকে আঘাত করেন। ক্রুদ্ধ সূর্য একটি তীর তীরনিক্ষেপকারীর দিকে ছুঁড়ে দেন। সেই তীর তাঁর মস্তিষ্ক ভেদ করে। দেবতারা তখন সূর্যের তুলনায় তাঁরা হীনবল এটা বুঝতে পারেন। তাঁরা সূর্যের জন্য আত্মবলি দিতে রাজি হন। জোলোটল নামে এক দেবতা তাদের হৃদয় চিরে সূর্যদেবকে প্রদান করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য আকাশে চলতে আরম্ভ করে।

এই ধরনের আরও নানা গল্প প্রাচীন মেক্সিকানদের মধ্যে ছিল। এ সকল গল্প যে রূপকের মোড়কে আবরিত ছিল সন্দেহ নেই। মরমিয়া দ্রষ্টারা সত্য উপলব্ধি করে এগুলি রূপকের আকারে জনগণকে শুনিয়েছিলেন। গল্পের বিভিন্নতার কারণ সত্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে দৃষ্টির তারতম্য—ভারতীয়দের সেই 'একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র মত।

এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী উভলিঙ্গিয় এক দেবতার চিন্তা করত যার নাম ওমেটেকুট্‌লি। তাদের বিশ্বাস, এই ওমেটেকুট্‌লি থেকেই জগতের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন মিশরেও এই উভলিঙ্গিয় দেবতার কল্পনা ছিল যিনি নুন বা কারণ সলিলে আপনা-আপনিই ফুটে উঠেছিলেন। এই উভলিঙ্গিয় দেবতা ভারতবর্ষেও আছেন—হর-পার্বতি রূপে। আসলে ইনি নিউট্রন-ফ্লুড স্বরূপ যা থেকে আপনাআপনিই জগতের মৌল উপাদানগুলি প্রকাশ পেয়েছিল। এদের মধ্যে

'অনেকে বর্তমান বিশ্বের পূর্বে আরও বহু বিশ্ব ছিল এ ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। এ ধারণা বর্তমান বিজ্ঞানে জগৎ উৎপত্তির ক্ষেত্রে যে Steady State তত্ত্ব আছে তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। কিংবা এধরনের ধারণা হয়তো স্থূল জগতের আত্মপ্রকাশের পূর্বে সূক্ষ্ম যে সকল জগৎ এসেছে তার কথা মনে রেখেই। এই স্তরগুলিকে মানসস্তর, গতিময় বায়ুস্তর, অগ্নিস্তর ও জলস্তর হিসাবেও কল্পনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতায় এই সৃষ্টিতত্ত্ব আরো সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কুইচি উপজাতি মনে করত যে, আদিতে শুধুমাত্র আকাশ ও জল ছিল অর্থাৎ কারণ সলিল। কিন্তু সবই ছিল স্থির ও নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনজন দেবতা গুকুমজ, টেপেউ এবং হুরাকান (ভারতীয় সত্ত্ব, তম ও রজ গুণের মত) এই স্থির অবস্থার মধ্যে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিশ্বসৃষ্টি করেন—অর্থাৎ 'এক'-এর অভ্যন্তরস্থ গুণক্ষোভের ফলে জগৎ আত্মপ্রকাশ করে। এরা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থূল জগতে জীবের উদ্ভবের কাহিনীও বর্ণনা করেছিল। বাইবেলের মানবী সৃষ্টি করার গল্পের সঙ্গেও সঙ্গতি রেখে এদের নারীসৃষ্টির গল্প আছে। আদি চারটি মানুষের নিবিড় নিদ্রার অবসরে দেবতারা তাদের জন্য চারটি মানবী সৃষ্টি করেন। তাদের যৌনসংযোগে সৃষ্টির প্রসার ঘটে। গ্রীসে প্রমেথিউসের স্বর্গ থেকে অগ্নি চুরি করে আনার মত এদের ক্ষেত্রেও অগ্নির আবির্ভাবের গল্প আছে। অরফিউসের পরলোক দর্শনের মত রসাতলীয় মৃত্যুজগতের কল্পনাও এদের মধ্যে ছিল। এদের মধ্যে নোয়ার মহাপ্লাবনের গল্পের মত গল্পও রয়েছে। রয়েছে ভগবদ্গীতার মত জগৎবৃক্ষের কল্পনা। সপ্ত স্বর্গের কল্পনাও আছে। ভাবতে অবাক লাগে প্রাচীন পৃথিবীতে যখন মানুষের মধ্যে বর্তমানের মত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না তখন সেই কালে কি ভাবে এক দূরবর্তী সভ্যতার চিন্তার সঙ্গে তাদের চিন্তার মিল হতে পেরেছিল। মরমিয়া অভিজ্ঞতা সর্বত্রই সমান বলে বোধহয় এই ধরনের চিন্তার অবকাশ সম্ভব হয়েছিল।

মায়িক সভ্যতায় চিবচা উপজাতিরা সৃষ্টির প্রারম্ভে এমন এক অবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন যেটাও রীতিমত ভাববার বিষয়। তারা মনে করত, আদিতে আলো জাতীয় একটি সত্তা অব্যক্ত এক আবরণে আবৃত ছিল। এই আবরণ ভেদ করে আলো যখন বেরিয়ে আসে তখন কালো কিছু পাখি সৃষ্টি করেছিল। যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে এই আলো আটকে ছিল Blackhole-এ। Bigbang-এর পর কয়েক হাজার বছর ব্যাপী যে আদ্যাশক্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবাহ চলেছিল তাই কালো পাখির মত। এরপর আলোক তরঙ্গ ভরা দেশের উদয় হয়। স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম সৃষ্টি ফুটে উঠে। সব শেষে স্থূল পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব ঘটে। মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে তাদের গল্প এই যে, বেষ্টিত কোন জলাশয় থেকে আদি মানবী ও মানবের উদ্ভব হয়। এর

মধ্যে জল থেকে প্রাণের উদ্ভবের ক্ষীণ ইঙ্গিত ছিল মনে করা যেতে পারে। অবশ্য কেউ কেউ মাটি থেকে মানুষের জন্ম বা গাছের কোটর থেকে মানুষের আবির্ভাব এমন পুরাণ-কাহিনীও রচনা করেছিল। এ-সব কিছুর মধ্যেই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের একটা ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

পেরুর বিশ্ব-উদ্ভবের গল্প একটু ভিন্ন ধরনের। এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মনে করত সূর্য ও চন্দ্রসৃষ্ট অস্থিহীন এক সন্তান কন্ থেকেই বিশ্বের উদ্ভব। এখানে তারা নীহারিকাপুঞ্জাদি দেশস্থ প্লাজমিক মেঘের কল্পনা করেছিল কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করার অবসর রয়েছে। কন্-এর অদৃশ্য হয়ে যাবার পর প্যাচাক্যামাক নামে সূর্য ও চন্দ্রের আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি নর ও নারীর সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁদের জন্য কোন খাদ্যের ব্যবস্থা করেন না। ফলে মহিলা জাতিকা সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানান। সূর্যের ঔরসে তার গর্ভে পাঁচদিনের মধ্যে একটি শিশু জন্মায়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্যাচাক্যামাক সেই শিশুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে মাটিতে পুঁতে দেন। তা থেকে পৃথিবীতে নানা জিনিসের সঙ্গে খাদ্যশস্যও জন্মায়। কিন্তু এর পর হিংসা প্রতিহিংসার কতকগুলি ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত পেরুভিয়ানরা একটা স্থিতি লাভ করে। সম্ভবত এই ঘাত-সংঘাতের মূলে 'সারভাইবাল অব্ দি ফিটেস্ট' ধরনের একটি জীবনসংগ্রামের ইঙ্গিত রয়েছে।

লেক টিটিকাকার ধারে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ভিন্ন ধরনের একটি সৃষ্টি-তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল। এরা ছিল এই অঞ্চলে ইনকাদের আগমনের অনেক আগে। প্রথম দিকে কোন সূর্য ছিল না। প্রাচীন পুরুষেরা দেবতাদের কাছে এ জন্য প্রার্থনা জানালে অকস্মাৎ টিটিকাকা দ্বীপ থেকে সূর্যের আবির্ভাব হয়। একই সময় দক্ষিণ দিকে ছিমছাম দেহের এক গৌরবর্ণ পুরুষ এসে পাহাড়পর্বত গুঁড়িয়ে দিয়ে শক্ত মাটির নিচ থেকে প্রস্রবণের মুখ খুলে দেন। ফলে তাঁকেই সৃষ্টির প্রধান উৎস বলে ধরা হয়। এঁর নাম টিচিবিরাকোচা। এরপর আর একজন মানুষের আবির্ভাব হয় যিনি মানুষকে রোগমুক্ত করেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হলে আকাশ থেকে অগ্ন্যুৎপাতে মানুষ পুড়ে মরতে চলে। কিন্তু তৎক্ষণে সেই মানুষ অর্থাৎ বিরাকোচা আক্রমণকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করে করুণা করেন এবং আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এর পর সমুদ্র উপকূল দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। বিরকোচা নানা ঘটনার পর আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিতত্ত্বের পেছনে সম্ভবত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীই এই ধরনের গল্প রচনায় উদ্বোধিত করেছিল। কোন ধরনের মরমিয়া সত্যানুভব থাকলেও তা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।

এই ধরনের আরও বহু গল্প প্রাচীন দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে—অগ্নি, প্লাবন, মানুষের অকৃতজ্ঞতা, দেবতাদের

মিরোষ প্রভৃতি নানা কাহিনীর অবতারণাতে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় এই যে, একটি আদিম বিশৃঙ্খলাজাতীয় তত্ত্বে এরাও বিশ্বাস করত। এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে এক এক স্থানে এক এক ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। তবে দক্ষিণ আমেরিকার সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে দার্শনিক মানসিকতার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে লক্ষণীয়। শুধুমাত্র কুইচিদের সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার ধারা লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ লোক-গাথাই সত্যের একটা বিকৃত চিত্রায়ণ মাত্র। তবে ধর্মবোধ দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে সহজে তাকে মন থেকে মুছে ফেলাও যায় না।

কোরাণে কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার মহাশূন্যতারূপী। যার মধ্যে প্রমাণাতীতভাবে মহামানসক্রিয়া রয়েছে। ঈশ্বর ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের তুরীয়াতীত অবস্থার মত। যার নিচে Pulsating Void-রূপী দেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এই জন্যই তেজোময় দেশকে ঈশ্বরের সিংহাসনের নিচে স্থাপন করা হয়েছে। এই তেজময় দে[illegible] থেকেই অন্ধকাররূপী শক্তি ও প্লাজমিক জাতীয় মেঘের অর্থাৎ নীহা[illegible] পুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল। এই অন্ধকার ও প্লাজমা থেকেই জগতের উদ্ভ[illegible] এবং স্থূল সলিলের প্রকাশ অর্থাৎ সাগর। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই স্থূল সলিলের বিরাট বিস্তারের উপর ধূম্রাকৃতি মেঘপুঞ্জ ভাসমান ছিল। ধীরে ধীরে সাগরের জল শুকাতে থাকে এবং মৃত্তিকা দেখা দেয়। এখানে পার্থিব জলমণ্ডলের উপর ভূখণ্ডের আবির্ভাবের কথাই বলা হয়েছে। সাগরীয় ধূম্রপুঞ্জ উর্ধ্বগামী হয়ে আকাশে ভাসমান হয়। কোরাণের মতে আকাশের সৃষ্টি হয়েছিল বৃহস্পতিবার। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব হয় শুক্রবার। এই দিন সন্ধ্যাতেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঈশ্বর অনন্ত। তাঁর পূর্বে আর কেউ নেই। তাঁর সম্রাটীয় আসন দেশের (Pulsating Void) উপর স্থাপিত। এরপর ঈশ্বর সৃষ্টির নানা স্তর ও ভূখণ্ড অর্থাৎ স্থূলজগৎ সৃষ্টি করেন। নিজের স্মৃতিতে সব কিছুকেই তিনি ধরে রাখেন। উজ্জ্বল রত্নসমূহ থেকে দেবদূতদের সৃষ্টি করা হয়। নির্ধূম অগ্নি থেকে তৈরি করা হয় জিনদের। মাটি অর্থাৎ কর্দম থেকে তৈরি করা হয় আদমকে। ঈশ্বর যখন স্বর্গে আদমকে সৃষ্টি করেন শয়তান এসে তাকে দেখে যায়। আদমকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এই মানব ক্ষুধার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

কোরাণে বলা হয়েছে, মৃত্তিকাকে চাদরের মত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভূতল সমতল হতে বাধ্য। বেহেস্ত আছে সাতটি। এগুলি একটি অপরটির উপর স্থাপিত। মৃত্তিকার স্তরও সাতটি, একটির নিচে আর একটি এমনি করে। এই নির্মাণকার্য অত্যন্ত নিভুর্লভাবে করা হয়েছে। সাতটি একের পর এক সজ্জিত মৃত্তিকা স্তর ঠিক স্থায়ী ছিল না বলে ঈশ্বর এর নিচে

নির্ভর করার মত কয়েকটি জিনিষ তৈরি করেন। সর্বপ্রথম তিনি বৃহৎ এক দেবদূতকে মাটির নিচে গিয়ে পৃথিবীকে কাঁধে ধারণ করতে বলেন। এ ধরনের চিন্তা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতেও ছিল। বাসুকীর ফণা এবং বরাহের দন্তে পৃথিবী ধারণ করে রাখা কোরাণের এই বর্ণনারই সমান। এই বৃহৎ দেবদূতের পায়ের নিচে ঈশ্বর চুনিপাথরের ভিত্ তৈরি করে দেন। এই চুনিপাথরে মধ্যে ৭০০০ ছিদ্র ছিল। প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়ে এক একটি সমুদ্র নির্গত হয়। কিন্তু এই পাথরের কোন ভিত্ ছিল না। ফলে ঈশ্বর বিরাট এক বৃষ তৈরি করে তার উপর পাথর রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বৃষের চার হাজার চক্ষু ছিল। অনুরূপ আরো অনেক কিছু ছিল। চুনি পাথরকে নিজের শৃঙ্গের উপর সে ধারণ করে রাখে। এই বৃষের পায়ের নিচে বেহেমেং নামে বিরাট এক মৎস্য রাখেন। এর নিচে জলের ব্যবস্থা করেন। এই জলের নিচে স্থাপন করেন অন্ধকার। তবে সাধারণ বিশ্বাস, এখানে আছে নরক, যে নরকের আছে সাতটি স্তর। ঊর্ধ্বেও এমন সাতটি স্তর আছে যার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে স্বর্গ। কারো কারো মতে এই স্বর্গ আরও উপরে। তবে এ ধরনের কল্পনা Sphere-কে চিন্তা করেই কিনা কে জানে। হয়তো সূক্ষ্ম এ ধরনের স্তরের অবস্থান আছেই। কিন্তু মরমিয়া দ্রষ্টা ছাড়া এ-সত্যের যথার্থতা নিরূপণ করা সহজ নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে একে মিলিয়েও নেওয়া যেতে পারে। তবে বিজ্ঞানও কি সত্যকে যথার্থভাবে ধরতে পেরেছে? স্থূল পার্থিব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও সর্বত্রই সে সফল হয়েছে এমন বলা যায় না।

রোমানরা একদিন সারা বিশ্বে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু বিশ্বরহস্য উন্মোচনে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে অনেক পরে। রোমান চিন্তাধারার উপর গ্রীসের প্রভাব পড়ার পর তবেই বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ জন্মে। তবে সেই জন্য যে গ্রীসের প্রভাব পড়ার আগে রোমানদের মধ্যে বিশ্ব-সৃষ্টি সম্পর্কে কোনই আগ্রহ ছিল না তা নয়।

প্রাচীন রোমানরা বিশ্বসৃষ্টির উৎস হিসাবে তাদের দেবতা জনুসকেই একমাত্র উৎস বলে মনে করত। রোমান দেবদেবীর মধ্যে এই জনুস খুবই প্রাচীন। সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা জুপিটারের সঙ্গে তিনি নিকট সম্পর্কে যুক্ত। সময় সৃষ্ট জীবদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম। ফলে সময়ের বুকে যে-সব সৃষ্টি হয়েছে তাদের উৎস হিসাবে জনুসকেই ধরা যেতে পারে। সেই হিসাবে জনুসকে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম মনুষ্যাকৃতি দেবতা বলে ভাবা যেতে পারে। তবে মহাবৈশ্বিক কোন্ তত্ত্বের তিনি যে প্রতীক তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। কেউ ভাবতেন, তিনি হলেন সূর্যের প্রতীক। আরও প্রাচীন মতে তিনি হলেন সূর্যের প্রতীক। আবার আরও প্রাচীন মতে তিনি হলেন স্বর্গেরই ব্যক্তিরূপ মাত্র। প্রাচীন উট্রাসকানরা তাঁকে সর্বোচ্চ দেবতার মর্যাদা দিতেন। স্বর্গের প্রতীক হিসাবে তিনি অনেকটা আমাদের ভগবান বিষ্ণুর মত। বিষ্ণুও

আকাশেরই প্রতীক মাত্র। দ্রাবিড় শব্দ 'বিন্' আকাশ থেকে তিনি বিষ্ণু নামে পরিচিত। আর্যরা তাঁকে মনে করতেন স্বয়ংপ্রকাশ।

প্রাচীন উট্টাসকানদের যে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পুরাণকাহিনী আছে সেখানে বিশ্বসৃষ্টির নির্ভেজাল রোমক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আদি আকাশ অর্থাৎ ব্যোম থেকে জগৎসৃষ্টির প্রথমে সাগর বিভক্ত হয়ে যায়। আর এই সাগর থেকেই ধরণীর উদ্ভব হয়। ব্যোমকে প্রাচীন রোমানরা স্বর্গ হিসেবে কল্পনা করত। জনুস ছিলেন এই স্বর্গের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত। এট্রুরিয়াতে তাকে এই জন্য স্বর্গীয় দীপ্তি হিসাবেও ভাবা হত, অর্থাৎ জ্যোতি—যে জন্য ঈশ্বরকে আমাদের দেশে জ্যোতির্ময় নামে অভিহিত করা হয়।

জনুসের এই চরিত্র লক্ষ্য করে মনে হয় প্রাচীন রোমানরা তাঁকে জগৎ-সৃষ্টির মূল উৎস বলে ভাবতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করত না।

পুরাণ কাহিনীর পরে রোমান চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য বিস্তার করে কবিতা। ওভিডের কাব্যিক চিন্তায় বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে নির্ভেজাল রোমক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বলেই মনে হয়। ওভিডে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছে যে, জগৎ আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে ছিল একটা বিরাট রকমের বিশৃঙ্খলা। গ্রীসে হেসিয়ডে এই আদি বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রকে যেমন মহাশূন্যতা বলে কল্পনা করা হয়েছিল ওভিডে তেমন করা হয়নি। ওভিডে দেশ (space)-কে সৃষ্টির মৌল উপাদানপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল যাকে বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Pulsating Void। ভারতীয় চিন্তাতে ব্রহ্মন অর্থাৎ শক্তিদ্বারা সম্প্রসারমান দেশ। তবে এই মৌল উপাদানগুলির অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের কোন আকৃতি ছিল না। এই উপাদানগুলি ইতস্তত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল—যাকেই বলা হয়েছে বিশৃঙ্খলা বা Cosmic Chaos. কিন্তু কোন এক সময়ে কোন দেবতা সৃষ্টির এই মৌল উপাদানগুলিতে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে দেন বা এই মৌল উপাদানগুলিতে যে স্বাভাবিক চরিত্র ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল সেই চরিত্রকে জাগরিত করেন। ফলে নানা বিচিত্র অণু পরমাণু—যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন চারিত্রিক ঐক্য ছিল না তারা পরস্পর পরস্পর থেকে সরে যায় এবং সহধর্মী মৌল উপাদানগুলির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। অণু-পরমাণুগুলি যে যার নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়। তখন দেশ থেকে অগ্নি নির্গত হয়। এর নিচে হাওয়া বইতে থাকে। তার নিচে পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটে। জল ধরিত্রীকে ঘিরে আবর্তন শুরু করে দেয়। পৃথিবী তখনও তারলিক অবস্থায় ছিল। তা থেকে জনুস গোলকাকার পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ধীরে ধীরে সাগর প্রস্রবণ, হ্রদ, কর্দমাক্ত ভূমি, নদনদী, সমতল ভূমি, উপত্যকা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদির উদ্ভব হয়। জনুস ব্যোম থেকে বায়ুকে বিচ্ছিন্ন করেন। মেঘের আকাশ তৈরি হয়। হাওয়া ঝঞ্ঝারূপে দেখা দেয়। এই ভাসমান মেঘ সম্ভবত Plasmic Cloud যা থেকে তৈরি হয় নক্ষত্রপুঞ্জ। এরা আকাশের চাদরে

ঝিলমিল করে হাসতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব হতে আরম্ভ করে। মাছ, পাখি, পশুকুল এবং সর্বশেষে মানুষ।

সৃষ্টির মৌল উপাদানগুলির বিকাশ হয়েছে তার আন্তশক্তির উজ্জীবন প্রয়াসের জন্য। কেউ কেউ এই মৌল উপাদানগুলিকেই জনুস বলে উল্লেখ করেছেন। এদের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা পড়লে একটা কথাই মনে হয়, আদি উপাদানগুলি কোথাও একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে স্ফুরণের আবেগে টগবগ করছিল। ঠিক এমনতর ধারণাই বর্তমান অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে করা হয়েছে। যেখানে মনে করা হয়েছে যে, আদিতে দেশের কোন এক অংশে মৌল উপাদানগুলি একত্রে ঘন সন্নিবেশিত হয়ে ছিল অর্থাৎ 'Concentrated Masses' অবস্থায় ছিল। বলা হয়েছে, আপন স্বাভাবিক চরিত্রের জন্যই এই মৌল উপাদানগুলি বিপরীত উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আপন এই স্বভাব হল ঘনীভূত বস্তুপুঞ্জের আভ্যন্তরিণ মহাকর্ষের প্রবল টানে নিষ্পেষিত হওয়া অর্থাৎ Compressed হওয়া—, যে কম্প্রেসনের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে সৃষ্টি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ক্ষেত্রচ্যুত হয়ে প্রবল বেগে দেশ ও সময় সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং আজও যাচ্ছে। এই দেশ ও সময়ের সঙ্গে প্রথম ফুটে উঠেছিল Plasmic মেঘ বা নীহারিকাপুঞ্জাদি। এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল গ্রহনক্ষত্রাদি বস্তুজগতের। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে এ ধরনের চিন্তা গ্রীক প্রভাবজাত চিন্তা নয়। ইটালীর আদি অধিবাসী উট্রাসকানদের চিন্তা প্রসূত।

এই ধরনের চিন্তা শুধু ওভিডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভার্জিলের উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিই সৃষ্টিরূপে ফুটে বেরিয়েছে—ভার্জিলেও এ ধরনের চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুর এই আন্তশক্তিকেই ভার্জিল আত্মা হিসাবে দেখেছিলেন।

রোমানরা তো প্রাচীন কালেই বিরাট এক সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে একটা উন্নত চিন্তাধারার প্রকাশ পাওয়া তেমন ব্যাপার নয়। কিন্তু আশ্চর্য হওয়া যায় তখনই যখন পলিনেশিয়ার মত বর্বরদের দেশেও বিশ্বসৃষ্টিকল্পনাতে বহু প্রাচীন সভ্যতার বিশ্বসৃষ্টিচিন্তার সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায়।

পলিনেশীয়রা মনে করে যে, সৃষ্টির মূলে ছিলেন একজনই দেবতা, যার নাম—টঙ্গলোয়া। তিনি ছিলেন আকাশের দেবতা। অর্থাৎ দেশ (space) নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। কোন কোন দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য তাঁর নামকরণ করা হয়েছে তারোয়া। নিউজিল্যাণ্ডে এঁকে ডাকা হয় টঙ্গরোয়া এবং হাওয়াইতে কনলোয়া নামে। এই দেবতা স্বর্গে অর্থাৎ ব্যোমে পাখির আকারে বাস করতেন বলে বিশ্বাস ছিল। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে এর গতিশক্তিকে বোঝায়। এই জন্য অনেক সময় এঁকে বায়ুদেবতা হিসাবেও ভাবা হত। তাঁর স্ত্রী হিসাবে ধরা

হত একটি বিরাট পাহাড়কে। সম্ভবত এই পাহাড়ই আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের concentrated masses এই পাহাড়ের নাম ছিল ও-টে-পাপা। এই দুয়ের মিলন থেকেই দেবদেবী, গ্রহ নক্ষত্র বায়ু সাগর প্রভৃতির জন্ম। এই দেবতাদের থেকেই মানুষের উদ্ভব। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন টঙ্গলোয়া নিজেই লাল মাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করেছিলেন।

টঙ্গলোয়ার আরও স্ত্রী ছিলেন। তার একজনের নাম হিনা। কেউ তাকে উল্লেখ করেছেন স্ত্রী হিসেবে, কেউ কন্যা হিসেবে। তাদের মিলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে অদ্ভুতভাবে বেদের Primordial insest-এর গন্ধ পাওয়া যায়—অর্থাৎ দক্ষপ্রজাপতির গন্ধ পাওয়া যায়। এবং এই ধরনের চিন্তার পেছনে যে বিকৃত যৌনতা রয়েছে তা নয়, রয়েছে পুরুষ (শূন্যতা) থেকে উদ্ভূত শক্তির সঙ্গে পুরুষের মিলনাত্মক কাহিনী—যে মিলন থেকে সৃষ্টির প্রকাশ। এ চিন্তা একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও রূপক। শুধু মরমিয়া রহস্যময়তায় জড়িত এই যা।

সৃষ্টি সম্পর্কে একটু ভিন্ন ধরনের গল্পও আছে এখানে। এখানে স্বর্গস্রষ্টা দেবতা রইতুবুকে সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়েছে। রইতুবু ছিলেন টঙ্গলোয়ার পুত্র। পৃথিবীকে অনেকে টঙ্গলোয়ার বহিরঙ্গ হিসাবে কল্পনা করেছে। এমন ধারণাও আছে, যেখানে রইবুতুক ঝিনুকে বাস করেন—এইভাবে দেখানো হয়েছে। মাঝে মাঝে এই ঝিনুক বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে খোলস দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে। আশ্চর্য! এতে যেমন রয়েছে Big Bang-এর চিন্তা—তেমনই Steady State তত্ত্বও।

Cosmic Egg-এর ধারণাও এদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল না। হাওয়াই তাহিতি প্রভৃতি দ্বীপে টঙ্গলোয়াকে পাখিরূপে দেখানো হয়েছে—যে পাখি এই ডিমের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত এই পাখি ডিম ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। ডিম দু-টুকরো হয়ে যায়। এক টুকরো তৈরি করে স্বর্গ আর এক টুকরো মর্ত্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি দিয়ে দ্বীপপুঞ্জগুলি তৈরি হয়। এ গল্পের মধ্যে Big Bang-এর গন্ধ খুঁজে পাওয়া মোটেও কষ্টকর নয়।

নিউজিল্যান্ডেও গল্প আছে যে বিরাট এক পাখি জলের উপর ডিম পেরেছিল। সেই ডিম থেকেই মানুষের জন্ম। অপর পক্ষে পলিনেশিয়াতে গল্প আছে যে জগৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে টঙ্গলোয়াকে এতটাই কষ্ট করতে হয়েছিল যে, তার গা থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। সেই ঘাম থেকেই সমুদ্র তৈরি হয়। এ ধরনের চিন্তা সম্ভবত সমুদ্রের জলের নোনা স্বাদ থেকে এসেছিল। অপরপক্ষে দ্বীপসমূহ সৃষ্টি হবার কারণ জল থেকে মাটি ওঠার সময় হঠাৎ মাটি ভেঙে ভেঙে যাওয়া। ফলে একটানা মহাদেশ সৃষ্টি হবার পরিবর্তে ভাঙা ভাঙা ভূখণ্ড অর্থাৎ দ্বীপের আবির্ভাব ঘটে। এছাড়া আরও বিচিত্র ধরনের গল্প আছে যে গুলি অজ্ঞ মানুষের লোক-গাথা মাত্র। কিন্তু যখন এ ধরনের গল্প কয় হয় যে

রইয়াটিয়া নামে একটি দানবাকৃতি মাছ স্বর্গ ও মর্ত্যকে এক করে রেখেছিল এবং সূর্যদেবতা যখন মউই সেই মাছকে হত্যা করার পর আকাশ উপরে উঠে যাবার সুযোগ পায় তখন ব্ল্যাকহোলের মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির কথা মনে পড়লে সেটা তেমন হাসির খোরাক হয়ে ওঠে না। এই মউই দেবতার কাঁধে ভর করেই পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নড়াচড়া করলেই ভূমিকম্প হয়। এধরনের বিশ্বাস ভারতবর্ষেও আছে। এইসব হাস্যকর কল্পনার পাশেই রূপকের অন্তরালে মাঝে-মাঝেই এমন সব সত্য লুকিয়ে আছে যেগুলোকে বর্তমান জ্ঞানের আলোয় বিচার করে দেখলে সত্যি সত্যি সত্যদ্রষ্টা ঋষির দর্শনের কথা মনে পড়ে যাবে। এই সব মরমিয়া বক্তব্য সত্যজ্ঞান জাত। বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে পরিচয় হলে এই মরমিয়া সত্যও তার পাপড়ি খুলে দেয়।

টিউটন জাতীয় মানুষের মধ্যে রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়, জার্মান, ডাচ, অ্যাংলো স্যাকসন প্রভৃতি জাতি। তবে জার্মানদের কাছ থেকে টিউটনদের বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ভাল করে কিছু জানার নেই। টিউটনরা মনে করত সৃষ্টির মৌল উপাদান রয়েছে অগ্নি, জল ও নুনের মধ্যে। ভোলুস্প নামক কাব্য থেকেই মূলত এদের বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণার কথা জানা যায়। বক্তব্য হল এই যে, আদি কালে সাগর, মৃত্তিকা, ঢেউ, আকাশ কিছুই ছিল না। ছিল আদিম এক বিশৃঙ্খলা। শ্যামলিমার কোন স্পর্শই ছিলনা কোথাও, অর্থাৎ প্রাণের সামান্য মাত্র লক্ষণ। বোর-দেবের পুত্র—যাদের মহান দেবতা মিধগর্ধ রূপদান করেছিলেন, তাঁরা আকাশের খিলান তৈরি করার আগে সূর্য দক্ষিণ দিক থেকে আলো দিত। একটি পাহাড়ের উপর থেকে সে আলো দিত। পৃথিবীও সেখান থেকে এসেছিল। এসেছিল সবুজ লতাগুল্ম নিয়ে।

চন্দ্রের চিরসঙ্গী দক্ষিণ-সূর্যের ডান হাত স্বর্গীয় অশ্বসমূহের (সূর্যের সাতরঙ) দিকে প্রসারিত ছিল। তবে সূর্য যথার্থই জানত না যে তার সঠিক বাসস্থান কোথায়। চন্দ্র জানত না তার ক্ষমতা কি; নক্ষত্রেরা জানত না তারা দাঁড়াবে কোথায়। ভোলুস্পের এই কবিতা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সৃষ্টির পূর্বে রাক্ষুসে ক্ষুধার মধ্যে (Blackhole) একটা আদি বিশৃঙ্খলা ছিল। আকাশ উত্তরে ছিল শীতার্ত হয়ে। সূর্য ছিল দক্ষিণে। এই শীতার্ত আকাশের অতলস্পর্শী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে বারটি বিষাক্ত নদী। দক্ষিণ-সূর্যের তাপের সঙ্গে মিলনের ফলে তা থেকে প্রকাশ পায় প্রাণ। এই প্রাণশক্তি য্মির নামে এক দৈত্যাকার মনুষ্যাকৃতি প্রাণের জন্ম দেয়। তার থেকেই জন্ম নেয় দানবের দল। শৈত্য ও তাপের এই মিলন থেকেই জন্ম নেয় অউধুম্লা নামে এক গাভী (ভারতীয় বৈষ্ণবদের 'গো' বা বিশ্বপ্রকৃতি?)। এই গাভীই তার দুগ্ধ দান করে বাঁচিয়ে রাখে য্মিরকে। এই গাভী নিজে প্রাণরক্ষা করে লবণাক্ত প্রস্তর ভক্ষণ করে। এই গাভীর সঙ্গে লবণাক্ত প্রস্তরখণ্ডের যোগাযোগ হওয়াতে বুরি নামে এক প্রাণীর উদ্ভব হয়। তার সঙ্গে মিলন হয় য্মিরের,

কন্যা বেস্টলার। বেস্টলা ছিল জলদানব মিমিরের ভগ্নি। বেস্টলা ও বুরির মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নেয় তার নাম—বোর। বোরের সন্তানরূপে আসে ওডিন, ভিলি ও ভে। সর্বশ্রেষ্ঠ ওডিন। তিনিই দেবতাদের জনক। ওডিন ও তাঁর ভাইয়েরা য়্মিরকে হত্যা করে। নিজের রক্তের প্লাবনে অন্য সব দানবকে ডুবিয়ে দিয়ে য়্মির হারিয়ে যান। কিন্তু তাঁর একজন বংশধর পালিয়ে যেতে পারে। তার নাম বেরগেলমির। সে নতুন দৈত্যকুলের জন্ম দেয়। অন্ধকার শূন্যতা য়্মিরের দেহে জগৎরূপে ভেসে ওঠে। কারণসলিলে নারায়ণের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের পর মধু ও কৈটভ নিহত হলে তাদের দেহ থেকেও এমনই ভাবে ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। য়্মিরের মাংস থেকে হয় মৃত্তিকা, রক্ত থেকে নদ-নদী হ্রদ সাগর ইত্যাদি। দাঁত ও ছোট ছোট হাড় থেকে হয় ছোট ছোট পাহাড় পাথর ইত্যাদি। বড় বড় হাড় থেকে হয় পর্বত। চোখের ভুরু থেকে গজায় অরণ্য। তার বাইরে থাকে শুধু সমুদ্র। য়্মিরের করোটি থেকে তৈরি হয় আকাশ। মস্তিষ্কস্নায়ু থেকে নীহারিকাপুঞ্জাদি, এবং ভাসমান মেঘ অর্থাৎ Intergalactic cloud.

এর পরের সৃষ্টিকার্যে হাত দেন ইসির নামে ঊর্ধ্ব আকাশের দেবতাগণ। তাঁরাই সৃষ্টি করেন মানুষ। রহস্যময় অস্ক ও এমব্লা গাছ থেকে তারা নর ও নারীযুগল সৃষ্টি করেন। বোর-দেবের সন্তানেরা সমুদ্রোপকূলে হাঁটতে হাঁটতে তাদের দেখতে পেয়ে সাগর তীরে স্থাপন করেন। দেবতা ওডিন প্রাণ প্রদান করেন তাদের মধ্যে। প্রাণের সঙ্গে স্থাপন করেন ইন্দ্রিয়সমূহ।

টিউটনিক সৃষ্টিতত্ত্বে অরণ্যের একটা বিরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যের এই বৃক্ষসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল ইগদ্রাসিল বৃক্ষ। এই হল জীবন বৃক্ষ। এই বৃক্ষ হল প্রকৃতপক্ষে জগৎবৃক্ষ—ভগবতগীতার উল্টো অশত্থবৃক্ষের মত।

টিউটনদের সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কাহিনীর মধ্য থেকে যদি কোন দার্শনিক তত্ত্ব বের করে আনার প্রয়াস চলে তাহলে দেখা যাবে যে সৃষ্টির পূর্বে যে মৌল বস্তুসত্তা ছিল তার মধ্যে ছিল অদ্ভুত ধরনের এক বিশৃঙ্খলা। তারই মধ্যে শৈত্য ও তাপের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে আদি প্রাণসত্তার উদয় হয়। এই আদিপর্বে যে প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল সে প্রাণী ছিল দৈত্যাকার। এদের প্রজনন ক্ষমতাও ছিল। এ থেকেই য়্মির জাতীয় জীবের উদ্ভব হয়েছিল। অউধুম্লা, অস্ক বৃক্ষ; এম্বাসী বৃক্ষ প্রভৃতি হল নতুন জীবকোষের প্রতীক —যা থেকে দেবতা ও মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এদের উদ্ভব প্রকৃতির বাইরে নয় ভেতরেই হয়েছিল। এবং এরা প্রকৃতির নিয়মের অধীনেই পড়েছিল। দেবতারাও প্রাকৃত আইনের বাইরে যেতে পারে নি। ফলে এটা প্রমাণিত যে দেবতারাও মৃত্যুহীন নন। প্রকৃতি সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি দেবতাদের দ্বারা প্রাকৃত নিয়মের মধ্যেই হয়। বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার

জন্য তাদের নিচতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এই ভাবেই অদ্ভুত একটা সামগ্রিকতা নিয়ে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। এই ভাবেই চলবে যতদিন পর্যন্ত না একটা সংগ্রামের পর নতুন সুখী ও আনন্দময় জগতের উদ্ভব ঘটবে।

আশ্চর্য! প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতায়, এমন কি অসভ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও একটি চিন্তার প্রকাশ খুব স্পষ্ট করেই লক্ষ্য করার মত, তা হল এই যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাবিশ্বে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল। সৃষ্টির পূর্বে সবই ছিল নিবিড় অন্ধকারে ভরা। সর্বত্রই প্রায় একটি ডিম্বাকৃতি আদিম গোলকের কল্পনা আছে, যা থেকেই নাকি বেরিয়ে এসেছিল সৃষ্টি। যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার ব্ল্যাকহোল তত্ত্বের সঙ্গে এই চিন্তার অপূর্ব মিল রয়েছে। ব্ল্যাকহোলও বৃত্তাকার বা গোলাকার হতে বাধ্য। তা অদৃশ্য। এই অদৃশ্য অন্ধকারের মধ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সৃষ্টির পূর্বে এখানে দেশও নেই কালও নেই।

ব্ল্যাকহোলকে যদি ভাষা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয় তা হলে বলতে হবে যে, দেশের বুননের মধ্যে এ হল এক ধরনের গর্ত—যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে কোন নক্ষত্র নিজের ভারে নিজেই তলিয়ে যাবার ফলে। এই গর্তের এমন বিপুল অভিকর্ষ যে, তার টানের মধ্যে পড়লে যে-কোন বস্তু, পার্শ্বস্থ দেশ, (pulsating void) সময়, আলো সবই হারিয়ে যায়। তার লৌহবেষ্টনীর বাইরে আর কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। এখানে ঊর্ধ্ব, অধঃ, দক্ষিণ, বাম কিছুই নেই।

পৃথিবীতে আমরা সময়ের স্রোতেই হোক বা তার হাত ধরেই হোক সামনের দিকে এগিয়ে চলি। কিন্তু ব্ল্যাকহোলের ভেতরে পড়লে এমন করে আমরা নিষ্পেষিত হয়ে যাব যে, আমাদের অস্তিত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না। ব্ল্যাকহোলের চারপাশেও একটা ফাঁকা ঘের আছে যা কয়েক মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। এখানেও দেশ (space) বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। দেশ না থাকার অর্থ কালও নেই। কারণ কালের গতি থেকেই দেশের উদ্ভব। ব্ল্যাকহোলের অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে পড়লে কিছুই আর বেরিয়ে আসতে পারে না।

এই ব্ল্যাকহোলের চিন্তা বিংশ শতাব্দীর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৭৯৭ খ্রীঃ) ফরাসী বৈজ্ঞানিক Pierre Laplace এই ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব অনুমান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, প্রচণ্ড আলোসম্পন্ন তারকা আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতার মধ্যে নাও পড়তে পারে। একথা আজ সত্য প্রমাণিত। একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির ঊর্ধ্বে ফ্রিকোয়েন্সি হলে আলো আর আমাদের চোখে দৃষ্ট নয়, শব্দও তেমনই একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির ঊর্ধ্বে বা নিম্নে আমাদের স্থূলকর্ণে শ্রুত নয়।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির তত্ত্ব থেকেই Laplace এই তত্ত্বে এসেছিলেন

যে, কোন নক্ষত্রের ঘনত্ব যদি আমাদের পৃথিবীর ঘনত্বের মতও হয় তবে তার মাধ্যাকর্ষীয় শক্তি এত প্রবল হবে যে, তা থেকে আর আলো বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে Laplace-এর বড় ভুল ছিল এই যে, তিনি জানতে পারেন নি যে, পৃথিবীর ঘনত্বের মত ঘনত্ব নিয়ে কোন নক্ষত্র দেশে অবস্থান করতে পারে না। ব্ল্যাকহোল প্রচণ্ড কোন বিস্ফোরণজাত নয়। বরং আন্তআকর্ষীয় অন্ধকার মাত্র। এই অন্ধকারই হল গর্ত যাতে বস্তুপুঞ্জ এমন ভাবে আকর্ষিত হয়ে ঢুকে পড়ে যে, আন্তআকর্ষণের চাপে কল্পনাতীত ভাবে ঘনীভূত হয়ে যায়। দেশ ও সময় সাধারণভাবে সমতল। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোন ভারি বস্তুসত্তার উদয় হয় তবে তার চারদিকে দেশ ও সময় বেঁকে যায়। তবে এই বস্তুপুঞ্জের আন্তঅভিকর্ষ যদি প্রচণ্ড রকমের হয় তাহলে শূন্যতাকে দোঁকেচুরে দুমড়ে, সময়কে নুইয়ে দিয়ে দেশের বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করতে পারে যে কৃষ্ণগহ্বর তার চারপাশের দেশ ও সময়কেও তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

প্রথম দিকে এই ব্ল্যাকহোল তত্ত্ব তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও বিংশ শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে রেডিও-অ্যাস্ট্রোনমি আমাদের বিশ্বের প্রান্তভাগে আশ্চর্য এক জিনিস দেখতে পায়। এর ফলেই আবার ব্ল্যাকহোল তত্ত্ব নিয়ে নতুন জল্পনা শুরু হয়।

রেডিও ও X-Ray পদ্ধতি ব্যবহার করে জ্যোতির্বিদরা লক্ষ্য করতে পারেন যে, বিশ্বের প্রান্তভাগে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা থেকে প্রচণ্ড রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে—কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না। তত্ত্বগত ভাবে ব্ল্যাকহোল নিজের ভেতর থেকে কোন আলো বিকিরিত করতে পারে না। তাহলে এই বিকিরণ কিসের? জানা গেল দেশের বুকে যে গ্যাসিয় পদার্থ রয়েছে কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশ থেকে সেই বাষ্পসমূহ প্রচণ্ডভাবে কোন স্থান থেকে আহরিত হয়ে ঘূর্ণায়মানভাবে তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি যে প্রচণ্ড আকর্ষীশক্তি রয়েছে, সেই শক্তিতে আকর্ষিত হয়ে সেই বাষ্প উত্তপ্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠে এই রশ্মিবিকিরণ করছে। হয়তো দূরবর্তী কোন নক্ষত্র থেকেই সে এই বাষ্প টেনে নিয়ে আসছে। Quasars বা নক্ষত্রের সমচরিত্র কোন বিষয়ই সম্ভবত এই কৃষ্ণ-গহ্বর। অগণিত নক্ষত্রশোভিত আমাদের এই ছায়াপথের plasmic cloud জাতীয় গ্যাসই হয়তো সে এইভাবে টেনে নিচ্ছে।

ব্ল্যাকহোল চারপাশের এই সব জিনিষ টেনে নিয়ে যে স্থির হয়ে থাকছে তা নয়, বরং নক্ষত্র অপেক্ষাও প্রচণ্ডবেগে ঘুরছে। ঘুরছে আপন অন্তরের উন্মাদ অভিকর্ষের টানেই। ব্ল্যাকহোল যে ঘুরছে সেটা ধরিয়ে দিয়েছেন নিউজিল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক, যার নাম Roy Kerr. এই ঘূর্ণনের জন্যই ব্ল্যাকহোলের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাষ্পপুঞ্জ ঘূর্ণায়মান হয়।

কোন নক্ষত্র আপন আন্তঅভিকর্ষে নিজের মধ্যেই অতি ক্ষুদ্রকায় হয়ে ডুবে

গেলেও তার চারপাশে দেশ ডুবে যাবে না। ভাঙাচোড়া দুমড়ানোভাবে এক বিচিত্র অবস্থায় থাকবে। কেউ কেউ এই ডুবন্ত নক্ষত্র থেকে আলো বিকিরিত হওয়া সম্ভব বলে মনে করলেও রোজার পেনরোজ বলেছেন যে, তা সম্ভব নয়। কারণ, এই বিন্দুপ্রমাণ নক্ষত্রের চারদিকে এমন একটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে যায় যে, সে কোন আলোকেই বাইরে আসতে দেয় না।

স্টীফেন হকিং অপরপক্ষে দেখিয়েছেন যে, কোন কৃষ্ণগহ্বর থাকলেও তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। তবে তা দ্বারা আদি কৃষ্ণগহ্বরের যে বড় রকমের কোন চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে তা নয়। কোন ব্ল্যাকহোল যদি ছোট একটা পাহাড়ের মত আকৃতি নিয়ে আমাদের এই জগৎ সৃষ্টির সময় সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তবে জ্যোতির্বিদরা তেমন কোন প্রমাণ খুঁজে পাননি। তাই বলে হকিংয়ের তত্ত্ব যে তার মূল্য হারিয়ে ফেলেছে তা নয়। শুধু একথাটাই মনে রাখতে হবে যে, জগৎ-উদ্ভবের প্রারম্ভে এই ধরনের কিছু ব্ল্যাকহোল ছিল। এবং বর্তমানে এ ধারণা রীতিমত স্বীকৃত যে, প্রচণ্ড ওজনের বড় বড় নক্ষত্র এক সময় আপন আত্ম অভিকর্ষে নিজেকেই নিজে গিলে ফেলে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। কৃষ্ণগহ্বরের পাশাপাশি উত্তেজিত বাষ্পসমূহই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নতুন নক্ষত্রের জন্ম দিচ্ছে।

এই যে নবজাতক নক্ষত্র তারা চারদিকে বাষ্পসমূহকে অর্থাৎ নীহারিকাকে আলোকিত করে। ওরিয়ন নেবুলাতে ঠিক এমনটিই লক্ষ্য করা গেছে। এই যে বাষ্পীয় নীহারিকা এক সময় তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন স্বতন্ত্র তারকা-সমূহের জন্ম দেবে। এই ভাবে বহু বহুদিন আগে (4,600 million years) আমাদের সূর্যেরও জন্ম হয়েছিল।

নক্ষত্র যখন জীবন্ত প্রতীয়মান হয় তখন এর কেন্দ্রস্থল একটি ক্ষিপ্র অগ্নিচুল্লির মত কাজ করে। এই অগ্নিচুল্লিতে হাইড্রোজেন অনবরত হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। হাইড্রোজেন বোমা থেকেও এই ভাবে হিলিয়াম বেরিয়ে আসে। এই তেজনিষ্ক্রমণের ফলে নক্ষত্রগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই নক্ষত্রগুলি হিলিয়ামশক্তি নিঃশেষিত হলে ভস্মে পরিণত হবে। নক্ষত্রেরও তখন রূপান্তর ঘটে যাবে। এর ভেতরটা কুঁচকে যাবে কিন্তু বাইরের আবরণ উঠবে ফুলেফেঁপে। নক্ষত্রটি আয়তনে যতটুকু ছিল তার অপেক্ষাও তখন তাকে শতগুণ বড় দেখা যাবে। যখন আমাদের এই সূর্যের হিলিয়ামও ভেতরে আটকে যাবে, সূর্যটা ফুলেফেঁপে উঠে লাল একটা দৈত্যের মত দেখাবে। সম্পূর্ণভাবে বুধ ও শুক্র গ্রহকে ঘিরে ধরবে।

কিন্তু একটি নক্ষত্র লাল হয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। শেষপর্যন্ত এর ছড়িয়ে পড়া প্রান্তিক বাষ্প সুন্দর গ্রহাকৃতি নীহারিকা তৈরি করে। অপর পক্ষে অভ্যন্তরভাগের কেন্দ্রস্থল আরো ছোট হয়ে অত্যন্ত ঘন নক্ষত্র তৈরি করে, যাকে

বলে white dwarf. এই নীহারিকা খুবই ছোট—আমাদের পৃথিবীর আকারের। তবে এটা এমন বাষ্পীয় উপাদান দিয়ে তৈরি যার ঘনত্ব পৃথিবীর জলের ঘনত্ব অপেক্ষাও বেশি।

যে নক্ষত্রগুলি ওজনে খুব ভারি, তাদের আয়ু খুব কম, কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই আভ্যন্তরিণ হাইড্রোজেন নিঃশেষিত করে ফেলে। লাল নক্ষত্রের মত এদেরও বেশ বর্ণবাহার আছে। ভারি নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগ হিলিয়ামকে নানা উপাদানে রূপান্তরিত করতে পারে, যেমন কার্বন, সিলিকন এবং বিশেষ করে লোহা। তবে এদের একদিন নিঃশেষিত হতেই হয়। এমন ভাবে একদিন তারা আন্তআকর্ষণের চাপে বিস্ফোরিত হয় যে সুপারনোভা আকারে দেখা দেয়। এ সময় সূর্য অপেক্ষাও হাজারো গুণ জ্যোতিতে এরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মজার ব্যাপার হল এই যে, সুপারনোভার প্রান্তভাগ বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়লেও অভ্যন্তরভাগ আরও ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। এর মধ্যে যে ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে তা পরস্পর একত্রে মিশে নিউট্রনের আকৃতি নেয়। নিউট্রন অণু অপেক্ষাও ছোট হবার জন্য এতে যে নিউট্রন-স্টার আত্মপ্রকাশ করে তার আকৃতি হয় white dwarf অপেক্ষাও ছোট। এর মধ্যভাগের বিস্তার মাইল পনেরর বেশি নয়। এর ঘনত্ব এত বেশী যে, নিউট্রন-স্টারের এক ফোঁটা অংশ ওজনে কয়েক হাজার টনের সমান।

অনেক নিউট্রন-স্টার অত্যন্ত দ্রুত ঘোরে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দেয় রেডিও তরঙ্গ। এই তরঙ্গ পৃথিবীতে এসেও পড়ে। রেডিও টেলিস্কোপে এই তরঙ্গ ধরা পড়লে মনে হয় দপ্ দপ্ করছে, নাড়ির অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত রক্তের ওঠানামার মত ওঠানামা করছে। এই নাড়ি বা pulse-এর মত এর বিট্ বলে একে বলে Pulsars.

এই অদ্ভুত নক্ষত্রকে সাধারণ নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান অবস্থায়ও দেখা যায়। দেখা যায় সহগামী নক্ষত্র থেকে বাষ্পীয় পদার্থ টেনে নিচ্ছে। নিউট্রন-স্টারের মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্রের টানে এই বাষ্প ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নেমে এলে ঘর্ষণে ঘর্ষণে এই বাষ্পীয় মেঘ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, এক ধরনের তাপ বিকিরণ করতে থাকে, যদিও সেই তাপ আলোর আকারে ধরা পড়ে না। এ সব দেখেই জ্যোতির্বিদেরা অনুমান করেছেন যে, black-hole-এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র অনুমান নাও হতে পারে। বর্তমানে অবশ্য ব্ল্যাক-হোল যন্ত্রের চোখেই ধরা পড়েছে।

এ সমস্ত দেখেশুনে মনে হয়, আমাদের এই মহাবিশ্বের বস্তুসমূহও একদিন ডুবে যেতে পারে। ডুবে যেতে পারে এমনভাবে যে, আর কখনও ফিরে আসার সম্ভাবনাই থাকবে না। আমাদের এই আকাশের পর্দা ছিঁড়ে, এমন কি এই কৃষ্ণগহ্বরের আভ্যন্তরিণ চাপ এড়িয়ে ভিন্নবিশ্বেও যেতে পারে। পারে যে, একথা সত্য। যোগীরা যোগে এই ভিন্নবিশ্বে অকস্মাৎ ছিট্‌কে গিয়ে পাখির

মত ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উড়তে উড়তে বিচিত্র আর এক মহাকাশ দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে পারেন। কি ভাবে যে সেই ভিন্ন বিশ্বে যাওয়া যায় যোগের সেটা মরমিয়া অনুভব মাত্র। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান তার বস্তুবাদী অভিযান চালিয়েও এই ভিন্নবিশ্বের স্বরূপ আবিষ্কার করে আমাদের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জ্যামিতিক রূপরেখা অঙ্কন করে দিচ্ছে।

আশ্চর্য মানুষের দুঃসাহস বা দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। নিজের সৌর জগৎকেই সে ভাল করে জানতে পারছে না—নিজের ছায়াপথের হদিশই তার জানা নেই, বিশ্বতো দূরস্থান—, সামান্য চন্দ্রজয় করেই তার বুকের ছাতি ফুলে হাতী হয়েছে; সে পরিকল্পনা আঁটছে, এ বিশ্ব ছাড়িয়ে ভিন্নবিশ্বে পাড়ি জমাবে। তার বিশ্বাস, আজ থেকে প্রায় ছ'শ বছর পরে মহাকাশে দুই সৌর-জগতের মধ্যবর্তী স্থানের কোনখানে মানুষ পৃথিবী থেকে হাজারখানিক বুল-ডোজার পাঠিয়ে দেবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করা—একদিন যে কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে মহাকাশচারিরা আমাদের মহাবিশ্বের সীমানা এড়িয়ে ভিন্ন বিশ্বের দেশে গিয়ে ভাসতে থাকবে। তবে এই black hole তৈরি করার জন্য তার যে বস্তুসামগ্রির প্রয়োজন হবে তার ওজন হবে আমাদের পৃথিবী গ্রহের জন্য যতটুকু বাস্তবিক উপাদান আছে তা অপেক্ষা তিন হাজার গুণ বেশি বস্তুপুঞ্জ। এই বুলডোজারগুলির অভিকর্ষক্ষেত্র বিস্তৃত হবে ১৫0,000 মাইল পর্যন্ত। আমাদের সৌরবিশ্ব ছাড়িয়ে গেলেই মহাকাশে এই বুলডোজার-গুলি এমন এক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারবে যে-ক্ষেত্র মুখ্যত লোহা, নিকেল ও হাইড্রজেন প্লাজমা সংগ্রহ করতে পারবে। এই মহাকর্ষিক ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন হবে বৈদ্যুতিক শক্তির। সেটা এই যন্ত্রযানের মুখ্য ইঞ্জিনটিই সংগ্রহ করতে পারবে। লোহা, নিকেল ও হাইড্রোজেন প্লাজমা—যা এই মহাকর্ষিক ক্ষেত্রের সামনে সংগৃহীত হবে তা লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ বস্তু-স্তম্ভ তৈরি করতে পারবে। এই যে বস্তুস্তম্ভ সেগুলিকে ঘূর্ণনের আবেগে অস্থির করে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যন্ত্রটি নিজেই। দুই নক্ষত্রের দেশ অঞ্চলে প্রতিটি আকাশযান প্রতি সেকেণ্ডে ৯৯০ গ্রাম করে বস্তুসাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে। ফলে এ ধরনের হাজার খানিক আকাশযান একত্রে মিলে প্রতি সেকেণ্ডে ৯৯০ কি. গ্রাম বস্তুসাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে। একঘন্টায় সংগ্রহ করবে ৩৫০০ টন। যে স্থান থেকে এই বস্তুর মৌল উপাদানগুলি সংগৃহীত হবে সে-স্থানের দূরত্ব হবে এক আলোকবর্ষ। কোন মহাকাশযান সেখানে পাঠানো হলে সেখানে যেতে সময় লাগবে কুড়ি বছর। এর পর ব্যাপারটা যন্ত্রগুলির কাছে সহজ হয়ে যাবে। সংগৃহীত বস্তুপুঞ্জ নিজেরাই নিজেদের আইয়নাক্ত করবে। যার ফলে তার এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে এই যন্ত্রগুলির সংগ্রহ-শক্তি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এক শতাংশ বেড়ে যাবে। কোন জিনিস যদি তার—বৃদ্ধিকে প্রতিদিন এক শতাংশ বাড়াতে পারে তাহলে

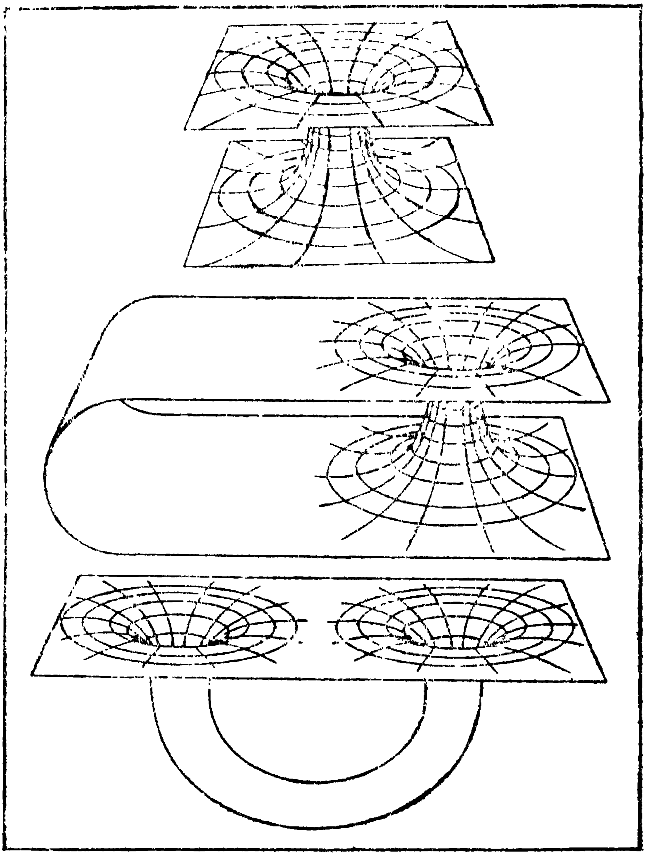
প্রতি ৭০ দিনে তার সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এই ভাবে যদি আলোর গতির সাত শতাংশ গতি নিয়ে উপরোক্তভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় তাহলে ২০ বছর প্রস্তুতিপর্বের আরও ১১ বছর পরে একটি কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করা সম্ভব হবে।

এবার এই কৃষ্ণগহ্বর যদি মহাকাশচারীকে পার হতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে? সে কি তার মহাকাশযানের উপর নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করে সরাসরি নিজেকে কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষের কাছে ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দেবে এই বিশ্বাসে যে, নিরাপদে সে এই ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বর বেয়ে নেমে যাবে? না, তা হবে না। এমন করতে গেলে কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষের চাপে সে গুঁড়িয়ে যাবে। বরং তাকে কৃষ্ণগহ্বরের বর্তুল আকৃতির কথা মনে রাখতে হবে। এই বর্তুলের ব্যাস হবে প্রায় ১১৬ মাইল। ঘূর্ণনের বেগ হবে প্রতি সেকেন্ডে এক হাজার সম্পূর্ণ বৃত্তায়ণ। এই বর্তুল-এর প্রতি অংশ প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল বেগে ঘুরতে থাকবে। এই গহ্বরের দিকে এগুবার আগে মহাকাশচারী এই গতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে।

ঘূর্ণায়মান এই বর্তুলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার পর মনে হবে উভয় চক্রই গতিহীন। এটা মনে হবে উভয়ের আপেক্ষিক গতির জন্য। এবার মহাকাশচারী তার পার্শ্বস্থ বর্তুলের প্রান্তদেশের দিকে তাকালে একটি দীর্ঘ আয়তক্ষেত্র দেখতে পাবে। এর উচ্চতা হবে প্রায় ৬৪০ গজের মত। এই আয়তক্ষেত্রই হল দেশের ভিন্ন প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হবার পথ। এই পথ কৃষ্ণগহ্বরের আভ্যন্তরিণ ও প্রান্তভাগীয় দুটি ইভেন্ট হরাইজনকে অতিক্রম করে, গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ এড়িয়ে নিরাপদে ভিন্নবিশ্বের আকাশে পৌঁছে দেবে। অবশ্য এপারের দর্শকের দৃষ্টি থেকে তারা হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে যেমন করে একটি অ্যারোপ্লেন দর্শকের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় তেমন করে। এখানে মহাকাশচারী দেশের প্রত্যক্ষ সীমানা থেকে হারিয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন আর এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হবে, যদিও দূরত্ব হিসেবে মাপতে গেলে এই দূরত্বকে মনে হবে অনেক দীর্ঘ। এ রকম মনে হবার কারণ? কৃষ্ণগহ্বরের চতুর্দিকে যে দুটি বন্ধনী রেখা আছে যাকে বলে ইভেন্ট হরাইজন, সেই ইভেন্ট হরাইজন এই দুই ইভেন্ট হরাইজনের মধ্যে ঘটেই বা কি?

সত্যি এই দুই ইভেন্ট হরাইজনের মধ্যবর্তী অঞ্চল অত্যন্তই রহস্যময়। এখানে দূরত্ব বলে কিছু নেই। অভ্যন্তরিণ ইভেন্ট হরাইজনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় মহাকাশযান যাকে অতিক্রম করবে তার নাম 'আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ'। এ হল এক সময়হীন পথ—যে পথ দুটি বিশ্বের দেশকে সংযুক্ত করেছে। এখানে ঢুকে গেলে মুহূর্তে মনে হবে—ভিন্নবিশ্বের দেশে গিয়ে উঠেছি। এখানে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে যে ভিন্নবিশ্বের আকাশে গিয়ে উপস্থিত হব তাই নয়—সময়ের গতিতে পিছনের দিকে হটতে থাকব। যথার্থভাবে বলতে গেলে

'আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ' হল এক ধরনের 'টাইম মেশিন'। সময়ের হিসেব করতে গেলে মনে হবে সম্পূর্ণই একটা উদ্ভট কল্পনা মাত্র। তবে আসলে কিন্তু তা নয়। টাইম মেশিন ও দূরত্ব হ্রাসকারক মেশিন, দুটি নাম হলেও আসলে একই জিনিস। দূরত্বকে দূরত্ব মনে হয়—যেহেতু এখানে সময় কাজ করে। সময় না থাকলে দূরত্বও থাকবে না। আসলে দূরত্ব তো সময়ের হিসাবে। যেমন সূর্যের দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে ৮ মিনিট মাত্র। অর্থাৎ সূর্য



বিভিন্ন ভাবে আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ

আকাশে উঠলেও তাকে দেখতে আমাদের সময় লাগে আট মিনিট। ১৮৬০০০ মাইল বেগে আলোর গতি ছড়িয়ে দিলেও সূর্যের সেই আলো আমাদের কাছে আসতে সময় নেয় আট মিনিট। যদি সময় না থাকত সূর্য ওঠামাত্রই আমরা দেখতে পেতাম। এই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রায় দেশের হিসেবে আমরা

এগিয়ে গেলেও সময়ের হিসেবে কিন্তু পিছিয়েই আসি।

যাত্রা যদি লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাৎক্ষণিকও হয় আমাদের মহাকাশচারী ফিরে আসবে কিভাবে? সে কি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে না? না। সে ফিরে আসতে পারবে। ফিরে আসবে white hole দিয়ে।

এই হোয়াইটহোল কি? ব্ল্যাকহোল অপেক্ষা সেও কম বিস্ময়কর নয়। এ ঠিক ব্ল্যাকহোলের উল্টো দিক। ব্ল্যাকহোল হল আত্মআকর্ষণ। হোয়াইট হোল হল নিস্ক্রমণ। ব্ল্যাকহোল থেকে কিছুই বেরুতে পারে না। হোয়াইট হোল সব কিছুকেই ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ভারতীয় যোগতন্ত্রে একেই বলে বিন্দু—যার অভ্যন্তরে রয়েছে স্তব্ধ দেশকালহীন এক অদ্ভুত অবস্থা—যা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অথচ চূড়ান্ত বিস্মৃতিকারক। যেখানে সমস্ত অস্তিত্ব এমন কি চৈতন্যেরও নাশ—যাকেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন পরব্রহ্মন।

বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখতে গেলে সত্যি সত্যি কি হোয়াইট হোল আছে? তত্ত্বের দিক থেকে ভাবতে গেলে হোয়াইট হোল আমাদের পৃথিবী থেকে দর্শনীয়। কিন্তু দর্শনীয় হলেও এ দর্শন তেমন সহজ নয়। যেমন ধ্যানমার্গে বিন্দু দর্শন অত্যন্ত সহজ হলেও কলাকৌশল না জানলে তা দর্শনের অতীত। বিরাট হোয়াইট হোল বিস্ফোরণগত নীহারিকা থেকে কখনই দেখা যাবে না। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হোয়াইট হোল হলে, ধরা যাক আমাদের দশটি সূর্যের বস্তুসত্তা যার মধ্যে রয়েছে, তাকে দেখা যাবে দূর থেকে দেখা সাধারণ নক্ষত্রের মত। নারলিকার এবং কে. এম. ভি. আপ্পারাওয়ের মতে ব্ল্যাকহোল ও হোয়াইটহোলের গঠনশৈলী একই ধরনের। শুধু কাজ করার ধরন হল আলাদা। আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ যে মুহূর্তে প্রমাণ করেছে যে, ব্ল্যাক-হোলের মধ্যে অগ্রসর হবার কালে সময় বলতে কিছু থাকে না তখনই ব্ল্যাক-হোলের সঙ্গে সঙ্গেই হোয়াইট হোলও জন্ম নেয়। ফলে কোন মহাকাশচারী ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোয়াইট হোল দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরস্থ কোটিশত আলোকবর্ষের দূরত্বও মহাকাশচারী চোখের পলকের মধ্যেই অতিক্রম করে যাবে। যোগীদের এ অভিজ্ঞতা যোগ-অভ্যাসের প্রথম দিকেই হয়। বিজ্ঞানের কাছে যেটা একটা জটীল ব্যাপার মানুষের আত্ম-সত্তার ক্ষেত্রে সেটা কোন ব্যাপারই নয়। একেই যোগে বলা হয় বিন্দুভেদ। বিন্দু, অর্থাৎ হোয়াইটহোলের কাছাকাছি যোগীর সূক্ষ্মদেহ বা চেতনা আসা-মাত্রই তিনি দেখতে পান যে, তার অভ্যন্তরে রয়েছে একটি কৃষ্ণগহ্বর। তার আকর্ষণী ক্ষমতা এত বেশী যে মুহূর্তের মধ্যেই যোগীর সূক্ষ্মসত্তা সেই আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে ভিন্ন এক জগতের আকাশে গিয়ে পড়ে। বস্তুতঃ যোগীরা ব্ল্যাকহোল থেকে হোয়াইটহোলকে সিগারেটের ধুঁয়ার মত রিঙ্ তৈরি তৈরি করতে করতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। তবে এই হোয়াইট-

হোলকে ব্ল্যাকহোল থেকে বার বার বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এতে মনে হয় জগৎ-উদ্ভবতত্ত্ব ক্ষেত্র একটা মাত্র bigbang-এর পরিবর্তে মুহুর্মুহু big-bang হয় অ ং বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে যাকে বলে Steady State তত্ত্ব তাই দাঁড়াতে চায়. BigBang তত্ত্ব নয়। এই সত্য জানতে হলে বৈজ্ঞানিকদেরও যোগে বসতে হবে। যন্ত্র অপেক্ষা psyche-এর ক্ষমতাঅনেক অনেক গুণ বেশি।

তবে blackhole ভেদ করতে সময় না লাগলেও যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা গিয়েছিল সেখানে ফিরে আসা আর কখনও সম্ভব হবে না। ফিরতে হলে ফিরতে হবে সাধারণ দেশ দিয়ে যাতে সময় লাগবে আলোর গতিতে চলেও— অনেক অনেক দিন। এজন্য আবার দ্বিতীয় কোন ব্ল্যাকহোলের প্রয়োজন হবে যা দিয়ে স্বাভাবিক দেশে তারা ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু যারা নিজেদের সূক্ষ্মসত্তার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে. এই সূক্ষ্মসত্তা ব্যক্তিসত্তার অন্তস্থ মাধ্যাকর্ষণ টানে আবার ঐ পথেই কিংবা দ্বিতীয় কোন blackhole ছাড়াই দেশের পথে নিজের সত্তার মধ্যে ফিরে আসতে পারে। এজন্য কোয়ান্টাম ফিজিক্স যেমন অণুর অভ্যন্তরভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সীমাহীন রহস্যের খবর পেয়েছে তেমনই ব্যক্তি অন্তর্চর্চা করলেও বিস্ময়কর উপাদান খুঁজে পাবেন। ফ্রয়েড. য়ুং. গ্রোডেক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এর সামান্যমাত্র হদিশ পেয়েছেন— যোগীদের মত পূর্ণাঙ্গ সত্যের সন্ধান পান নি।

বিজ্ঞানের পথ ধরে যদি অগ্রসর হওয়া যায়—তাহলে দ্বিতীয় ব্ল্যাকহোলের খোঁজ করতে হবে। আবার যদি দ্বিতীয় ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হোয়াইটহোলও এসে যাবে। এক ধরনের ব্ল্যাকহোল আছে যাকে বলে স্থির ব্ল্যাকহোল। যদি এই ব্ল্যাকহোলের ঊর্ধ্ব ভাগ দিয়ে কোন মহাকাশচারী-এর ভেতরে ঢুকে পড়েন তবে তিনি কোথায় যাবেন ? যদি দেশ ও কাল বঙ্কিম ধরনের হয় তাহলে দ্বিতীয় কোন দেশ ও কালের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। যদি দেশ ও কাল সমতল হয় তবে আকাশচারী আমাদেরই বিশ্বের দেশ ও কালের মধ্যে অন্য কোথাও গিয়ে পড়বেন। যেখান দিয়ে আকাশচারী দেশের আন্ত আকর্ষণে ভেতরে প্রবেশ করবেন তার নাম ব্ল্যাকহোল। যেখান দিয়ে ফুটে বেরুবেন তার নাম হোয়াইটহোল। বঙ্কিম দেশেও আছে একটি ব্ল্যাক ও একটি হোয়াইটহোল। আবার সমতল দেশেও আছে একটি ব্ল্যাক ও একটি হোয়াইট-হোল।

মানুষ যে কৃত্রিম ব্ল্যাকহোল তৈরি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে তার উপর তার ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। এর ফলে সে এ নক্ষত্রের রাজত্ব থেকে আর এক নক্ষত্রের রাজত্বে চলে যেতে পারবে। যদি তা না পারে তাহলে একদিন এমন এক স্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে যাবে. যার পরিণতি হবে মনুষ্যজাতির অবলোপ। আর মানুষ যদি নতুন বিশ্বে যেতে সমর্থ হয় তবে একটি আন্তনীহারিকা

পড়শীয় সম্পর্ক স্থাপিত হবে। মনুষ্যজাতি সেক্ষেত্রে অসংখ্যকোটি সৌর জগতের নানাগ্রহে নিজের ভবিষ্যৎ বাসস্থান খুঁজে পাবে। মানুষ সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এর ফলে মানবসভ্যতার বহুমুখী বিকাশ তাকে এক নতুন মাত্রার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। কিন্তু যে কৃত্রিম পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষ এই দুঃসাধ্য সাধন করতে চলেছে সেজন্য তার শত শত বৎসরের প্রচেষ্টা লাগবে। তার পূর্বে মানবসভ্যতা যে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে না তা কে বলবে! হয়তো হবেই। সেই জন্যই হিমালয় থেকে এক প্রবাদপুরুষ যোগী ভূতলে নেমে এসে আমাকে বলেছিলেন, মহাবিশ্ব পরিক্রমার সহজ একটা যোগের পন্থা জেনে নাও। আত্মার স্বরূপ বোঝ। মহাবিশ্বের ঠিকানা জান। মরবার আগে নিজেকে অমৃতত্বের স্বাদে ভরে তোল। আর এই অমৃতবানী মানুষকে জানাও। তাঁর সেই আশীর্বাদ থেকে যোগের উপর বই লিখছি। দেখেছি, বহু পাঠক শুধুমাত্র আমার বই পড়ে তাতে যে যোগনির্দেশ দেওয়া আছে, সেই নির্দেশ অনুসরণ করে বিশ্বের রহস্যময় এক রূপ প্রত্যক্ষ করে শিহরিত হচ্ছেন। জানতে পারছেন এই বিশ্বও মৃত নয়, জীবন্ত। কোটি কোটি ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, প্রাণ ইত্যাদি নিজের দেহে বোধের মত ধারণ করে সার্বিক এক চরিত্র নিয়ে সে একক একটি প্রাণের মত বিরাজমান। তাঁরও অতন্দ্র চোখ রয়েছে যা দিয়ে সে রহস্যময় দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে।

সাধারণ ধারণা এই যে, ব্ল্যাকহোলের লৌহবেষ্টনী ভেদ করে কেউ বা কোন কিছুই আর বেরিয়ে আসতে পারে না। আবার কেউ বলছেন—পারে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পারে। এবং পারে সম্পূর্ণ এক বিপরীত বিশ্বে গিয়ে উপস্থিত হতে। এ-জগতের প্রাকৃত-আইনের ঠিক উল্টো প্রাকৃত-আইন সেখানে কাজ করে। বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও কেউ বলতে পারছেনা যে—সত্যি সত্যিই কোন মহাকাশচারী এর মধ্যে পড়লে কি হবে। তবে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে এর একটা আনুমানিক চিত্র আঁকবার সুযোগ পেয়েছে।

একটা সাধারণ স্থির ব্ল্যাকহোল দিয়েই ভাবা যাক। এই বৃত্তের পরিধির মধ্যে যা পড়বে তার সব কিছুই সে অন্তরস্থ করে নেবে। তবে এই বৃত্তের কিছুটা দূরে থেকে কোন মহাকাশচারীকে কেউ রকেটের মত যন্ত্রে ছুঁড়ে ব্ল্যাকহোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে তার অভিকর্ষ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পারে। যখনই মহাকাশচারী ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের কাছে গিয়ে পড়বে তখনই অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ঘটতে দেখবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষী কেন্দ্রের কাছাকাছি সময়ের গতি শ্লথ হয়ে যায়। আর এই অভিকর্ষ সর্বাপেক্ষা প্রবল black hole-এর কাছাকাছি। যতই মহাকাশচারী কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি যাবে ততই সময়ের গতি কমে আসবে। তার ঘড়ির সময় এতটাই কমে যাবে যে, সময়ের হিসেব করলে মনে হবে কোন দিনই সে কৃষ্ণ-

গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারবে না। আমরা যদি মনে করি, আর সেকেন্ডখানিকের মধ্যেই সে কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকে যাবে তবে মহাকাশচারীর ঘড়িতে সেই শেষ সেকেন্ডকে অনন্ত সময় বলে মনে হবে। অথচ তার ঘরি কিন্তু তার হিসেবে নিয়ম মাফিকই সময় দিয়ে যাবে। আবার বাইরে থেকে তার ঘড়ির দিকে তাকালে যে সময়কে অসীম বলে মনে হবে তার কাছে সেই সময়ের কাজ মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যাবে।

ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেলে সে এমন এক বিন্দুপ্রমাণ অবস্থার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হবে, যে বিন্দুপ্রমাণ স্থানের ঘনত্ব পরিমাপহীন। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রস্থ এই বিন্দুপ্রমাণ অবস্থাই singularity নামে পরিচিত। চোখের পলক না পড়তেই মহাকাশচারী এই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পেঁছে নিজেই অসীমত্বের মধ্যে পড়ে যাবে। গভীর বিস্মৃতিতে সে ডুবে যাবে, কারণ সেখানে সময় বলে কিছু থাকবে না। আর মানুষের স্মৃতি, সেতো সময়ের উপরই নির্ভরশীল! সুতরাং সময় না থাকলে স্মৃতিই বা থাকবে কি করে? চিন্তাও থাকবে না, কারণ চিন্তা চলে সময়েরই হাত ধরে।

বর্তমানে অধিকাংশ অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টের ধারণা, স্থির ব্ল্যাকহোল আছে। প্রত্যেকটি নক্ষত্র এখানে ঘূর্ণায়মান। সম্ভবত আমাদের বিশ্ব এবং ব্ল্যাকহোলও। ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন নক্ষত্রের ঘূর্ণনের অপেক্ষাও বেশি হতে পারে। এই ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়লে মহাকাশচারী স্থির ব্ল্যাকহোলের মধ্যে যে অবস্থার সম্মুখিন হবে তেমন অবস্থার সম্মুখিন হবে না।

ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে কি ঘটতে পারে রোজার পেনরোজ তা দেখাবার জন্য দেশ ও কালের উপর কয়েকটি ডায়াগ্রাম এঁকেছেন। দেশের বুক ধরে আমরা যদি এগিয়ে যাই তাহলে ঊর্ধ্ব দিকে যাব অর্থাৎ সামনের দিকে। আইনস্টাইন মনে করতেন যে দেশের বুক ধরে কেউ প্রতি ঘন্টায় ৬৭০ মিলিয়ন মাইলের বেশি চলতে পারবে না। অনন্ত দেশে আমাদের বিশ্বজগৎ সময়ের হাত ধরে 'উৎপত্তি থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত' চলার পথে মূলত একটা হীরক খন্ডের মত আকার নেবে। এতে সিঙ্গুলারিটি, ইভেন্ট হরাইজন, দেশ, কাল আমাদের বিশ্ব এবং ভিন্নবিশ্ব অদ্ভুত এক ধরনের চিত্ররূপ নেবে যা হীরক খন্ডেরই মত। যদি কোন মহাকাশচারী ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ে, তবে সোজাসুজি গিয়ে পড়বে না। ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণনের জন্য সে পড়বে প্রান্তের দিকে, তা তার রকেট যতই শক্তিশালী হোকনা কেন। ব্ল্যাকহোল শুধু যে ঘুরছে তা নয়, এর মধ্যে ইলেকট্রিকাল চার্জও আছে। আর সেই জন্যই এর মধ্যে ঢুকতে গেলে মহাকাশচারীরা সরাসরি সোজা সরলপথে গিয়ে পড়তে পারবে না।

ইলেকট্রিক্যালি চার্জড ব্ল্যাকহোলে দুটো ইভেন্ট হরাইজন আছে—একটি বাইরের, আর একটি ভেতরের। ভেতরের ইভেন্ট হরাইজনের জন্য এই হোলের

অভ্যন্তরভাগ বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দেশ ও কালের ভূমিকা আবার উল্টে যাবে। মহাকাশচারী ভেতরের ইভেন্ট হরাইজন পর্যন্ত একটি পথ ধরে পড়তে পারে। ভেতরের ইভেন্ট হরাইজনের অভ্যন্তরভাগে ঢুকে গেলে মহাকাশচারী স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে, যদিও কোথায় গিয়ে তার যাত্রা শেষ হবে সে তা বলতে পারবে না। সে ভিন্ন কোন মহাবিশ্ব বা যে-কোন মহাবিশ্বে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে।

মহাকাশচারীর ব্লাকহোল ধরে যাত্রাপথের সুন্দর একটি ডায়াগ্রাম এঁকেছেন পেনরোজ। সেই ডায়াগ্রামের ছবিটা মানস নেত্রে ফুটে উঠতে লাগল। এখানে সিঙ্গুলারিটিকে দেখা যাবে একটি রন্ধ্রপথের দুই ধার ধরে উর্ধ্বরেখার মত উঠে গেছে। বরাবর উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে এমনভাবে চলতে চলতে মহাকাশচারী বাইরের ইভেন্ট হরাইজন ভেদ করে এই রন্ধ্রপথে ঢুকতে পারে। এবং চলতে চলতে ভেতরের ইভেন্ট হরাইজন দিয়ে একেবারে মাথায় গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা বিশ্বও দেখতে পারে।

ঘূর্ণয়মান অথচ ইলেকট্রিক্যাল চার্জ নেই এমন ব্লাকহোলেরও আভ্যন্তরীণ ইভেন্ট হরাইজন আছে। তত্ত্বের দিক থেকে ধরতে গেলে এই আভ্যন্তরীণ ইভেন্ট হরাইজন ভেদ করেও মহাকাশচারী ভিন্নবিশ্বে যেতে পারে। কিন্তু এখানে singularity বিন্দুপ্রমাণ নয়, বরং বৃত্তপ্রমাণ। এই বৃত্তাকার singularity ভেদ করতে পারলে মহাকাশচারীরা হয়তো ভিন্নরকম কোন নিয়মকানুন দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। হয়তো দেখবে, এ বিশ্বের মাধ্যাকর্ষীয় শক্তি আকর্ষণ করেন, বিকর্ষণ করে। হয়তো একটি নঞর্থক বিশ্বে গিয়েও সে পড়তে পারে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জ্যোতির্বিদেরা এরকম ধারণা মনে মনে পোষণ করতেও পিছিয়ে যান না যে, একদিন হয়তো মানুষ এই ধরনের রন্ধ্রপথ ধরে ঘূর্ণয়মান ব্ল্যাকহোলসমূহের অন্তর্ভেদ করে এক বিশ্ব থেকে আর এক বিশ্বে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারবে।

কিন্তু স্বপ্ন যতই বড় হোক না কেন, সমস্যা তা অপেক্ষাও প্রবল। ব্ল্যাকহোলের ভেতরে ঢোকার আগেই এই সমস্যা দেখা দেবে। ধরা যাক ব্ল্যাকহোলে ঢোকার মুখে কোন মহাকাশচারী প্রথম নামিয়ে দিল তার পা। ফলে পা দুটো মাথার চেয়ে বেশি ব্ল্যাকহোলীয় মহাকর্ষ অনুভব করবে। এতে তার সমগ্র দেহে এমন এক টান সে বোধ করবে যে, কেঁচোর দেহের মত টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবার মত হবে সে। ব্ল্যাকহোল থেকে কয়েকশ মাইল দূর থেকেই সে এই ধরনের ভাব অনুভব করতে পারবে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ছোট ছোট ব্লাকহোলের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা বেশি, কারণ, আপেক্ষিক দূরত্ব অনুসারে ক্রমশ: কাছের দিকে এর মহাকর্ষিক শক্তি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এর প্রভাব যথার্থই লক্ষ্য করার মত। কারণ, এর অভিকর্ষের টানে দেশ ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে ইভেন্ট হরাইজনের

বাইরেই অণু-পরমাণুর সৃষ্টি করবে। এই অণু-পরমাণুগুলি ছুটে বেরিয়ে এসে সঙ্কুচিত দেশের বুকে ভাসতে ভাসতে ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তর ভাগকেই হীনবল করে দেবে। বস্তুতঃ ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসত্তাকেই সে টেনে নেবে। একে হকিং বলেছেন Evaporating ও Exploding ব্ল্যাকহোল।

ক্ষুদ্রাকার ব্ল্যাকহোলের কাছে সমস্যাটা বেশ প্রবল হলেও বৃহৎ ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রে সমস্যা তেমন তীব্র নাও হতে পারে। এখানে ব্ল্যাকহোলের আন্ত অভিকর্ষ ধীরে ধীরে বাড়ে—অকস্মাৎ তীব্রভাবে এই আকর্ষণটাকে বাড়িয়ে দেয় না। হয়তো ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলেও এই ধরনের ব্ল্যাকহোল থাকতে পারে—সৃষ্টির প্রারম্ভে যেখানে বস্তুকণা ঘনসংবদ্ধ হয়ে ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের এই ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে এমন ব্ল্যাকহোল আছে সূর্যের চাইতে যার ওজন পাঁচ-হাজার গুণ বেশি। M87 ছায়াপথের অভ্যন্তরে এর চাইতেও হাজারগুণ ভারি ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন। এর মহা অভিকর্ষ কাছাকাছি সকল নক্ষত্রের চলার পথটাকেই বিকৃত করে দিয়েছে। অনেকে তাই ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছেন যে, বহুদূরে দূরে যে-সকল উজ্জ্বল Quasars লক্ষ্য করা যায় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে উত্তপ্ত বাষ্পের কতকগুলি চক্র মাত্র যা কোন মহাবিশাল ব্ল্যাকহোলের চতুর্দিক ঘিরে আছে।

এই মহাবিশাল ব্ল্যাকহোল দিয়েই ভবিষ্যতে কোনদিন হয়তো ভিন্ন জগতে যাওয়া যাবে। এই নতুন বিশ্বে যাবার জন্য হোয়াইটহোলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ব্ল্যাকহোলের টানে যেমন সবই ভেতরে ঢুকে যাবে হোয়াইটহোলের ধাক্কাতে তেমনই সব কিছুই বাইরে চলে আসবে। অবশ্য বাইরে আসতে হলেও ইভেন্ট হরাইজন পার হয়ে আসতে হবে। সত্যিই যদি হোয়াইটহোল থাকে তবে তা নিজের অভ্যন্তরকে নিঃশেষে বাইরে ঠেলে দেবে।

সত্যি যদি হোয়াইট হোল থেকেই থাকে তাহলে তা পর্যবেক্ষণ করতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হবেই। ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তর পর্যালোচনা করলে শুধু singularity দেখা যাবে না, দেখা যাবে আরও দুটি বিশ্ব। এর একটি হবে নঞর্থক বিশ্ব—যাকে অঙ্গুরী ধরনের সিঙ্গুলারিটির ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে। একে ঘিরে রয়েছে singularity স্বয়ং। বাকি হোয়াইটহোলের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে আর একটা বিশ্বের বিকৃত দৃশ্য। কারণ, এই বিশ্ব হল হোয়াইট-হোলে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব।

কিন্তু হোয়াইটহোল নিয়েও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছেই। যদিও এই হোল অন্তর থেকে সব কিছুকেই বাইরে ঠেলে পাঠায় তবু একেও ঘিরে রয়েছে একটি মাধ্যাকর্ষীয় ক্ষেত্র। দেশে যেমন ব্ল্যাকহোলের উদ্ভব হয় হোয়াইটহোলের তেমন ভাবে উদ্ভব হতে পারে না। যদি এর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা বিশ্ব-সৃষ্টির প্রারম্ভপর্যায় থেকেই রয়ে গেছে। অধিকাংশ জ্যোতির্বিদই আজ মনে

করেন যে, আমাদের এই বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটে bigbang অর্থাৎ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে। যদি সেসময় কোন হোয়াইটহোল হয়েই থাকে তবে তা চতুর্দিকে এমনভাবে বিকিরণতরঙ্গ ধরে রাখত যে, এই বিকিরণ-এর সূক্ষ্ম সত্তাই হোয়াইটহোলের চারদিকে ব্ল্যাকহোল সৃষ্টি করত। আর সেই ব্ল্যাকহোল হোয়াইটহোলকেই গ্রাস করে ফেলত।

হোয়াইটহোলের পরিবর্তনশীল মহাকর্ষের যে সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেবার শক্তি রয়েছে তা লক্ষ্য করলে এমন অনুমান করাই সম্ভব যে, এর কেন্দ্রস্থ singularity স্থির নয়, স্থায়ীও নয়। এ ধরনের ব্যাপার হোয়াইটহোলের ইভেন্ট হরাইজনের মধ্যেই ঘটা সম্ভব। ফলে এখনও অনেক হিসেবনিকেশ বাকি থাকলেও এটা বোধহয় বলা চলে যে, ব্ল্যাকহোল ও হোয়াইটহোল ভেদ করে করে বিশ্ব বিশ্বান্তরে পাড়ি জমাবার যে স্বপ্ন মানুষ দেখছে তা এখনও সন্দেহের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

ধরা যাক, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের উর্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে বিশ্বজয় করার জন্য যে সকল ডায়াগ্রাম তৈরি করেছেন তা সত্য। তবুও কৌতূহলের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যাবে। প্রশ্ন থাকবে, এই নতুন বিশ্বগুলি কি রকম? হয়তো আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। সেখানে আঞ্চলিক অবস্থা ও সময়ের গণিত ভিন্ন। এবং তা যদি হয়—তাহলে ব্ল্যাকহোলকে টাইম মেশিন হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এবং এর একটি দিয়ে যাত্রা শুরু করলেই হয়তো ফিরে পাওয়া যেতে পারে সেই ডাইনোসরের জগৎ অথবা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যে জগৎ অপেক্ষা করে আছে তার সন্ধান।

ঐতিহাবাহী বিজ্ঞানের অনুসন্ধানপর্ব এখানে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেলেও এখনও যারা কৌতূহলী জ্যোতির্বিদ তাঁরা প্রতিদিন আরও বেশি তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন এই প্রমাণ পাবার জন্য যে, ব্ল্যাকহোল আছেই—আছে আমাদের বিশ্বে আছে তারকাযুগ্মে যার নাম cygX-1 এবং M87 নীহারিকাতে এবং অসংখ্য কোয়াসার-এ। সন্দেহ নেই ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে আমাদের জন্য আরও অসংখ্য নতুন নতুন তথ্য অপেক্ষা করে আছে তত্ত্বের মধ্যে ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে। মানুষের দুঃসাহসী পদক্ষেপকে সমর্থন জানানো হলে একদিন সত্যি সত্যি হয়তো আমাদের মহাকাশযানগুলি নানা ধরনের ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে।

জানিনা যন্ত্র এই মহাবিশালকে ধরতে পারবে কি না। কিন্তু আমি জানি মহাবিশ্বের এক মহাবিশাল মনসকারিগর মানুষেরই গঠনশৈলীতে যে যন্ত্র তৈরি করেছেন, মানুষ যদি সেই গঠনশৈলী নিজে অর্জন করতে পারে, মানুষ যদি নিজের হাতে মানুষ তৈরি করতে পারে, তবে সেই মানুষই বলে দেবে মহাবিশ্বজগতের চরিত্র কি, কোথায় রয়েছে তার কোন প্রান্ত এবং কোথায়ই বা কি ধরনের দেশ কাল এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলি। মানুষ বুদ্ধিমান হলে যন্ত্রে

আর মানুষ তৈরি করতে যাবে না—যে রহস্যময় যন্ত্র সে নিজেই সেই দেহযন্ত্রটিকে ব্যবহার করলেই পেয়ে যাবে মহাবিশ্বের ঠিকানা। এ-জন্য যা প্রয়োজন তা যোগ। কারণ, আমি জানি, আমি দেখেছি, বিজ্ঞান যা বলছে, তা সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ যেখানে আবদ্ধ রয়েছে তত্ত্বে, দেহ দ্বারা, যোগ দ্বারা সেই বিশ্বকে সরাসরি জানা যাবে সত্যে। সত্যি সত্যিই আছে নঞর্থক ভিন্নবিশ্ব, আছে ধনাত্মক ভিন্নবিশ্ব। আছে অতীত বিশ্ব, আছে ভবিষ্যৎ জগৎ। ব্ল্যাক-হোলের মূল কেন্দ্র হল মহাশূন্যতা। কোন নক্ষত্র ডুবে গিয়ে ব্ল্যাকহোল তৈরি হয়নি, মহাশূন্যতারূপী ব্ল্যাকহোল থেকেই দেশ (pulsating void), বস্তু-পুঞ্জ, ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্রাদি তৈরি হয়েছে। আত্মশক্তি ফুরিয়ে গেলে তারাই আবার সৃষ্টি করে অনন্ত অভিকর্ষে নতুন ব্ল্যাকহোল। আবার এই ব্ল্যাকহোল থেকেই হয় প্রচন্ড চাপের ফলে সৃজনশীল মহাবিস্ফোরণ। সর্বাপেক্ষা বড় ব্ল্যাকহোল হল মহাশূন্যতা যেখানে সময় নেই, দেশ নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই, অথচ সবই আছে। মানুষ নিজের মনের মধ্যে ডুব দিলেই সেই যথার্থ ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পাবে। কার্তিকের মত বিশ্ব না ঘুরে, গণেশের মত আপন গহন অন্তঃপুরের প্রাণসত্তাকে পরিক্রমা করা অনেক সহজ।

হঠাৎ হোচট খেয়ে ভাবনার স্রোতটা যেন কেটে গেল। খাড়ি তার শেষ বাঁক নিয়েছে। ওপার সুন্দরবন অন্ধকারে ডুবে গেছে। ভট্‌ভটিটা যেদিকে ভিড়তে শুরু করেছে সেদিকেই লোকালয়। সুন্দরবনের ক্ষীণ সাক্ষী কিছু কিছু বৃক্ষ দ্বীপের উপকূল ধরে ঘনছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে, খানিক দূরে ভট্‌ভটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেনারেটর চলছে একটি ধর্মীয় উৎসব-প্রাঙ্গণকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করতে। মিটি-মিটি-তারার মত মাটির কোল ছুঁয়ে কিছু আলো জ্বলছে। সেই আলোর সংকেত পেতেই ভট্‌ভটির আওয়াজ কমে গেল। হাল বজরার মুখ ঘুরিয়ে দিল ডাঙার দিকে। ভাটার টান আরও অনেক বেশি নিশ্চয়ই, কারণ ভট্‌ভটিটা পাড়ের দিকে ঘেঁষতেই দেখি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উপকূলের ডাঙা। ভট্‌ভটিটা ঘাটে ভিড়তেই উপর থেকে বড় বড় কাঠ নামিয়ে দেওয়া হল নিচে, সঙ্গে সঙ্গে কাছির মত দড়ি। বজরা ভিড়েছে—সাতজিলিয়ার পরশমণি ঘাটে—যেখানে নতুন শ্রীক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন ওড়িশার এক সাধু।

এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করার মত অতিকষ্টে মাটির জমিদারীতে পা রাখলুম—দশ ঘণ্টা পরে। সমুদ্রের হাওয়ারা কানাকানি করছে। কে এসে ভূধরের কানে কানে কি বলল। পাশে দাঁড়নো আমার সহযাত্রী টালিগঞ্জ ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের শঙ্করের দিকে তাকালাম। সে বলল, ভূধরের বাবা মারা গেছেন, আপনি যেভাবে দেখেছিলেন সেইভাবেই। কিন্তু আমি জানি তিনি মারা যাননি। স্থূল জৈবদেহটা নষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর মানসসত্তার মৃত্যু হয়নি। তিনি ব্ল্যাকহোল ভেদ করতে করতে আরও কতজীবন যে ঘুরবেন

কে জানে! মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে অনন্ত জীবন—চাঁদের মত সে ওঠে ও ডোবে।

ডাঙায় উঠতে সামনেই দেখি মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা—সত্ত্ব, রজ ও তম। এই তিনগুণই লীলা করছে—বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জগন্নাথের মন্দিরে।